অমনীভাব

স্বামী ধীরেশানন্দ

মনের বিচিত্র খেলা, তাহার অগণিত চাতুর্য, অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ কর্মের দুর্বার প্রেরণা—এ সকলের সহিত সকলেই সুপরিচিত। মনে কত ইচ্ছাই না জাগিতেছে! কখনও ইচ্ছাপূরণে সে আনন্দে অধীর, কখনও বা ইচ্ছা প্রতিহত হইলে ব্যর্থতা-বিড়ম্বিত হইয়া ও নিরাশায় ব্যাকুল হইয়া সে নিতান্তই দুঃখী। একই বস্তুকে সুখকর বোধে তৎপশ্চাতে সে ধাবিত হইতেছে, আবার কখনও বা সেই বস্তুকেই দুঃখদায়ক মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইতেছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন—এই উভয় অবস্থাতেই মনের এই লীলা সমভাবে চলিয়াছে। মনের আর শান্তি নাই। কিন্তু সুষুপ্তিকালে যখন মন থাকে না, তখন কিন্তু ঐ সব দ্বন্দ্ব, ভাল-মন্দ, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ কিছুই নাই। তখন আমরা বেশ আনন্দেই থাকি। সুষুপ্তিভঙ্গে জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় ফিরিয়া আসিলে সেই পূর্বের বৈষয়িক সুখদুঃখের খেলাই পুনরায় সমভাবে চলিতে থাকে। এইভাবেই এই জগতে সকল জীবের জীবনেই যেন এক অনির্দিষ্ট যাত্রা অনাদি কাল হইতে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই যাত্রার শেষ কোথায়, তাহাই বিচার্য।

দেখা যায় সুষুপ্তিতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, দুঃখ নাই,—কারণ সেখানে মনই নাই এবং দৃশ্যমান জগৎও নাই। সেখানে আছে একটা বিশেষ নির্বিষয় আনন্দ, যে আনন্দের সহিত জগতের কোন আনন্দেরই তুলনা হইতে পারে না। সুষুপ্তিতে মন নাই, তাই দ্বৈত নাই; কোন বৈষয়িক সুখ-দুঃখও নাই। অপর দুই অবস্থায় (জাগ্রৎ ও স্বপ্নে) মন উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা হইতে যেন এই বিচিত্র জগদ্রূপ দ্বৈত আসিয়া চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে এবং আবার সুখ-দুঃখাদি জীবকে ব্যাকুল ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে।

তাহা হইলে বোঝা যায়, এই দ্বৈত মনেই রহিয়াছে। মনেই ইহার উদয় এবং মনেতেই ইহার বিলয়।

আচার্য শ্রীগৌড়পাদও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন :

'মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥'
(মাঃ কাঃ ৩।৩১)

—সচরাচর এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সব মনেরই কল্পনা। মনই এই দ্বৈতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। মন যখন 'অমন' হইয়া যায় তখন আর দ্বৈতের কোন উপলব্ধিই হয় না।

সুষুপ্তিকালে মন থাকে না, মন যেন অমন হইয়া যায় বটে কিন্তু তৎকালে মনের নাশ হয় না, উহা স্বকারণে সূক্ষ্মভাবে বিলীন হইয়া থাকে মাত্র। মনের পুনরুদ্ভব হইতেই তাহা বোঝা যায়। কিন্তু সর্বদা সুষুপ্তিতে থাকা ও তৎকালীন দুঃখ-রহিত নির্বিষয় আনন্দানুভব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সুখদুঃখাদি ভোগপ্রদ কর্মের অবসান হইলে স্বাভাবিক নিয়মে আপনা হইতেই সুষুপ্তি অবস্থা জীবের আসিয়া থাকে। সুষুপ্তি অজ্ঞানব্যবহিত স্বরূপস্থিতি। উহা কোন কর্মফল নহে। পুনরায় ভোগপ্রদকর্ম ফলপ্রদানে উদ্বুদ্ধ হইলে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। স্বকৃত কর্মের অধীন জীবের এই বিষয়ে কোন স্বতন্ত্রতা নাই।

যদি জাগ্রতে স্বকারণ সহ মনের নাশ কোন উপায়ে সম্পাদন করা যায় তবে আর দ্বৈতই থাকিবে না, সুতরাং বৈষয়িক সুখ-দুঃখও থাকিবে না। সর্বজীবেরই একমাত্র কাম্য সর্বদুঃখনিবৃত্তি। সকলেই ইহাই চায়। তাই পরম কৃপাপরবশ হইয়া আচার্য পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন :—

'আত্মসত্যানুবোধেন ন সংকল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্॥'
(মাঃ কাঃ ৩।৩২)

—'আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সর্ব পদার্থই অবস্তু, মিথ্যা', এই তত্ত্ব শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ লাভের পর যখন নিশ্চিতরূপে অনুভূত হয়, তখন আর কল্পনার যোগ্য কোন বস্তুই থাকে না। বাস্তব বস্তুর অভাববশতঃ মন আর কোন কল্পনা করিতে না পারিয়া 'অমন' হইয়া যায়। গ্রহণযোগ্য বস্তুর অভাবে মন তখন গ্রহণভাববিবর্জিত হইয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এখানে মনকে 'অমন' করিবার জন্য একটি উপায় আচার্য বলিলেন—'আত্মসত্যানুবোধ।' অর্থাৎ দৃঢ় আত্মবিচারসহায়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি।

অবস্থাত্রয়ের (জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির) মধ্যে নিত্য ভ্রাম্যমাণ জীব এই তিন অবস্থার বিচার দ্বারাই তত্ত্বোপলব্ধি করিতে পারে ও বৈষয়িক সুখ-দুঃখপ্রদ দ্বৈতের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আনন্দে থাকিতে পারে। অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী, কিন্তু এই তিন অবস্থার মধ্যে সমভাবে এক 'আমি' বিদ্যমান। এই 'আমি'র কখনও বিলোপ ঘটে না। দেহ মন বুদ্ধি ও অহংকার হইতে ভিন্ন এই 'আমি'ই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা। আমারই সত্তা, প্রকাশ এবং আনন্দ অবস্থাত্রয়ে সতত অনুভবগোচর হইতেছে। কিন্তু আমার এই রূপটি সর্ববস্তুসহ জড়িত হইয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি নিজ স্বরূপটি ভুলিয়া গিয়া নিজেকে দেহ মন বুদ্ধি আদি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে ভাবিতেছি ও যাবতীয় বাহ্য পদার্থে 'মমত্ব' অভিমান করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া নিজেকে নিজেই যেন বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন এই আত্মসম্মোহন ভঙ্গ করিতে হইলে আমাকেই তাহা করিতে হইবে ও তত্ত্বের দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান সহায়ে এই মোহজাল ছিন্ন-

করতঃ কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে হইবে। অপর কেহ ঔষধ সেবন করিলে ব্যাধিগ্রস্তের রোগনিবৃত্তি হইবে না।

শংকা হইতে পারে যে, বিচারের দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে সেই সাধকের মনোনিরোধ হইয়া সমাধি হইবে কিনা অর্থাৎ তিনি বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া যাইবেন কিনা। উত্তরে বলা যায় যে, বিচারবান্ সাধক ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির দ্বারা বাহ্য-জ্ঞানরহিত হইবার চেষ্টা করেন না। তিনি কেবল জীব জগৎ ও জগদধিষ্ঠান ব্রহ্ম বিচারেই ব্যাপৃত থাকেন। সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মই নিত্য, নাম-রূপাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, একটা সত্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র, আমিই সেই ব্রহ্ম—এইরূপ বিচারেই তিনি কেবল ব্যাপৃত থাকেন। ইনি উত্তম অধিকারী। চিত্ত শুদ্ধ, বিষয়বিরত ও একাগ্র না হইলে এরূপ নিয়ত বিচার কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে সম্যক্ অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম, যোগাভ্যাস বা উপাসনারই ফল এরূপ চিত্তশুদ্ধি। বিষয়-ভোগবিরত চিত্তে তীব্র আত্মজিজ্ঞাসাই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ। আচার্য সুরেশ্বর বলিয়াছেন :

'প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ।
কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃডন্তে ঘনা ইব॥'
(নৈঃ সিঃ ১।৪৯)

—বর্ষাবিগমে (শরৎ আগত হইলে) আকাশে যেমন মেঘকুল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, বুদ্ধির শুদ্ধির দ্বারা প্রত্যগাত্মপরায়ণতা উৎপন্ন করিয়া নিষ্কাম কর্মও তদ্রূপ কৃতার্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করে।

বিচারবান্ সাধকের বিচারই প্রধান সাধন। তবে বিচারপ্রসূত জ্ঞানসমকালে চিত্তের একটা অতি সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ হয়, চিত্ত সেখানে স্বভাবতই নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ও ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়। সমাধির দৃষ্টিতে তাহাকেই নিরোধসমাধি বলা যাইতে পারে। বিচারের গভীর অবস্থাতে এই সমাধি আসিয়া যায়। অতএব বিচারবান্ সাধকের বিচারদ্বারাই মনোনিগ্রহরূপ সমাধিলাভ হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত মাঃ কাঃ ৩।৩২ শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তম অধিকারীর পক্ষে মনোনিগ্রহরূপ সমাধি দৃঢ় জ্ঞানেরই ফল। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপ ত্রিপুটি ভেদভান সহ ঐরূপ ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তের অবস্থার নামই সবিকল্প সমাধি। পুনঃ ঐ ত্রিপুটি ভেদভান রহিত হইয়া কেবল জ্ঞেয় ব্রহ্মাকারা কিন্তু অজ্ঞায়মান চিত্তবৃত্তিতে স্থিতিই নির্বিকল্প সমাধি নামে খ্যাত। ইহাকেই অখণ্ডাকারা চরম বৃত্তি বলা হয়, যাহা দ্বারা মূল অজ্ঞান ও তৎকার্য বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং তদন্তর্গত নিজ দেহেন্দ্রিয়াদিও চিরতরে বাধিত অর্থাৎ মিথ্যারূপে পর্যবসিত হইয়া যায়। এই অবস্থা 'অদ্বৈত-ভাবনারূপ নির্বিকল্প সমাধি' নামে খ্যাত। অজ্ঞান নাশের (নাশ অর্থ বাধ অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিশ্চয়) পর ঐ বৃত্তি নিজেও বিলীন হইয়া যায় ও তখন 'অদ্বৈতাবস্থানরূপ নির্বিকল্প সমাধি' অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাকেই ব্রাহ্মীস্থিতি, স্বরূপস্থিতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এতদনন্তর জ্ঞানী স্বরূপভূত জ্ঞানে সদা অবহিত, সুপ্রতিষ্ঠ হন, যাহা হইতে তাঁহার আর কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। ব্যবহারকালেও তিনি সেই জ্ঞানে সদা সচেতন। ইহাকেই বলে 'জ্ঞানসমাধি' বা 'চৈতন্যসমাধি' বা 'সহজসমাধি'। এই সমাধি আর কখনও ভাঙ্গে না। তাই জ্ঞানী সদা সমাধিস্থ। জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তি সদাই চিদাকৃতি। 'সমাহিতা ব্যুত্থিতা বা বৃত্তিঃ সর্বা চিদাকৃতিঃ'—(বৃঃ বার্তিক-সার ২।৪।৪০)

বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :—

'তত্ত্বাববোধ এবৈকঃ সর্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তূষ্ণীমবস্থিতিঃ॥'

—একমাত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধই সর্ববিষয়ভোগ-

বাসনারূপ তৃণের দাহকারী অগ্নিসদৃশ, তাহাই সমাধি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে, কেবল নীরব অবস্থানমাত্রই সমাধি নহে।

দৃঢ় আত্মবোধই নির্বিকল্প সমাধি। মহাবাক্যের অর্থ—আমিই অখণ্ডাত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপই নিজের স্বরূপ – ইহা নিশ্চিত হইলে জ্ঞানীর ব্রহ্ম-সমাধিই হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদান্তে ব্রহ্ম-সমাধি কেবল জ্ঞানসহায়ে জানিবার যোগ্য, উহা যোগাভ্যাসাদি প্রচেষ্টাসাধ্য নহে। সুতরাং ব্রহ্মরূপে অবস্থিতিই নির্বিকল্প সমাধি। আর ব্রহ্মরূপে ভান হওয়াই সবিকল্প সমাধি।

কোন কোন আচার্য বলেন যে, মহাবাক্য-বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেও নির্বিকল্প সমাধি বিনা অদ্বৈতবস্তুর বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হইবে না। এই জন্য ক্ষণমাত্র নির্বিকল্প সমাধি হইলেও বোধের বিষয়-বস্তুরূপ অদ্বৈতের অভিব্যক্তি পূর্ণতয়া নিশ্চিত হইয়া যায়। জ্ঞানই সমাধি শব্দের মুখ্য অর্থ— এই বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের বহু বচন প্রমাণরূপে বিদ্যমান।

এখানে একটি বিষয় বোদ্ধব্য। ব্যবহারদশাতে অনেকেই কোন আকস্মিক ঘটনায় (যেমন হঠাৎ প্রিয়জন বিয়োগ বা অর্থনাশ ইত্যাদি) যেন স্তব্ধ হইয়া যান তখন, অথবা দুই বৃত্তির মধ্যস্থলে (যাহাকে সন্ধিস্থল বলা হয়) মন সর্ববিকল্পরহিত হইয়া যায়, উহা সাময়িক স্বরূপস্থিতি হইলেও নির্বিকল্প সমাধি নহে। কারণ উহা আত্মবিমর্শ-বিহীন। উহা চিত্তের একটা নির্বিকল্প অবস্থামাত্র। নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মাকার অজ্ঞায়মান বৃত্তি থাকিবে।

ব্রহ্মবিচারের উদ্দেশ্য তত্ত্বসাক্ষাৎকার, কেবল বাহ্যজ্ঞানরহিত হওয়া বা নিরোধ-সমাধি নহে। বিচার করিতে করিতে সর্ব অনাত্ম পদার্থ মিথ্যা-বোধে পরিত্যক্ত হইলে এক স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই তখন অবশেষ থকেন এবং তত্ত্বপক্ষপাতিনী বুদ্ধিও তখন পূর্ণরূপে আত্মাভিমুখিনী হইয়া ব্রহ্মাকারাই হইয়া যায় অর্থাৎ সমাধিস্থ হইয়া পড়ে। উত্তমাধি-কারীর কথা বলা হইল।

পুনঃ যাহাদের বেদান্তসিদ্ধান্তে নিষ্ঠা আছে, বেদান্তোক্ত সাধনে রুচি ও আগ্রহ আছে কিন্তু মল, বিক্ষেপ ও বুদ্ধিমান্দ্য আদি প্রতিবন্ধবশতঃ মহাবাক্যার্থ বিচারে অসমর্থ এরূপ নিম্নাধিকারীদের উপায় হইতেছে যোগাভ্যাসাদি সহকৃত বেদান্ত বিচার। যোগাভ্যাস সহায়ে চিত্ত একাগ্রকরতঃ তাঁহারা চিত্তবৃত্তিকে ধ্যানে সাক্ষীচৈতন্যনিষ্ঠ করিবার অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে পুর্বোক্ত সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় আরূঢ় হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কৃতকৃত্য হন। বিচার এখানে অপ্রধান। এই কথাই মাঃ কাঃ ৩।৪০ শ্লোকে বলা হইয়াছে :—

'মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ॥'

—নিম্নাধিকারী যোগিগণের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, অভয়, তত্ত্বজ্ঞান, অক্ষয় শান্তি বা মুক্তি— এই সবই মনোনিগ্রহরূপ সমাধির দ্বারা লভ্য।

ভগবান্ ভাষ্যকারও বলিয়াছেন :—

'এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎ পক্বকষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ॥
পরিপক্বং মনো যেষাং কেবলোঽয়ং চ সিদ্ধিদঃ॥'

—(অপরোক্ষানুভূতি ১৪৩।১৪৪)

— (স্বাভিমত বিচারাত্মক সাঙ্গ রাজযোগের বিষয় বলিয়া ভাষ্যকার উপসংহারে বলিতেছেন যে,) যাহাদের রাগাদি দোষ কিঞ্চিন্মাত্র দূরীভূত হইয়াছে তাহাদের এই বিচার- হঠযোগ[১] অর্থাৎ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ সহ অভ্যাস করা কর্তব্য। আর যাহারা শুদ্ধচিত্ত তাহাদের পক্ষে

১ শ্রীবিদ্যারণ্যরচিত টীকা দ্রষ্টব্য।

কেবল আত্মবিচারই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।

চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া বিষয়োপরত হইলে চিত্তশুদ্ধ হয়। অশুদ্ধ চিত্তে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞান ও তৎকার্য নিরসনের একমাত্র সাধন। সুতরাং চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক চিত্তের বিষয়োপরতি, ইহা যেন অভাবাত্মক সাধন, আর স্বরূপপ্রাপ্তি-ফলদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৃত্তি-জ্ঞানাভ্যাস যেন ভাবাত্মক সাধন। এই উভয় মিলিত হইয়াই নিম্নাধিকারীদের অজ্ঞাননিবৃত্তি, স্বরূপজ্ঞান ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে।

চিত্তমলনাশে স্বরূপপ্রতিষ্ঠা যোগ ও বেদান্ত উভয় দর্শনই স্বীকার করেন। যোগমতে চিত্ত-মলনাশ (চিত্তবৃত্তিনিরোধ-রূপ সমাধি) স্বরূপ-স্ফূর্তির সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু বেদান্তমতে ঐ নিরোধসমাধি জ্ঞানের কারণ নহে। মলরহিত শুদ্ধচিত্তে বিচারপ্রসূত 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই বৃত্তিই আত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশ করে। অজ্ঞাননাশেই বৃত্তির সার্থকতা। তখন স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা স্বয়ং প্রতিভাত হন। বেদান্তে নাশ অর্থ বাধ অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিশ্চয়, কার্যের কারণে বিলয়রূপ নাশ নহে। জ্ঞানে বাধিত প্রকৃতি বা অজ্ঞান ও তৎকার্য জগৎপ্রপঞ্চ ত্রৈকালিক অসৎ-রূপে পর্যবসিত হইয়া যায়। সাংখ্য ও যোগমতে প্রকৃতি অসৎ নহে, প্রকৃতি সৎ ও নিত্য এবং পুরুষও বহু, এক অদ্বিতীয় নহে। সুতরাং উভয় মতে (বেদান্ত ও সাংখ্যযোগ) সিদ্ধান্ত ও সাধনগত পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানমূলক বাধসমাধি ও যোগিদের লয়সমাধি বা সর্ববৃত্তিনিরোধমূলক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এক কথা নহে বা এক স্থিতিও নহে।

অপর সকল মতবাদিগণই ঈশ্বর-প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি দ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের ফলে স্ব স্ব মতানুযায়ী সালোক্য সামীপ্যাদি মুক্তি স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণও ভক্তিমূলক উপাসনা নিম্নাধিকারীর জন্য স্বীকার করেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি সহায়ে ঈশ্বর-কৃপায় ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ-বলে *শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সম্যক্* অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত নির্বিকল্প সমাধিজাত ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ দ্বারা স্বরূপস্থিতি ও কৃতকৃত্যতা তাঁহারা অঙ্গীকার করেন।

প্রধানতঃ সমাধিকে যোগদর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধি ও অদ্বৈতবেদান্তোক্ত বাধমুখ সমাধি— এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই উভয় প্রকার সমাধির পার্থক্য বিচার করিতে হইলে 'বাধ' ও 'লয়' এই পারিভাষিক সংজ্ঞাদ্বয়ের অর্থ বিচার্য। কার্য কারণে লয় হয়। কারণে কার্য সূক্ষ্মভাবে সুপ্ত থাকে ও কালবশে সেই কার্যের পুনরুদ্ভব হয়। সুতরাং কার্যের পূর্ণতয়া নিবৃত্তি হয় না। যোগ-সম্মত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লয়-সমাধি। ব্যুত্থান-দশায় প্রকৃতি ও তাহার কার্য পুনরায় সত্যরূপে আসিয়া হাজির হয়। সাংখ্যমতেও প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকখ্যাতির ফলে চিত্ত তৎকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়, চিত্তের ধ্বংস হয় না। প্রকৃতিরও ধ্বংস হয় না। পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা পৃথক হইয়া যান, এই মাত্র।

বাধমুখ সমাধিতে চিত্ত ও তৎকারণ অজ্ঞান চরমবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ অখণ্ডব্রহ্মাকারা বৃত্তিদ্বারা বাধিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে চিৎ-প্রতিবিম্ব জীবও বাধিত হইয়া যায়। বাধিত বস্তু অধিষ্ঠানরূপ। ভ্রান্তিকল্পিত সর্প যখন অধিষ্ঠান-রজ্জুজ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়, তখন ঐ সর্প রজ্জু-রূপই হইয়া যায়। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চিত্ত, জীব, অজ্ঞানাদি সব কিছুই বাধিত হইয়া অধিষ্ঠান-ব্রহ্মরূপই হইয়া যায়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মই অবশেষ

থাকেন। জীব-জগতের কেবল একটা মিথ্যা, সত্তাবিহীন প্রতীতি মাত্র ভাসে। সুতরাং সাংখ্য ও যোগদর্শনোক্ত চিত্তের তৎকারণ প্রকৃতিতে লয় ও ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে বেদান্তোক্ত বাধ অর্থাৎ জীব জগৎ সব কিছুর ত্রৈকালিক অসত্তা ও মিথ্যাত্বনিশ্চয় এক কথা নহে।

প্রকৃতি জড়া। সুতরাং প্রকৃতিলয়াত্মক সমাধি অজ্ঞানসমাধি বা মূঢ়সমাধি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এই জন্যই বৈদান্তিকগণ উহার আদর করেন না। বিচারকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

কিন্তু চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক যোগাভ্যাস উপেক্ষণীয় নহে। উহা পরম্পরাক্রমে মুক্তির সাধন হইয়া থাকে। বিষয় হইতে চিত্ত নিরুদ্ধ না হইলে অর্থাৎ চিত্তের বহির্মুখীনতা দূর না হইলে, চিত্ত অন্তর্মুখ না হইলে আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সুদূরপরাহত। তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি। চিত্তনিরোধ যোগ বা বিচার উভয় প্রকারেই হইতে পারে। কিছুটা অন্তর্মুখ সাধকের পক্ষে বিচারমার্গই উত্তম। বিচার দ্বারাই বহির্মুখীনতা পূর্ণরূপে দূর হইয়া প্রত্যগাত্ম-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। যাহাদের চিত্ত বহির্মুখ হইলেও মধ্যে মধ্যে অন্তর্মুখ হয় তাহাদের ভক্তিযোগ-সাধন সহায়ে ঐ বহির্মুখীনতা দূর করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। অতিশয় বহির্মুখচিত্ত পুরুষের পক্ষে অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস কল্যাণপ্রদ। কিন্তু জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, চিত্তশুদ্ধির হেতুরূপে যোগ ঐ জ্ঞানের ও মুক্তির পরম্পরা কারণ মাত্র। চিত্ত শুদ্ধ হইলে প্রত্যেক সাধককেই বেদান্তোক্ত শ্রবণ মননাদি সাধন সহায়ে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে হইবে ; অদ্বৈতবেদান্তমতে ইহাই একমাত্র পথ।

চিত্ত কেবল বিষয়বিরত হইয়া একাগ্র হইলেই স্বরূপের স্ফূর্তি বা অভিব্যক্তি হয় না। বৃত্তি দ্বারা স্বরূপকে চিত্ত যে পর্যন্ত বিষয়ীভূত না করিতেছে ততক্ষণ অজ্ঞান নাশ হইবে না। স্বরূপকে বিষয়ীভূত করা অর্থ পূর্ণ স্বরূপাভিমুখী হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত হওয়া। তখন চিত্তও স্বরূপে বিলীন হইয়া যাইবে।

অধিকারীবিশেষে চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কোন উপায়ে লয়মুখসমাধি কর্তব্য হইলেও অন্ততো গত্বা প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববোধরূপ বাধমুখসমাধি ভিন্ন কৈবল্যমুক্তি সুদূরপরাহত। বাধমুখসমাধি হইলে তখন মন থাকিয়াও নাই। তখনই ঠিক ঠিক অমনীভাব লাভ হয়। তখন পুরুষ জীবদ্দশাতেই মুক্ত। সব কিছু করিয়াও তিনি কিছুই করেন না, দেখিয়াও দেখেন না। ইহা এক অপূর্ব স্থিতি। মিথ্যা, প্রতীতিমাত্রশরীর এই জগতের খেলাতে তিনি আর কোন উদ্বেগ অশান্তি বোধ করেন না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাঁহার নিকট বাস্তব দ্বৈত বলিয়া কোন বস্তুই তখন নাই। তখনই অনাদিকালপ্রবৃত্ত জীবের এই মিথ্যা সংসার-যাত্রার চিরনিবৃত্তি। শ্রীবশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :—

'দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
সম্পন্নং চেৎ তদুৎপন্না পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ॥'
(যোগবাশিষ্ঠ ১।৩।৬, যোগঃ বাঃ সার ৩।২২)

— দৃশ্যপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ নাই (উহা একটা মিথ্যা প্রতীতি বা প্রতিভাস মাত্র), এই বোধে যখন মন হইতে দৃশ্যের সত্তাবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, তখনই মোক্ষসুখের আবির্ভাব হয়। ইহাই অমনীভাব।*

* শ্রীমৎ তীর্থস্বামী বিরচিত 'সমাধি' নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ

স্বামী ধীরেশানন্দ

'নরেন্দ্রের উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। ওর মতো একটিও নাই।'—'অন্যরা যেন দশদল শতদল পদ্ম, কিন্তু নরেন্দ্র সহস্রদল।' — 'অন্যরা কলসী, ঘটি, নরেন্দ্র জালা।' — 'নরেন্দ্র বড় দীঘি, রাঙ্গাচক্ষু রুই, বড় ফুটোওলা বাঁশ। ও আসক্তি—ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়।' —'এরা নিত্যসিদ্ধের থাক্, সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব-শিক্ষার জন্য।' — 'নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।'

নিজের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নরেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা ঘোষণাকরত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রশংসায় শতমুখ। অন্তর্দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই তাই নরেন্দ্রকে অন্যভাবে শিক্ষাদীক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, নরেন্দ্র অদ্বৈতবেদান্তের অতি উত্তম অধিকারী। ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে তাই তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের পুস্তকসমূহ পাঠ করিতে বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন :

নরেন্দ্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া প্রথম দিন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ করিতে প্রযত্ন করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তিনি তাঁহাকে অষ্টাবক্র-সংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন। নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দ্বৈতভাবে উপাসনায় নিযুক্ত নরেন্দ্রনাথের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ তখন নাস্তিক্যদোষদুষ্ট বলিয়া মনে হইত। একটু পাঠ করিবার পরই তিনি স্পষ্ট বলিয়া ফেলিতেন—'ইহাতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? তুমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর, সকলই ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক কথা অন্য কি হইবে? গ্রন্থকর্তা মুনি ঋষিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এরূপ কথা লিখিবেন কিরূপে?'

ঠাকুর কিন্তু প্রিয় নরেন্দ্রের ঐ কথায় হাসিতেন এবং বলিতেন, 'তা তুই এখন ঐ কথা নাই বা নিলি। তাই ব'লে ঋষিদের নিন্দা করবি কেন? ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস্ কেন?'

পাকা খেলোয়াড় যেমন প্রথম শিক্ষার্থীর ভ্রমচ্যুতিতে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে পারদর্শী করিয়া তোলেন, ঠাকুরও তেমনি প্রিয় নরেন্দ্রের কথায় হাসিলেন মাত্র ও ধীরে ধীরে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রের মতো তেজস্বী, স্বাধীনচিন্তাশীল, বুদ্ধিমান্ শিষ্যকে তিনি অপর সকলের ন্যায় শীঘ্র বাগ মানাইতে পারেন নাই। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া গুরু-শিষ্যের যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্বান্ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের চরণকমলে চিরতরে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। সহিস জানে তেজস্বী ঘোড়া বশে আনিতে সময় লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় নরেন্দ্রকে যাহা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি শিখিয়াছিলেন কি? অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থে উক্ত বেদান্তের

অদ্বৈতবাদ নরেন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন কি? এবং ঐ অদ্বৈতবাদ তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল কি?—এ-বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলির মধ্যে আমরা অধিকারিবিশেষে প্রদত্ত উহাদের একটা সুস্পষ্ট ক্রম দেখিতে পাই। উত্তম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, সকলের জন্য এক ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে না। তিনি বলিতেন, 'যার পেটে যা সয়'। তাই উত্তম অধিকারী একমাত্র নরেন্দ্রনাথকেই তিনি অদ্বৈতবাদের উপদেশ দিতেন। অপরের জন্য অন্য ব্যবস্থা। সর্বসাধারণ ভক্তদের জন্য তিনি—**'ভক্তি-যোগই যুগধর্ম'। 'ভক্তিপথই সহজ পথ'। 'কলিতে নারদীয়া ভক্তি'** অর্থাৎ ভগবন্নামগুণগান কীর্তন—ইহাই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং নিজেও তদনুরূপ দ্বৈতভাবমূলক সাধনাদি আচরণ-করত সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর লোকের জন্য তিনি **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের** কথা বলিতেন। যথা, —'যেমন একটি বেল। খোলা, বিচি, শাঁস—সব একসঙ্গে ওজন করতে হয়। প্রথম শাঁসটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয়। তারপর বিচার ক'রে দেখে—যেই বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুর খোলা আর বিচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়—যা থেকে ব্রহ্ম ব'লছ, তাই থেকেই জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম।' —(কথামৃত ১।১৪।৭)

আর এক আছে—যা কিছু দেখছ, সব তিনি হয়েছেন—যেমন বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য।' —(ঐ ৩।২০.৩)

'প্রথমে নেতি নেতি ক'রে হরিই সত্য আর সব মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। তারপর সেই দ্যাখে যে, ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ—এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। **এইটি পুরাণের মত।** যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা। বেলের ওজন জানতে গেলে কোনটি বাদ দিলে চলবে না।'—(ঐ ৩।৮।১)

'পুরাণমতে ভক্ত একটি, ভগবান্ একটি, ······ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।' —(ঐ ২।১৩।১)

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে পুরাণের মত বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। এ মতটিও বহুলোকের উপযোগী। ত্যাগ-বৈরাগ্যাদি সাধনসহায়ে জগৎ ও তৎসহচারী যাবতীয় ভোগ্যবস্তুতে একান্ত মিথ্যাত্ব-বুদ্ধিপূর্বক তাহা ত্যাগকরত ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং তাঁহারা এইরূপ একটা মতবাদে সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন। সবই তিনি, কাজেই সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই—এরূপ জানিয়া তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হইয়া পরম কল্যাণভাগী হন।

পুনঃ আর একজাতীয় অধিকারীর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ **শাক্তাদ্বৈতবাদ** বিধান করিয়াছেন। তাঁহার কথার মধ্যে এই মতের কথাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 'মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব'। এই মাতৃভাবের উপাসনার বিশেষ প্রচারের জন্যই তাঁহার আগমন। কাম-কলুষিতবুদ্ধি জীবগণের পক্ষে ইহা মহৌষধ। শক্তিবাদবিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :

'জগতে একমাত্র **ব্রহ্মবস্তু** বা **শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ ভাবই** কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।'—(লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ-১১৪)

'জগতে **বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া** দুই-ই আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত।'—(কথামৃত, ৩।১।৩)

'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ। যখন নিষ্ক্রিয় ব'লে বোধ হয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। আবার যখন ভাবি, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি, কালী বলি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি।'—(ঐ ৩।১।৬)

'জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও-সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হ'লে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। আমায় মা দেখিয়ে দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন। সব চিন্ময়—প্রতিমা চিন্ময়—বেদী চিন্ময়—কোশা-কুশি চিন্ময়—চৌকাঠ চিন্ময়—সব চিন্ময়।' —(ঐ ৪।৩।৩)

'বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। অবিদ্যামায়া মানুষকে ঈশ্বর থেকে তফাৎ ক'রে লয়ে যায়। বিদ্যার খেলা জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য।'—(ঐ ৩।৭।৩)

'যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী, মা, আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে শক্তি বা কালীর উপমা।' —(ঐ ১।১২।৯)

'ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। বলে—মা, পথ ছেড়ে দাও। তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।'—(ঐ ৪।৩২।১)

শক্তি-উপাসনার মূল সিদ্ধান্ত এই যে, সচ্চিদানন্দময় নির্গুণ ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণময়ী মহাশক্তিতে কাল্পনিক ভেদমাত্র, বাস্তব কোন ভেদ নাই। শক্তি যখন ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহাকে নির্গুণ বলে; পুনঃ শক্তি যখন ব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে সগুণ বলে।

'ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥'
—(মহানির্বাণ-তন্ত্র ৪।১৫)

—স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সাকার, নিরাকার—সবই তুমি। তোমায় কে জানিতে সমর্থ?

দ্বৈতপ্রপঞ্চের অবস্থাতে তাঁহার স্ব-স্বরূপের অনুভব করাইতে সহায়তাকারিণী শক্তিকে শাক্তমতে **বিদ্যাশক্তি** বলে এবং স্ব-স্বরূপ বিস্মরণকারিণী শক্তিকে **অবিদ্যাশক্তি** বলে।

'বিদ্যাবিদ্যেতি দেব্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব।
একয়া মুচ্যতে জন্তুরন্যয়া বধ্যতে পুনঃ॥'
—(দেবী ভাঃ)

তান্ত্রিকগণ সংসারকে সত্য বলিয়া মানেন, কারণ শিব বা জগদম্বার সক্রিয় রূপটিই সংসার। শিব চেতনের অব্যক্ত রূপ ও শক্তি উহার সক্রিয় রূপ। শাংকর-বেদান্তমতে একই কালে শিবের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় রূপ স্বীকৃত হয় না এবং জগৎও সত্য বলিয়া মানা হয় না। তাঁহারা বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা বা মায়ার নাশ মানেন, কিন্তু তন্ত্রমতে মায়া ও বিদ্যা একই বস্তুর অশুদ্ধ ও শুদ্ধ অংশমাত্র। শুদ্ধ অংশ দ্বারা অশুদ্ধ অংশ সর্বাবস্থার জন্য সম্পুটিত হইলে মোক্ষ হয়। শাংকর-মতে বিদ্যার দ্বারা মায়ার নাশ ও অখণ্ডাকারা বৃত্তি অর্থাৎ ঐ বিদ্যাও তৎক্ষণে স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তন্ত্রমতে শুদ্ধরূপে মায়া নিত্যপ্রকাশসহ অভিন্ন হইয়া বর্তমান থাকে। শাংকর-বেদান্তের ন্যায় মহামায়া

চেতনস্বরূপে আরোপিত বা অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু উহা নিত্য, অনপায়ী ও স্বভাবভূত। তন্ত্রে পরমাত্মা মাতৃরূপে স্বীকৃত। এই কল্পনার মূল দেবীসূক্ত—(ঋগ্বেদ, ১০।১২৫)। শাক্ততন্ত্রমতে মায়া ব্রহ্মের সমকক্ষা ও সমদেশ-বিশিষ্টা। সমকক্ষা অর্থাৎ সমসত্তাবিশিষ্টা ও সমদেশ অর্থাৎ তুল্য ব্যাপকতাবিশিষ্টা। পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্টা মায়া ব্রহ্মসহ অভিন্ন ও তুল্য ব্যাপক। বেদান্তমতের মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম তন্ত্রমতে নাই। তন্ত্রের ব্রহ্ম সর্বদাই মায়া-শবলিত। শক্তি অন্তর্মুখ হইলেই শিব। শিবই বহির্মুখ হইলে শক্তি। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ—উভয় ভাবই সনাতন। শাক্তমতে অদ্বৈতবাদসহ ভক্তি ও উপাসনার সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছে। মায়ারূপ পরা শক্তি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যথা—

'শক্তিশ্চ শক্তিমদ্রূপাৎ ব্যতিরেকং ন বাঞ্ছতি।
তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহকয়োরিব ॥'—
(শক্তিদর্শন)

—শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। যেমন বহ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি।

মোক্ষকালেও মায়ার সর্বথা উচ্ছেদ হয় না। উহা নিত্যা। বদ্ধাবস্থাতেই মায়া বহির্মুখী ও মোক্ষাবস্থায় অন্তর্মুখী। ইহাই বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার পার্থক্য। 'মুক্তাবন্তর্মুখৈব ত্বং ভুবনেশ্বরি তিষ্ঠসি।' —(শক্তিদর্শন)

মায়ানিত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ :

'মায়া নিত্যা কারণঞ্চ সর্বেষাং সর্বদা কিল।'—(দেবী-ভাঃ) 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ।'—(মার্কণ্ডেয় পুরাণ) 'প্রকৃতি-পুরুষশ্চেতি নিত্যৌ।'— (প্রপঞ্চসার-তন্ত্র) শক্তিবাদ সাংখ্যের দ্বৈতবাদেরও আগে অগ্রসর হইয়াছে এবং উহা বেদান্তের অদ্বৈতবাদে পৌঁছিবার শেষ ধাপ বা সিঁড়ি। ঈশ্বর জগদতীত ও জগৎই ঈশ্বর—এই দুই সিদ্ধান্তের মূলরূপে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। শাংকর-বেদান্তও ব্রহ্ম এবং জগতের তাদাত্ম্য মানেন, কিন্তু উহা আধ্যাসিক। ভেদ কাল্পনিক, অভেদই পারমার্থিক সত্য। রামানুজ স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ বলেন।

শক্তিবাদী তান্ত্রিকও অদ্বৈতবাদী। ইহা বিলক্ষণ-অদ্বৈতবাদ। ইহাতে প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন জগন্নিদান মায়াও আছে, পরন্তু ঐ মায়া ব্রহ্মের স্বভাবভূতা, অতএব অভিন্না বলিয়া অদ্বৈতের বিরোধী হয় না। ইহাই **শাক্তাদ্বৈতবাদ**। এই মতে একই কালে ব্রহ্ম এক ও অনেক। একত্বপক্ষ লইয়া জ্ঞানদ্বারা পরমমুক্তি হইতে পারে এবং অনেকত্বপক্ষ লইয়া লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সম্ভব হয়। যথা—

'একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিক-ব্যবহারৌ সেৎস্যতঃ' ইতি।

এই সিদ্ধান্ত সেই তান্ত্রিকগণই বলেন, যাঁহাদের মতে ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তিই ঈপ্সিত।

শাংকর-মতে সর্ব বিকার অসত্য ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। আচার্য শংকর বলেন, ব্রহ্মের শক্তিও মিথ্যা এবং উহা অবিদ্যাধ্যস্ত নামরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে। ভ্রান্তিবশতই লোকে শক্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ শক্তি ঈশ্বরের বাস্তব স্বরূপও নহে এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে বলিয়া উহা অনির্বচনীয়া অর্থাৎ মিথ্যা।

আচার্য শংকর নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদী হইয়াও মহামায়া, আদিশক্তি, জগজ্জননীরূপে ঈশ্বরোপাসনার বিধান দিয়াছেন। কারণ তাঁহার সর্বব্যাপক অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্যাবহারিক

দৃষ্টিতে সর্ব কর্ম, উপাসনা ও ধ্যান সমাধি-আদির যথাযথ স্থান রহিয়াছে।

শাক্তদর্শন যদিও শাংকর-সিদ্ধান্তের ন্যায় অদ্বৈতবাদী তথাপি শাক্তমতের অদ্বৈততত্ত্ব অকর্তা, অভোক্তা, নির্গুণ, নির্বিশেষ নহে—উহা শক্তিময় ও বিমর্শরূপ। ক্রিয়াশক্তির নাম বিমর্শ। এই ক্রিয়াশক্তি উহাতে সদা বিদ্যমান। উভয় মতেই প্রপঞ্চ কেবল প্রতীতিমাত্র। কিন্তু বেদান্তমতে এই দ্বৈত-প্রতীতি ভ্রমমূলক এবং শাক্তমতে উহা পরমার্থ-তত্ত্বের সহজ সামর্থ্য। বেদান্তমতে প্রপঞ্চের সাক্ষাৎকারণ অনাদি অনির্বচনীয়া মায়া (প্রপঞ্চ মায়ার পরিণাম ও চেতনের বিবর্ত), আর শাক্তমতে উহা পরমতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যমূলক সংকল্প। উভয় মতেই দৃশ্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

উভয় মতের সাধনেরও ভিন্নতা বিদ্যমান। অদ্বৈত বেদান্ত একমাত্র **বিচারকেই** তত্ত্বোপলব্ধির সাধন বলিয়া থাকেন। কারণ, এই মতে পরব্রহ্ম সাধকের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ। উহা নিত্যপ্রাপ্ত এবং অবিদ্যাবশতই অপ্রাপ্তের ন্যায় ভ্রম হইয়া থাকে মাত্র। অতএব বিচারপ্রভব সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি হইলে নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপস্থিতি স্বয়ংই সাধিত হয় এবং এই জন্য গুরুমুখে বেদান্তোক্ত মহাবাক্যার্থ শ্রবণের আবশ্যকতা আছে। কারণ যেস্থলে বস্তু অতি সন্নিহিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ—সম্মুখে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানবশতঃ অপ্রাপ্তিভ্রম হয়, সেস্থলে সেই বস্তুর পরিচয় কোন আপ্ত পুরুষের কথন বিনা অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। যে শুদ্ধচিত্ত জিজ্ঞাসুর মল-বিক্ষেপাদি কোন দোষ নাই, গুরুর উপদেশ শ্রবণমাত্রই তাঁহার অপ্রতিবদ্ধ দৃঢ় জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিত্তগত মলিনতাবশতঃ যাহার সংশয়-বিপর্যয় দোষ বিদ্যমান, তাহার পক্ষে শ্রবণান্তর মনন ও নিদিধ্যাসন কর্তব্য। উহা পরিপক্ব হইলে অখণ্ডাকারা বৃত্তির উদয়ে সাধকের অপ্রতিবদ্ধ সম্যক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই প্রকারে অদ্বৈত-বেদান্তমতে মহাবাক্যার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন। বিচার অর্থাৎ মননাসমর্থ পুরুষের জন্য যোগাভ্যাস এবং উপাসনাদিরও ব্যবস্থা এই মতে আছে। (পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ দ্রঃ)।

শাক্তমতে কিন্তু বিচার জ্ঞানের সাধন নহে। এই মতে শাস্ত্র ও গুরূপদেশে কেবল পরোক্ষজ্ঞান-মাত্রই হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা মোক্ষ হয় না। মোক্ষপর্যবসায়ী অপরোক্ষ-জ্ঞান পরিপক্ব **সমাধি** দ্বারাই হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, এই সিদ্ধান্তে যদিও ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ এবং সকলের স্বরূপ, তথাপি উহার তিরোধান অজ্ঞান বা অবিচারজনিত নহে, কিন্তু চৈতন্যের ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রতিভাসিত দৃশ্যবর্গই উহার কারণ। দৃশ্য সত্য, অতএব উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সমাধি-ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং একমাত্র নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিত হইলেই পরমতত্ত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া ষট্‌চক্র-ভেদপূর্বক সহস্রারে মন উঠিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই এই মতের বৈশিষ্ট্য।

বেদান্তমতে ষট্‌চক্রের কোন ব্যাপার নাই। শাক্তগণ এই বিষয়ে যোগমার্গের অনুগমন করিয়া থাকেন, **উভয়েই দ্বৈতসত্যত্ববাদী**। কাজেই তাঁহাদের মতে সমাধি ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কোন সাধন নাই। বেদান্তীরাও অনুকূল বিবেচনাকরত এই সাধনাটি অর্থাৎ যোগাভ্যাস বিচারমার্গসহ মিলিত করিয়া লন বটে, কিন্তু

সে-ক্ষেত্রেও বিচারই মুখ্য সাধনরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যোগাভ্যাস চিত্তৈকাগ্র্যের সহায়ক হইয়া থাকে মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন :

'জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ। শুধু জ্ঞান বিচার করছি, অনুরাগ নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ—কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিতা থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ হ'লে তার ভক্তি প্রেম—এই-সব হয়। এরই নাম **ভক্তিযোগ**।
—(কথামৃত ২।১১।৪)

কুণ্ডলিনী-জাগরণাদি—এই সবই যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের কথা। তন্ত্রে মহাশক্তির উপাসনার পূর্ণ বিকাশ। **উহার অন্তিম পরিণতি বেদান্তের নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মবাদ।**

শক্তিবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বচনসমূহ মিলাইয়া দেখিলেই তাহাদের তাৎপর্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। আচার্য শংকর যেমন শুদ্ধ নির্বিশেষ অদ্বৈতের ভিত্তিতে কর্ম, বিবিধ উপাসনা ও **সর্ব বৈদিক মতবাদের সমন্বয়** করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তদ্রূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদাবলম্বনেই **সর্ব বৈদিক ও অবৈদিক** ধর্মসমূহের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন :

'ইসলামধর্ম-সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর, জ্যোতির্ময় পুরুষ-প্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট্ ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক **তুরীয় নির্গুণব্রহ্মে** তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।'
—(সাধকভাব)

এইরূপ তাঁহার সর্বধর্ম সাধন বিষয়েই বোদ্ধব্য। তাই তিনি বলিয়াছেন :

'বেদান্ত-বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ আমি ভক্ত-এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।'
—(কথামৃত ১।৩।৫)

'দেখ, **অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে।** আত্মজ্ঞানীরা বলে—সোঽহম্—অর্থাৎ আমি সেই পরমাত্মা। এ-সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীদের মত, সংসারীর পক্ষে এ-মত ঠিক নয়।······'
—(কথামৃত ১।৭।১)

'লীলাই শেষ নয়। এ সব ভাবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এই ভাবে রইলুম।'
—(ঐ ২।২২।৩)

'জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না।······উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত। সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম।'
—(ঐ ২।২৪।৬)

'মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'

'বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষি-স্বরূপ। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য।'
—(ঐ ১।১৩।৬)

'চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল, স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা, এক নিত্য বস্তু সেই আত্মা।'
—(ঐ)

'ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। ব্রহ্ম তিন গুণের অতীত। নেতি নেতি ক'রে যা বাকি থাকে, আর যেখানে আনন্দ—তাই ব্রহ্ম।'
—(ঐ ৩।৫।১)

'যে বলে—আমি নেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ।' —(ঐ ৩।৭।২)

'আমায় তিনি দেখিয়েছিলেন—পরমাত্মা, যাঁকে বেদে শুদ্ধ আত্মা বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অটল—সুমেরুবৎ। নির্লিপ্ত—আর সুখদুঃখের অতীত।' —(ঐ ৩।৮।২)

'আমি আর পরব্রহ্ম এক। মায়ার দরুণ জানতে দেয় না।' —(ঐ ৩।১০।২)

'রাম বুঝালেন—লক্ষ্মণ, এ যা কিছু দেখছ, এ-সবও স্বপ্নবৎ অনিত্য—সমুদ্রও অনিত্য—তোমারও রাগও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যাদ্বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা।'

—(ঐ ৩।১৬।১)

'কি জানো— জীবজগৎ-বাড়ি-ঘরদোর-ছেলেপিলে—এ-সব বাজীকরের ভেল্কি। বাজীকরই সত্য আর সব অনিত্য। এই আছে, এই নাই। জন্ম মৃত্যু—এ-সব ভেল্কির মতো। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য।'

—(ঐ ৩।১৭।২)

'বেদান্তমতে **'ব্রহ্মই বস্তু, আর সব মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু।'** —(ঐ ২।১৩।১)

'জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণ-স্বরূপ।' —(ঐ ৪।৩২ ১)

'বিচার করতে গেলে এ-সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। **শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।'** —(ঐ ১ ২।৪)

অদ্বৈত-বেদান্তের উপদেশ এইরূপে ঠাকুর স্থানে স্থানে দিলেও পরক্ষণেই আবার সকলকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছেন :

'কিন্তু যারা সংসারে আছে, যাদের দেহ-বুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহম্—এই ভাবটি ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য-সেবক-ভাবে থাকবে।—হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য, প্রভু—আমি সেবক, তোমার দাস।'

সর্বসাধারণের জন্য ঠাকুর ভগবন্নামগুণগান-কীর্তন, সাধুসঙ্গ, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা—এই সবেরই বিধান দিয়াছেন। তাহাদের জন্য জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ—এই ভাব নয়। বড় জোর—তিনিই সব, জীব জগৎ সবই তিনি—এই ভাব লইয়া তাহাদের উপাসনা করা কর্তব্য। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা তন্ত্রের শাক্তাদ্বৈতবাদ পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। পরবর্তী জীবনে স্বামীজী নিজেও এই কথা স্বীকার-করত বলিয়াছেন :

'He (Sri Ramakrishna) used generally to teach dualism. As a rule he never taught Advaitism. But he taught it to me'. (C. W. VII. P. 400.)

স্বামীজীর ন্যায় বিরল উত্তম অধিকারীর জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের অদ্বৈত উপদেশ করিয়াছেন। স্বামীজীকে প্রথম হইতেই ঠাকুর অষ্টাবক্রসংহিতাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছেন। **অষ্টাবক্রসংহিতায় বেদান্তের অজাতবাদ ও দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ** সুস্পষ্ট। ইহাতে শিষ্য রাজর্ষি জনক ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গুরু অষ্টাবক্রের সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়টি আমরা এখানে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শিষ্য প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'হে প্রভো! জ্ঞানলাভ কি করিয়া হয়, মুক্তির উপায় কি এবং বৈরাগ্যই বা কি প্রকারে লাভ হয়, তাহা বলুন।'

গুরু বলিতেছেন :

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ॥ ১।২

—হে বৎস! যদি আত্যন্তিক মুক্তি কামনা করিয়া থাক, তবে বিষয়সমূহ বিষজ্ঞানে

পরিত্যাগ কর এবং অমৃতজ্ঞানে ক্ষমা, সরলতা, সন্তোষ ও সত্যাদি সাধন অভ্যাস কর।—তীব্র বৈরাগ্যবান্ স্বামীজীর ন্যায় মুমুক্ষু ব্যতীত এইরূপ উপদেশ আর কে পালন করিতে সমর্থ ?

গুরু বলিতেছেন :

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখং চর॥ ১।১০
নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি॥ ১।১৫
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্॥ ১।১৬

—হে শিষ্য ! তুমি পরমানন্দজ্ঞানস্বরূপ, **রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় তোমাতে এই বিশ্ব প্রতিভাসিত হইতেছে।** তুমি নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানাদি সর্ব-মলিনতারহিত। তুমি সদামুক্ত, সমাধি অবলম্বনে তুমি মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিতেছ—ইহাই তোমার ভ্রান্তি। **তুমি স্বরূপতঃ বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছ,** তুমি শুদ্ধবুদ্ধ-স্বরূপ, কেন নিজেকে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীব বলিয়া ভাবিতেছ ?

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ॥ ৫।৩
স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা।
মিত্রক্ষেত্রধনাগারদারদায়াদিসম্পদঃ॥' ১০।২
যত্র যত্র ভবেত্তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্র বৈ।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাশ্রিত্য বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব॥১০।৩

—অবস্তুভূত এই জগৎ প্রত্যক্ষগোচর হইলেও ইহা শুদ্ধস্বরূপ তোমাতে কোনকালেই নাই। জগৎ রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রতিভাসমাত্র—ইহা জানিয়া শান্ত হও। কতিপয় দিবসমাত্র স্থায়ী মিত্র, ক্ষেত্র, ধন, গৃহাদি **পদার্থ স্বপ্নসম ও ইন্দ্রজাল-সদৃশ বলিয়া জানো।** তৃষ্ণাই সংসারের কারণ, তীব্রবৈরাগ্য-সহায়ে তুমি তৃষ্ণারহিত হইয়া সুখী হও।

যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথক্ ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্॥
১৫।১৪
ন কদাচিজ্জগত্যস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতি।
যত একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্॥'
১৭।২

—হে শিষ্য ! **যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, তাহা তোমারই রূপ।** ভূষণ কি কখনও স্বর্ণ হইতে পৃথক্ প্রতিভাত হয় ? **স্ব-স্বরূপ দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ,** ইহা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ আর এ সংসারে কখনও কোনও খেদ প্রাপ্ত হন না।

সুযোগ্য শিষ্য রাজর্ষি জনকের প্রতি তত্ত্বজ্ঞ গুরু শ্রীঅষ্টাবক্রের একম্বিধ সুন্দর উপদেশেই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। উপদেশলাভের পর শিষ্য জনকও আপন কৃতকৃত্যতা জ্ঞাপনকরত বলিতেছেন :

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্॥ ২।৫
প্রকাশো মে নিজং রূপং
নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি॥
অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্যকরে যথা॥
মত্তো বিনির্গতং মধ্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা॥
২।৮—১০

—পট যেরূপ তন্তুমাত্রই, বিচারদ্বারা বিশ্বও তদ্রূপ আত্মরূপেই নিশ্চিত হইয়া থাকে। আমি প্রকাশস্বরূপ, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহি। **বিশ্বে যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে, আমিই সেইরূপে প্রকাশিত হইতেছি।** অহো !

শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প ও সূর্যরশ্মিতে জলভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানবশতই আমাতে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে। যেরূপ কুম্ভ মৃত্তিকা হইতে, তরঙ্গ জল হইতে এবং ভূষণ সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কারণেই লয়প্রাপ্ত হয়, এই বিশ্বও সেইরূপ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে।

অহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ।
অতো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥ ৭।৫
কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সংচিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যথা যৎ কর্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে যথাসুখং॥
—১৩।৩

—অহো! আমি চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, **ইন্দ্রজালতুল্য এই জগৎ আমাতে প্রতিভাসমাত্র**। এখন আর আমার কোন ত্যাজ্য-গ্রাহ্য কল্পনা নাই, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ইহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। যখন যে-কর্ম আসিয়া উপস্থিত হয়, (প্রারব্ধচালিত) আমি তাহাই অনুষ্ঠানকরত পরমসুখে বাস করিতেছি।

অষ্টাবক্রসংহিতার সিদ্ধান্ত এই যে, এক নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সৎ ও চির-বিদ্যমান, জীব জগৎ উহাতে স্বতন্ত্র সত্তাহীন প্রতিভাসমাত্র। দ্বৈত একান্ত মিথ্যা, উহার কিঞ্চিন্মাত্রও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অবিদ্যা-প্রভাবে এক সদ্ ব্রহ্মই দৃশ্যরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালসদৃশ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রতীতিকাল ভিন্ন বিদ্যমান থাকে না। চেতনরূপ অধিষ্ঠানেই এই দৃশ্যপ্রতীতির উদ্ভব ও তাহাতেই বিলয় হইয়া থাকে। এক অখণ্ড চিৎসমুদ্রে তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদাদির ন্যায় বিবিধ দৃশ্যবর্গ পরিদৃশ্যমান। তরঙ্গাদির মিথ্যা নামরূপ পরিত্যাগ করিলে যেমন এক সমুদ্রই অবশেষ থাকে, তেমনি দৃশ্যবর্গও নামরূপবিরহিত হইয়া এক চিৎসমুদ্রেই মিলিয়া যায়। স্ব-স্বরূপভূত সর্বব্যাপক এই চেতনকে বেদান্ত-বিচারদ্বারা জানার নামই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানলাভ হইলেই সর্বানর্থ, সর্বসংসারদুঃখ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায় ও পরমানন্দ লাভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ—ব্রাহ্মসমাজের দ্বৈতভাবমূলক সগুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ—কিন্তু প্রথমে গুরুসমীপে এই সিদ্ধান্ত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই, ইহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম, স্বষ্ট জীব কিনা ব্রহ্ম! ঋষিদের মাথা খারাপ হওয়াতে তাঁহারা এরূপ লিখিয়াছেন – এই সব বলিয়া তিনি কটাক্ষও করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে এইরূপ বলিলেও তাঁহার পরবর্তী জীবনে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তিনিও ঋষিদের সুরেই সুর মিলাইয়া বলিতেছেন :

'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে,
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।'

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধীরেশানন্দ

আমরা স্বামীজীর দিব্য অনুভূতি-সমুজ্জ্বল বাণী, যাহা তিনি নিজ হস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই সংগ্রহ করিয়া বিচার করিব।

'সন্ন্যাসীর গীতি'তেও তিনি বলিতেছেন :

'............but far beyond
Both name and form in Atman ever free
Know Thou art That. Sannyasin bold
say—Om Tat Sat Om.'
'*The Self is all in all none else exists* ;
And Thou art That............'
'There is but One—the Free
the knower Self !
Without a name, without a form or stain.
In Him is Maya dreaming all this dream.
The Witness, He appears as nature, soul.
Know Thou art That............
'Release the soul for ever.
No more is birth,
Nor I, nor Thou, nor God nor man.
The '*I*'
Became the All, the All is '*I*' and Bliss.
Know Thou art That............'.

১৮৯৮ খৃঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য লিখিত তাঁহার উদ্বোধন-বাণীতে দেখিতে পাই স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন :

Awake, arise and *dream no more* !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands
with our thought.
Of flowers sweet or noxious, and none
Has root or stem, being born
in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. *Be bold and face
The Truth ! Be one with it.
Let visions cease.
Or, if you cannot, dream then
truer dreams.
Which are Eternal Love and Service Free.*

স্বামীজীর এই বাণীগুলির মধ্যে আমরা অষ্টাবক্রসংহিতার সুরেরই ঝঙ্কার শুনিতে পাইতেছি নাকি? দক্ষিণেশ্বরে তিনিই এক-দিন ঠাকুরকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন, 'ঘটিটা ব্রহ্ম, বাটিটা ব্রহ্ম—সব ব্রহ্ম, একি কখনও হ'তে পারে? সৃষ্ট জীব—ব্রহ্ম. এরূপ মনে করাও পাপ।' তুল্য সন্দেহে পতিত জনৈক শিষ্যকে স্বামীজীই পরবর্তী জীবনে অনুরূপ বলিয়াছেন। তখন তিনি অধ্যাত্মমার্গে সংশয়াকুল সাধক নরেন্দ্রনাথ নন, লোকোত্তর সাধনপ্রভাবে গুরুকৃপায় তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভূতির অধিকারী—সিদ্ধ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। অদ্বৈত-জ্ঞানের বিমল প্রভায় তখন তাঁহার হৃদয়াকাশ সমুজ্জ্বল। সংশয়ের লেশমাত্র তখন নাই। স্বামীজী শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন :

I never taught *Such queer thought*
That all was God unmeaning talking—
But this I say Remember pray,
That *God is true, all else is nothing* !
The world is a dream, Though true it seem:
And only Truth is He, the Living !
*The real me is none but He—
And never never matter changing !*'

'জীবন্মুক্তের গীতি'তেই স্বামীজী আপন অনুভব অনন্তসুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন :

'Before even Time has had its birth,
I was, I am and I will be.
'I am beyond all sense, all thought,
The Witness of the Universe !
'*From dreams awake*, from bonds be free.
Be not afraid—this mystery,
My shadow cannot frighten me !
Know once for all that I am He !'

নিজের দিব্য অনুভূতির অনুপম পরিচয় স্বামীজী তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈত অনুভূতির চরম শিখরেই তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন এবং সেই বাণীই তিনি দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জীব-কল্যাণার্থ অকাতরে সকলকে বিলাইয়া গিয়াছেন। স্বীয় গুরুর নিকট হইতে যেমন তিনি এই অলৌকিক বিদ্যা মুক্তভাবেই লাভ করিয়াছিলেন তেমনি মুক্তভাবেই তাহা সকলকে দান করিতেও তিনি কোন কার্পণ্য করেন নাই।

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি-লাভে কৃতার্থ হইলেও স্বামীজী কিন্তু জগতের প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। সর্বভূতে এক ব্রহ্মদর্শনকরত তিনি তাঁহারই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়॥

ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধ না হইলে এবং আত্ম-জিজ্ঞাসা না জাগিলে বেদান্ততত্ত্ব সাধকহৃদয়ে স্ফুরিত হয় না—ইহা বেদান্তের সুস্পষ্ট নির্দেশ। পূর্ব পূর্ব যুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্যেরা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্রাদির বিধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। এখন অগ্নিহোত্রাদি করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবার সুযোগ ও অবসর কোথায়? তাই স্বামীজী যুগোপযোগী সাধন বিধান করিলেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

জীব-শিব, শিববুদ্ধিতে জীবের সেবাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর—ইহাই যুগাচার্যের অভিনব বাণী। ঈশ্বরেচ্ছায় এই সুমহান্ আদর্শটিই তাঁহার জীবনে নিষ্কাম সেবাদ্বারা ধন্য হইবার সুযোগ প্রদান করত বিভিন্ন জীবরূপে স্বীয় ইষ্টই সাধকসমক্ষে উপস্থিত—এই জ্ঞানে জনতা-জনার্দনের সেবা করিতে পারিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তখন উপাসনায় পরিণত হয়। এইরূপে সেবা করিতে করিতে হৃদ্গত সমস্ত পাপ, ভোগবাসনাদি ও চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইয়া যায় ও সাধকের চিত্ত ক্রমে সত্ত্বগুণের উদয়ে শান্ত, অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ইহাই নিষ্কাম কর্মযোগের **'কসৌটি'** অর্থাৎ **'কষ্টিপাথর'**। তখন বেদান্তবিদ্যা সেই শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্তে সত্বর অতি অল্প আয়াসেই বিকশিত হয়। শ্রীগুরুমুখে লব্ধ এই সাধন-রহস্যটিও তিনি সকলের কল্যাণার্থ প্রকট করিয়া গিয়াছেন। ইহা স্বামীজীর একটি বিশেষ অবদান।

স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার বিষয়ে একটি শঙ্কা হইয়া থাকে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কত অধিকারী বিচার করিয়া তবে এই অদ্বৈত বেদান্ত উপদেশ দিতেন। একমাত্র প্রিয় নরেন্দ্রনাথকেই তিনি বিশেষভাবে অদ্বৈততত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী অধিকারিনির্বিশেষে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সকলকে এই উপদেশ দিলেন কেন? ইহাতে শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পন্থার বিরুদ্ধে আচরণ করা হইল না কি? শুনিয়াছি সংঘের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

'ঠাকুর লোক দেখিয়াই কে কিরূপ অধিকারী, তাহা বুঝিতে পারিতেন। আমাদের তো সেরূপ ক্ষমতা নাই? আমি

অকাতরে রত্ন বিলিয়ে গেলুম, যে অধিকারী, সে গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে। —কি সুন্দর সরল কথা! কি অপূর্ব হৃদয়বত্তা ও নিরভিমানতা! তত্ত্বজ্ঞ আচার্য ব্যতীত আর কে এরূপ কথা বলিতে পারেন?

স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তনির্ঘোষ ব্যর্থ হয় নাই। উহা পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে একটি সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। জগতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এখন এই তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন এবং নবযুগের উদ্‌গাতা স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁহার শিক্ষা বহু ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে ও বহুভাগ্যবান্ পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এখানে একটি ঘটনা লিখিলে মন্দ হইবে না। স্বামীজীর সাহচর্যে তাঁহার প্রিয় ইংরেজ শিষ্য মিঃ সেভিয়ার অদ্বৈত বেদান্তের একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং অদ্বৈত ভাবের চিন্তাতেই একান্ত অনুপ্রাণিত ছিলেন। শ্রীগুরুর ইচ্ছানুযায়ী অদ্বৈত ভাবের সাধনের অনুকূল একটি কেন্দ্র তিনি নির্মাণ করিলেন। উহাই মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম। অসীম পরিশ্রম সহকারে এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত হইয়া স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই তিনি হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে সেই আশ্রমেই দেহত্যাগ করিলেন। শুনিতে পাই, মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন,

'After my death, please cremate the body and throw the ashes into the wind. Never raise any monument on that spot of cremation. I don't like to be remembered as an individual soul. I am one with the Universal Spirit.' —

—ফলীভূত অদ্বৈতবেদান্ত-নিষ্ঠার কি সুন্দর অভিব্যক্তি! বলা বাহুল্য সেভিয়ার সাহেবের শেষ অনুরোধ যথাযথ রক্ষিত হইয়াছিল।

সর্ব পরিচ্ছিন্ন বস্তু (ঘটি, বাটি) কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পারে, এই শঙ্কা একদিন যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরু-সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বেদান্ত যখন বলেন, 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম', তখন বস্তুতঃ অধিষ্ঠান-তত্ত্বের জ্ঞানে যখন সর্ব নামরূপ বাধিত হইয়া যায়, তখনই সর্ব জগৎ ব্রহ্মাভিন্ন-রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। পুরুষের যখন স্থাণু ভ্রম হয়, তখন পুরুষবুদ্ধিদ্বারা স্থাণুত্ব-বুদ্ধি যেরূপ বাধিত বা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ। ইহাকেই বেদান্তে **'বাধসামানাধিকরণ্য'** বলা হইয়া থাকে। উত্তরকালে স্বামীজী সর্ব নামরূপ বাধপূর্বকই ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছিলেন ও তাহাই তিনি স্বীয় লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বে তাঁহার রচিত কবিতা-সঞ্চয় 'বীরবাণী' হইতে উদ্ধৃতিসমূহে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছি।

নরেন্দ্রনাথ একদিন স্বীয় গুরুর নিকট সদা নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া থাকিবার বাসনা অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ নরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই কামনা স্বাভাবিক। কিন্তু গুরু উত্তর দিয়াছিলেন :

'তুই অত বড় আধার, কালে কত লোকের আশ্রয় হবি। কেবল সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানুভব করবি কেন? তার চেয়েও বড় অবস্থা তোর হবে, ইত্যাদি।'

নির্বিকল্প সমাধিই সর্বোচ্চ অবস্থা, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর এখানে তার চেয়েও বড় অবস্থার কথা বলিয়া কি সূচনা করিলেন? বিচারাদি সাধনসহায়ে যখন এক অখণ্ডাকারা বৃত্তি অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উদয় হয়, তখন সর্ব দ্বৈতপ্রতীতি ও ভাবনারহিত হইয়া চিত্ত নির্বিকল্প অবস্থাতে সমাহিত হইয়া

পড়ে, ইহা সত্য কথা। অখণ্ডাকারা বৃত্তিদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপাবরক অজ্ঞান (**আবরণশক্তি**) নাশ হইয়া গেলেও প্রারব্ধপ্রতিবন্ধবশতঃ অজ্ঞানের **বিক্ষেপশক্তি** ও তাহার কার্য (দেহেন্দ্রিয়াদি ও বাহ্য পদার্থ) বাধিত ভাবে প্রারব্ধভোগশেষ পর্যন্ত অবস্থান করে, উহার জ্ঞানকালেই নাশ হয় না। অতএব জ্ঞানের পরও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ব্যবহার দেখা যায়। তাঁহার এই ব্যবহারের নিয়ামক তাঁহার প্রারব্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছা। জ্ঞানী ব্যবহারকালে কি স্ব-স্বরূপ-বোধ ভুলিয়া যান? অর্থাৎ কেবল সমাধি-কালেই কি তাঁহার ঐ অনুভব হইয়া থাকে? —এই শঙ্কার উত্তরে **বেদান্ত বলেন যে, জ্ঞানী ব্যবহারকালেও সদাসমাধিস্থই থাকেন।** তাঁহার স্বরূপের বিচ্যুতি আর কখনই হয় না। উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে সর্বাবস্থাতেই জ্ঞানী স্বরূপস্থ। ইহা এক অপূর্ব স্থিতি। ইহা সাধারণের বোধগম্য নয়। তত্তুল্য জ্ঞানীই ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারেন।

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্ত বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে॥

—অন্তরে আত্মদৃষ্টিসহায়ে নির্বিকল্প নিশ্চয়, কিন্তু বাহিরে যেন অজ্ঞানী-তুল্য স্বচ্ছন্দ ব্যবহার —জীবন্মুক্ত পুরুষের এই অপূর্ব অবস্থা তত্তুল্য অন্য জ্ঞানিগণই জানিয়া থাকেন।

তখন আর তাঁহার নিজের কোন কর্তব্যই থাকে না। ধ্যান, সমাধি, বিক্ষেপ—এই সকলই চিত্তধর্ম, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া তিনি স্বরূপস্থিতি লাভ করেন। তখন সর্ব-ব্যবহার করিয়াও তাঁহার সর্বদা **ব্রাহ্মীস্থিতি**। ইহাকেই আচার্যগণ—**'জ্ঞানসমাধি' 'সবোধ সমাধি'** বা **'সহজাবস্থা'** বলিয়াছেন। এই সমাধি হইতে জ্ঞানীর আর ব্যুত্থান হয় না।

অন্য আয়াসসাধ্য নির্বিকল্প সমাধি হইতে *যোগীর কোন না কোন সময়ে ব্যুত্থান ঘটিয়া* থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আর ব্যুত্থান নাই। এই স্থিতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্য বলিয়াছেন (বাক্যসুধা ৩০):

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥

—পরমাত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন দেহাভিমান নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তখন যে যে বিষয়েই মন ব্যাপৃত হউক না কেন, সেখানেই জ্ঞানীর সমাধি অবস্থা। অর্থাৎ **বিষয় ব্যবহার-কালেও জ্ঞানী 'জ্ঞানসমাধি' হইতে বিচ্যুত হন না।** এই অবস্থা সূচনা করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া-ছিলেন, 'তুই কেবল সমাধিকালে কেন ব্রহ্মানু-ভব করিতে চাস্, উঠতে বস্‌তে সর্বব্যবহারেই তোর ব্রহ্মানুভব হবে।' —ইহাই বেদান্তোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মানুভব। বলা বাহুল্য এই অবস্থাই লাভ করত স্বামীজী কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

কেবল সমাধিকালে অদ্বৈতানুভব, ইহা শাক্ত-অদ্বৈতবাদের মত। সে মতে মন ষট্‌চক্র ভেদ পূর্বক সহস্রারে উঠিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব ঘটিয়া থাকে এবং অভেদ জ্ঞান হয়। নিম্ন চক্রে মন নামিলে দ্বৈত প্রতীতি উপস্থিত হওয়াতে সেই অভেদ জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু **বেদান্তের মতে জ্ঞান হইলে দ্বৈতসত্তার একান্ত অভাব ঘটিয়া থাকে,** অর্থাৎ স্বসত্তাতিরিক্ত সত্তা কোন কালেই নাই। সুতরাং **দ্বৈতপ্রতীতি দ্বারা অদ্বৈতানুভবের কোন হানি হয় না। কারণ ঐ দ্বৈতপ্রতীতি একান্ত মিথ্যা। শাক্ত-মতে দ্বৈতপ্রতীতি সত্য, আর বেদান্ত-মতে উহা মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র—ইহাই রহস্য।** এই রহস্যের বোধ না থাকাতেই অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়া

থাকেন যে, কেবল একমাত্র নির্বিকল্প সমাধি-কালেই ব্রহ্মানুভব হয়, অন্য কালে নয়। জ্ঞানী সমাধিকালেও যেরূপ অদ্বয় ব্রহ্মানুভব করিয়া থাকেন, ব্যবহারকালেও তদ্রূপ অদ্বয় ব্রহ্মানুভবই করেন। ব্যবহারকালে দ্বৈত-প্রতীতি হইলেও তাহা দ্বারা তাঁহার অদ্বয়ানুভব ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে দ্বৈত মিথ্যাপ্রতীতি মাত্র। দ্বৈত বলিয়া কোন পদার্থের বাস্তব সত্তা নাই।

সমাহিতা ব্যুত্থিতা বা বৃত্তিঃ সর্বা চিদাকৃতিঃ॥
ন সমাহিত ধীঃ কশ্চিৎ প্রতীচোঽন্যৎ প্রপশ্যতি।
ব্যুত্থিতায়াপি চাত্মানং পশ্যন্নেবান্যদীক্ষতে॥

—(বৃহঃ বার্ত্তিকসার ২।৪।৪০, ৪১)

...সমাধি বা ব্যুত্থান সর্বকালেই জ্ঞানীর বৃত্তি চিদাকার হইয়া থাকে। সমাধিস্থ পুরুষ প্রত্যক্‌চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না, পুনঃ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া তিনি অন্য পদার্থ দর্শন করিলেও সদা আত্মানুভবই করিয়া থাকেন। কারণ—

অদৃষ্টা দর্পণং নৈব তদন্তস্থেক্ষণং তথা।
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ॥

—(পঞ্চদশী ১৩।১০২)

—সর্বপ্রথম দর্পণকে উপলব্ধি না করিয়া যেরূপ দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের দর্শন হইতে পারে না, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি ব্যতীত তদ্রূপ নামরূপের বোধ হইবে কি করিয়া? —অর্থাৎ **নামরূপাত্মক ব্যবহার, জ্ঞান-কালেও তত্ত্বের ব্রহ্মানুভূতিই হয়। দ্বৈত-সত্যত্ববোধকারী যোগী ও উপাসক-গণই** দ্বৈতপ্রতীতিতে ভীত হইয়া সমাধির শরণ লইয়া থাকেন। বিচারমাত্রৈকশরণ, বেদান্তানুগ সাধকগণের পক্ষে তাহা নিষ্প্রয়োজন। চিত্তগত মালিন্যাদি দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারাও সমাধি-আদি অভ্যাস করিতে পারেন, সে-কথা স্বতন্ত্র। সে-জন্য উপাসনা ও যোগাভ্যাসাদির বিধানও বেদান্ত দিয়াছেন।

আর একটি বিষয় এখানে বিচার্য মনে হয়। ঠাকুর অনেক স্থলে জ্ঞানের পর **বিজ্ঞানের** কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানীর অবস্থা বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :

'নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন —এরি নাম **বিজ্ঞান**।' —(কথামৃত ৪।১৯।১)

'কেন ভক্তি নিয়ে থাকা? - **তা না হ'লে মানুষ কি নিয়ে থাকে? কি নিয়ে দিন কাটায়?** 'আমি' তো যাবার নয়, আমি-ঘট থাকতে সোঽহং হয় না। যখন সমাধিস্থ হ'লে আমি পুছে যায়—তখন যা আছে তাই।'

'বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে।... তাঁকে চিন্তা করে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, —আবার মন লয় না হলে লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।' (ঐ, ৩।৯।৩)

'বিজ্ঞানী দেখে—নেতি নেতি ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হচ্ছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। তিনি দেখেন—যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ।'—(ঐ, ৩।১।৪)

'বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর—'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে।' (ঐ, ৩।১।৫)

'ঈশ্বর আছেন—এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ, আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুর-ভাবে - এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।'

'বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে থাকে—কখনও লীলা থেকে নিত্যতে

যায়। নিত্যে পৌঁছে আবার দ্যাখে তিনি এই সব হয়েছেন—জীবজগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব।'

'আর এক আছে—যা কিছু দেখছ, সব তিনি হয়েছেন। যেমন—বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।' (ঐ, ৩।২০।৩)

—ঠাকুরের এই-সকল কথা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি **বিজ্ঞানীর অবস্থা দ্বারা ব্যবহারকালে শাক্তাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদভাব লইয়া থাকার কথাই বলিতেছেন**। এখানে ঠাকুরের একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেটি এই : 'ব্রহ্মজ্ঞানের পরও, **যাঁরা সাকারবাদী,** তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন পূর্ণ কুম্ভ—জল অন্য পাত্রে ঢালাঢালি করছে।' (ঐ ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩৪)। —এই বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করিব। অদ্বৈতবেদান্তের অধিকারিগণকে আচার্যগণ দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। এক শ্রেণী **কৃতোপাসক** ও অপর শ্রেণী **অকৃতোপাসক**। যাঁহারা উপাস্যদেবতার সাক্ষাৎকার পর্যন্ত উপাসনা পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এইরূপ অত্যন্ত একাগ্র ও শুদ্ধচিত্ত অধিকারীদিগকে, অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ণরূপে দ্বৈতসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অদ্বৈত সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগকে কৃতোপাসক বলা হয়। তাঁহারাই বেদান্তের অতি উত্তম অধিকারী। আর যাঁহারা কথঞ্চিৎ দ্বৈতসাধনা সম্পন্ন করিয়া অর্থাৎ কিছু উপাসনা করিয়া বা না করিয়াই বেদান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অকৃতোপাসক বলা হয়। ইঁহাদিগকে নিম্নাধিকারীরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। ইঁহাদের জন্য যোগাভ্যাস, শিবোপাসনাদি বিহিত আছে, কারণ ইঁহারা বিচারে অসমর্থ।

কৃতোপাসকগণ অত্যল্পকালেই বিচারাদি সাধন সহায়ে তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করেন ও নির্বিকল্পভূমিতে আরোহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ জ্ঞানিগণ কেহ কেহ চিত্তবিশ্রান্তির তারতম্য অনুসারে পঞ্চমাদি ভূমিত্রয়ে আরূঢ় হইয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। পুনঃ কেহ কেহ বলবতী ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া লোক-শিক্ষার্থ পূর্বাভ্যাসবশতঃ ভক্তি ভক্ত লইয়া ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত **'বিজ্ঞানী'** পদবাচ্য বলা যাইতে পারে। সে জন্যই তিনি 'ব্রহ্মজ্ঞানের পরও, যাঁরা **সাকারবাদী,** তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে'—এইরূপ বলিয়াছেন। বাহ্য আচরণে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই। সকলেরই এক জ্ঞান। তাঁহাদের ব্যবহারগত বৈষম্য প্রারব্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে।

জগদম্বার একনিষ্ঠ ভক্ত, মাতৃগতপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণও কিন্তু বেদান্তোক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মানুভূতির পর মায়ের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কটুকু অভ্যাসবশতঃ ভুলিতে পারেন নাই। সে সম্পর্কটুকু বজায় রাখিয়াই তিনি ব্যবহার-ভূমিতে মায়ের সঙ্গে দিব্য লীলা শেষ অবধি করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্ধন করিয়া গিয়াছেন। স্বীয় অননুকরণীয় কি সুমধুর ভাবেই না তিনি তাহা ব্যক্ত করিতেন! নিজেকে মাতার একান্ত নির্ভরশীল বালক ভিন্ন আর কিছু তিনি ভাবিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—

'তোমরা জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ইত্যাদি যাই বল না কেন, আমি কি জানি, জানো? আমি জানি—তিনি মা ও আমি ছেলে। বালকের মা চাই না?'—কি সুন্দর সরল কথা! এরূপ ব্যবহারেরও স্বকায়

মাধুর্যমণ্ডিত মহিমা কে অস্বীকার করিবে? তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের এবংবিধ লীলাদর্শন করিয়াই বোধ হয় কোন রসিক কবি গাহিয়াছেন :

দ্বৈতং বন্ধায় নূনং প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যা যৎ কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥

—জ্ঞানলাভের পূর্বে দ্বৈতবোধ বন্ধনকারী বটে, কিন্তু শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানোদয়ের পর স্বভাববশতঃ ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার যে **কল্পিত উপাস্য-উপাসকাত্মক দ্বৈত-ব্যবহার,** তাহা অদ্বৈত অপেক্ষাও সুন্দর।

সন্ন্যাসপ্রদানানন্তর প্রিয় শিষ্যকে নানা যুক্তি, সিদ্ধান্তবাক্য এবং বেদান্ত-প্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি'- উপায়াবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী উৎসাহিত করিতে লাগিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সহসাই নামরূপের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারিতেছিলেন না। মনকে বিচারসহায়ে একটু অন্তর্মুখ করিবামাত্রই চিরপরিচিত মায়ের চিদ্ঘনোজ্জ্বল মূর্তিটি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে পুনঃপুনঃ মনে উদিত হইতেছিল। শ্রীগুরুর বিশেষ প্রেরণায় মনকে একাগ্র করিয়া অবশেষে তিনি দৃঢ় বিচারসহায়ে অতি প্রিয় জগদম্বার শ্রীমূর্তিটিও মিথ্যা নামরূপাত্মক-জ্ঞানে পরিত্যাগ-করত ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে গভীর সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বেদান্তোক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিলেও তিনি ঈশ্বরেচ্ছায় লোকশিক্ষার্থ পুনঃ ভক্তি ভক্ত-ভাব লইয়াই **'বিজ্ঞানী'র** লীলা করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায় এই 'বিজ্ঞানী'রূপে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে না পাইতাম—যদি তিনি ভক্তি-ভক্ত লইয়া সুমধুর লীলা না করিতেন, তবে আমরা আমাদের সুপরিচিত দক্ষিণেশ্বরের প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম কি? তাঁহার কথামৃতধারায় সিঞ্চিত হইয়া জগতের অগণিত নরনারী শান্তিলাভের সুযোগ পাইত কি? গুরুগতপ্রাণ শ্রীবিবেকানন্দও এ-বিষয়ে শ্রীগুরুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। সদা সমাধিস্থ হইয়া থাকিবার তীব্র ইচ্ছা ও সামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি তাহা করেন নাই। কারণ অলঙ্ঘনীয় ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাকেও লোকহিতার্থ বিবিধ কর্ম করিতে হইয়াছে। জ্ঞানী হইয়াও পুনঃ **বিজ্ঞানী** সাজিতে হইয়াছে।

যে-সকল জ্ঞানী পূর্বাভ্যাসবশতঃ অপরোক্ষ জ্ঞানের পর ভক্তি-ভক্ত লইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই ঠাকুর **'বিজ্ঞানী'** নাম দিয়াছেন। ইহা কোন শাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দ নয়। ঠাকুর এইভাবে একটি বিষয়ের সুন্দর অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন, একটি নূতন পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করিলেন। গীতাদি শাস্ত্রে বিজ্ঞান-শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্'—গীতা ৩।৪১
'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা'— ঐ ৬।৮
'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্'—ঐ ৯।১

এই সব স্থলেই জ্ঞান অর্থ শাস্ত্র ও আচার্যমুখে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থ উহার বিশেষ অনুভব অর্থাৎ অপরোক্ষ তত্ত্বসাক্ষাৎকার। জ্ঞান-শব্দটি যেখানে একক ব্যবহৃত হয়, সেখানে অনেক সময় উহা অপরোক্ষানুভববোধক হইয়া থাকে।

সে যাহাই হউক, বিজ্ঞানীর অবস্থা বুঝাইতে গিয়া ঠাকুর তাঁহাকে অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের উপরে স্থান দিলেন, এরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। উপর বা নিম্ন—এরূপ কোন বিবক্ষা এখানে নাই। তত্ত্বজ্ঞানীদের বাহ্য আচরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নামগুণ-কীর্তনাদি-সহায়ে ভক্তগণসহ ঈশ্বরানন্দ উপভোগকরত

স্বীয় প্রারব্ধ ব্যতীত করেন, তাঁহারাই ঠাকুরের কথায় '**বিজ্ঞানী**' পদবাচ্য। ইহাতে কোন ব্যর্থতা নাই। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রারব্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই বিষয়ে আচার্যগণ বলিয়া থাকেন :

কৃষ্ণ ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ।
বশিষ্ঠঃ কর্মকর্তা চ ত এতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥

—কৃষ্ণ কত ভোগ্য পদার্থ আস্বাদন করিয়াছেন ; শুক সর্বত্যাগী, জনক ও রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছেন এবং বশিষ্ঠদেব সদা যাগ-যজ্ঞাদি কর্মে তৎপর—বাহ্য ব্যবহারে ইঁহাদের এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইঁহারা সকলেই তুল্য জ্ঞানী। জ্ঞানের ইতরবিশেষ কিছু নাই।

জ্ঞানের কোন তারতম্য না থাকিলেও চিত্তের সমাহিতাবস্থার তারতম্য-বশতঃ বেদান্তে ভূমিকাদি ভেদ কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞানের সপ্তভূমিকার মধ্যে পঞ্চমাদি শেষভূমি-ত্রয় চিত্তে সমাহিতাবস্থারই বিভিন্ন স্তর মাত্র। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর বলিয়াছেন : কেহ সচ্চিদানন্দ সাগর দর্শন করিয়াছে, কেহ স্পর্শ করিয়াছে, কেহ এক গণ্ডূষ, কেহ বা তিন গণ্ডূষ জলপান করিয়াছে ইত্যাদি। এ বিষয়টি এখানে আর অধিক বিস্তার করা হইল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দের রচনা পুনরায় উদ্ধৃতিপূর্বক আমরা এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :

অদ্বৈত ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, **অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য।** কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা সকলেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। ····· তিনি আমাদিগকে বারংবার বলিতেন—উহা শেষ কথা রে শেষ কথা। সকল মতেরই জানিবি উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ। —লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ১৬ অ

ঠাকুর বলিতেন—'যে ঠিক ঠিক অদ্বৈত-বাদী সে চুপ হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে।' অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুর বলিতেন—যতক্ষণ 'আমি তুমি' 'বলা কহা' প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নির্গুণ সগুণ, নিত্য ও লীলা, দুই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যে **ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী** থাকিতে হইবে। —ঐ, গুরুভাব। ৩য় অধ্যায়

পারমার্থিক এক নির্গুণ, নির্বিশেষ, অদ্বৈত-বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অন্য যাবতীয় মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন এবং গুরুগতপ্রাণ অশেষগুণাধার তাঁহার পরমপ্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাহাই অপরোক্ষ অনুভব করিয়া জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সকল প্রকার ধর্মমতে সাধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের যাথার্থ্য নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন যে, উহাদের প্রত্যেকটিই অন্তিমে বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতিতেই পর্যবসিত হয় এবং সেইজন্য তাঁহার মতে **সকল ধর্মই বেদান্তোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে সমন্বিত।** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে এই বাণীই জগদ্‌বাসী স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শুনিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

নানা দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় গৃহী শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :

'শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার জীবন আদর্শস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাতে সকল ভাবেরই পূর্ণ পূর্তি দেখা যায়। তিনি এক অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণ রূপে, অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণ আকারে বৈদান্তিক অদ্বৈতজ্ঞানের আকরবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে পরমহংস বলিতেন।

'তিনি লীলারসের অদ্বিতীয় পক্ষপাতী এবং প্রেমভক্তির প্রস্রবণবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত ভক্তরা তাঁহাকে অবতার বলেন।

'তিনি তন্ত্রসাধনার অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তন্ত্রাদি বিশেষতঃ ঊর্ধ্বমুখ তন্ত্রের অতি ভীষণ সাধনাদি যাহা অসাধ্য, তাহাও তিনি নিজে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া তান্ত্রিক সাধকদিগের দ্বারা পরিকীর্তিত হইয়াছেন।

'রামকৃষ্ণ নবরসের ঘনীভূত দেবতা বলিয়া নবরসিক সম্প্রদায় তাঁহাকে রসিকচূড়ামণি বলিয়াছেন।

'তিনি বাউলের সাঁই, বৈষ্ণবের গোঁসাই, কর্তাভজার আলেখ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

'শিখেরা নানক, মুসলমানেরা পয়গম্বর, খ্রীষ্টানেরা যীশু, ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতেন।

'তিনি এক অদ্বিতীয় এবং সমুদয় ধর্মভাব তাঁহাতে বিকশিত হইয়া তাঁহাতেই পর্যবসিত রহিয়াছে।'

(শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫০২)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্তভাবময়। তাঁহার জীবনে সর্বভাবের পরিপুষ্টি দেখা যায়। সর্ব মতবাদই তাঁহার অনুভূতির আলোকে সমুজ্জ্বল। নিজ জীবনে সর্বধর্মের সাধন করিয়া উহাদের প্রামাণিকতা ও অধিকারীবিশেষে উহাদের অনুশীলনের সার্থকতাও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। জগতের ধর্মেতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই। যুগপ্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরাবলম্বনে ভগবদিচ্ছায় এই অপূর্ব সাধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ঠাকুরের বাণী হইতেই আমরা তাঁহার বিভিন্ন ধর্মমতের স্বীকৃতি ও তাহাদের সামঞ্জস্যের মূল সূত্র খুঁজিয়া পাই। এই সূত্রের মূলও তাঁহার স্বকীয় দিব্য অনুভূতি।

ঠাকুর অধিকারী বিচার না করিয়া কাহাকেও উপদেশ দিতেন না। শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদ একমাত্র যোগ্য অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দকেই তিনি শিখাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে স্বামীজীর নিজের বাণীই প্রমাণ—

'Generally he used to teach Dualism. As a rule he never taught Adwaita. But he taught it to me.' (C. W. VII. p. 400)

স্বামীজীকেই ঠাকুর 'অষ্টাবক্রসংহিতা' আদি গ্রন্থ পড়িতে বলিতেন এবং আর কেহ শুনিতে না পায় সে বিষয়ে ঘরের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

হাজরা একদিন ত্যাগী বালক-ভক্তদের অদ্বৈতভাবের কথা বলায় ঠাকুর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন—'এ সব ছোকরাদের কত ক'রে ভাব ভক্তি একটু হচ্ছে, তুমি ওদের এসব কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথায় ?'

ঠাকুর কত যত্নে বালক-শিষ্যদের ভাব রক্ষা করিবার প্রযত্ন করিতেন, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

হাজরাকে ঠাকুর আবার বলিলেন—'ওরা (লাটু প্রভৃতি) অমনি আছে। এখনও অত উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (সোঽহং ইত্যাদি) কিছু বলো না।'

ঠাকুর—'নিরাকার সাধনা, জ্ঞানযোগের সাধনা ভক্তদের কাছে বলতে নাই। অনেক কষ্টে একটু ভক্তি হচ্ছে, সব স্বপ্নবৎ বললে ভক্তির হানি হয়।'

প্রসঙ্গান্তরে ঠাকুর বলিতেছেন : 'এ যা বললুম —সব বিচারের কথা। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা— এই বিচার। সব স্বপ্নবৎ ! বড় কঠিন পথ। এ পথে লীলা স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার 'আমিটা'ও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে না, বড় কঠিন। এ সব বিচারের কথা ভক্তদের বেশী শুনতে নাই।'

তাই অধিকারীবিশেষে ঠাকুর বলিতেছেন— 'জগৎ মিথ্যা কেন হবে ? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন।'

'কথামৃত' প্রথম ভাগে শ্রীম স্বগতোক্তি করিতেছেন—"ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না। বলেন, 'তাহলে ওজনে কম পড়ে।' মায়াবাদ নয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেননা, জীবজগৎ অলীক বলছেন না, মনের ভুল বলছেন না। ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। বীচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।"

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল কথা বার বার বলিয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীম-র স্বগতোক্তি স্বাভাবিক। শ্রীম ঠাকুরের মত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন।

কিন্তু, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এ সিদ্ধান্তও ঠাকুরের অননুমোদিত নহে। পুনঃ 'কথামৃত' গ্রন্থে ঠাকুর বলিতেছেন :

"বেদান্তবিচারের কাছে রূপ টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপদর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের আমি অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।"

"যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।···জ্ঞানী যেমন বেদান্তবাদী—কেবল 'নেতি নেতি' বিচার করে। বিচার ক'রে বোধ হয় যে, 'আমি' মিথ্যা জগৎও মিথ্যা। স্বপ্নবৎ।"

"আমি জানি বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মা বল্লেন—বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। আমি আলাদা কিছু নই—আমি সেই ব্রহ্ম।"

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন—'শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানব-জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।' নিরন্তর ছয় মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানকালে ঠাকুরের ঐ কালের অনুভূতির প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"ঐ অবস্থায় পৌঁছিয়া ঠাকুর অনুভব করিলেন—জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ং ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি, অনন্ত কৃপাময়ী জগজ্জননী। আর দেখিলেন—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নির্গুণ ও সগুণভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত—ইহাকে শাস্ত্রে স্বগত-ভেদ বলিয়াছে···। শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্গুণ-সগুণ উভয়ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পরে ঠাকুর আদেশ পাইলেন 'ভাবমুখে থাক'···।"

(গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ১১০।১১১)

নির্বিকল্প সমাধিতে সগুণ-নির্গুণ উভয়ভাব-জড়িত স্বগতভেদবিশিষ্ট জগদম্বার যে দর্শন ঠাকুরের হইয়াছিল উহাই কি অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত ব্রহ্মদর্শন ?—এই বিষয় লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অদ্বৈতবেদান্তমতে নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাত্রাদি-ত্রিপুটীলয়পূর্বক অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির কেবল অদ্বিতীয় চিদানন্দবস্তুমাত্ররূপে অবস্থান হইয়া থাকে। তৎকালে ঐ চিত্তবৃত্তিরও প্রতীতি থাকে না, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুরই কেবলমাত্র প্রকাশ বা ভান থাকে। এ মতে এই নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্বগতাদি কোন প্রকার ভেদই স্বীকৃত নহে। সগুণ, ঔপাধিক রূপ, তাত্ত্বিক নহে, উহা মিথ্যা। নির্গুণ নিরুপাধিক রূপই সত্য, এইরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত নির্বিকল্প সমাধিতে ঠাকুরের যে স্বগতভেদবিশিষ্ট সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপে বিভক্ত এক অদ্বিতীয় জগদম্বার দর্শন হইয়াছিল উহা অদ্বৈতবেদান্তের মত নহে, কারণ এই মতে শুদ্ধ ব্রহ্মে স্বগতাদি কোনই ভেদ নাই।

তবে ঠাকুরের ঐ অনুভূতিটি তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী মূল তত্ত্বের অনুভূতি বলা যায়, কারণ তন্ত্রই বলিয়া থাকেন যে, চরম তত্ত্ব বা জগদম্বা একই কালে সগুণ

ও নির্গুণ উভয়রূপিণী হইয়াও অদ্বিতীয়া। ঐ উভয়রূপই তুল্যরূপে সত্য। শাংকর বেদান্তমতে একই কালে শিবের বা জগদম্বার সগুণ বা সক্রিয়রূপ এবং নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয়রূপ স্বীকৃত হয় না এবং জগদম্বার সক্রিয়রূপ সংসারকেও সত্য বলিয়া মানা হয় না। তন্ত্রের ব্রহ্ম সর্বদাই মায়া-শবলিত। বেদান্তমতের মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম তন্ত্রমতে নাই। সুতরাং লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে ঠাকুর শক্তি-বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী বা শাক্তাদ্বৈতবাদী। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরকে তিনি ঐ ভাবেই বুঝিয়াছেন।*

প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনিয়াছি যে, স্বামী প্রেমানন্দ বলিতেন—'ঠাকুর ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী।' শুনিয়াছি স্বামী অভেদানন্দও কোন জিজ্ঞাসু ভক্তকে বলিয়াছিলেন—'ঠাকুর ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।' কথামৃতকার শ্রীম-ও যে এই মতই পোষণ করিতেন তাহাও পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

স্বামীজী নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদই শিক্ষা দিয়াছেন। শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদেই সর্বধর্ম, সর্বমতবাদ সমন্বিত ইহাই স্বামীজীর সুস্পষ্ট অভিমত এবং উহাই তিনি সর্বজগৎসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন।

লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমৎ তোতাপুরী শক্তি মানিতেন না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সাধনায় বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও তাঁহার জ্ঞান অপূর্ণ ছিল এবং রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি গঙ্গায় দেহ-বিসর্জনের ব্যর্থ প্রয়াসের পর শক্তিতে বিশ্বাসী হন ও শক্তির সত্যত্ব মানেন এবং তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধিত হইলে তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ইত্যাদি।

কেহ কেহ শঙ্কা করেন যে, শ্রীমৎ তোতা নির্বিকল্প সমাধিতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি তাহা হইলে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিলব্ধ জ্ঞান হইতে ভিন্ন? শক্তির সত্যত্ব মানার পর তোতার জ্ঞানের পূর্ণতা স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হয় তাঁহার নির্বিকল্প সমাধিতে পূর্ণজ্ঞান লাভ পূর্বে হয় নাই।

নির্বিকল্প সমাধিতে তোতার হইয়াছিল সর্ব-ভেদবিরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও ঠাকুরের হইল অদ্বিতীয় এক জগদম্বা বা ব্রহ্মের স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপী ব্রহ্মজ্ঞান। এই দুই অনুভবের পার্থক্য কেন?

জগদম্বার নির্গুণ ভাবটাকেই শংকরোক্ত ব্রহ্মবাদ বলিয়া ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে এবং জগদম্বার জ্ঞানকেই চরম সিদ্ধান্ত মানিয়া তোতার জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা হইয়াছে।

উত্তরে বলা যায় যে, তন্ত্রের সিদ্ধান্ত শাক্তাদ্বৈত-বাদের পরিপ্রেক্ষিতেই এই শঙ্কার সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রমতে তোতার পূর্বে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই; কারণ তিনি শক্তিও সত্য বলিয়া জানিতেন না। বেদান্তমতের ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা—ইহাই তিনি জানিতেন। অদ্বৈতমতে শক্তিও মিথ্যা—ইহা ঠাকুরও বলিয়াছেন। ধ্যানে চিরাভ্যস্ত কালীমূর্তি, জ্ঞান-অসিদ্বারা খণ্ডন করিয়া ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়াছিলেন—ইহাও

* 'লীলাপ্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'অদ্বৈতভাব শেষ কথা', 'সেখানে সব শিয়ালের এক রা', 'অদ্বৈতবিজ্ঞান চরম' ইত্যাদি। অধিকন্তু, 'অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ়' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উপলব্ধির কথা স্বামী সারদানন্দ এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: 'তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য।' সুতরাং স্বামী সারদানন্দের মতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্তাদ্বৈতবাদী'—এই সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না।—সম্পাদক

শক্তির মিথ্যাত্বই প্রমাণ করিয়া থাকে। সুতরাং শাক্তাদ্বৈতবাদকেই চরম সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তোতার বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গে ঐরূপ বলা হইয়াছে বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হইবে না। কারণ অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরকে স্ব স্ব ভাবানুসারে এক একজন এক একরূপ বুঝিয়াছেন। লীলাপ্রসঙ্গকার ঠাকুরকে শাক্তাদ্বৈতবাদীরূপেই জানিয়াছেন। তন্ত্রকেই প্রধান বলিয়া মানিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বলা ছাড়া আর কোন উপায়েই সমন্বয় দেখান যায় না।

শাক্তাদ্বৈতবাদই যদি অদ্বৈতবিষয়ে ঠাকুরের একমাত্র মতবাদ হইত তবে উহা স্বামীজীকে শিখাইবার জন্য ঠাকুরের অত সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল না। অন্য কেহ আশেপাশে আছে কিনা তাহা দেখিয়া তারপর ঠাকুর উহা স্বামীজীকে শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন না। শাক্তাদ্বৈতবাদ তিনি সর্বজনসমক্ষেই প্রচার করিয়াছেন। কারণ ঐ বিষয়ক কথা কথামৃত-গ্রন্থে অজস্র রহিয়াছে, যাহা তিনি গৃহস্থদের সম্মুখেও নির্বিচারে অকাতরে পরিবেশন করিয়াছেন। সকলের জন্যই উহা বলিয়াছেন। কারণ ঐমতে জগৎকে মিথ্যা বলিতে হয় না। জগৎমিথ্যাত্বের কথা উঠিলে, কথামৃতে দেখিতে পাই, ঠাকুর উহা বেদান্তবাদীদের কথা, দূরের কথা, বলিয়া চাপা দিয়া অন্য কথা তুলিয়াছেন। কারণ গৃহস্থ ও সাধারণ অধিকারীদের নিকট ঠাকুর উহা বলিতে চাহেন নাই। এই জন্যই অতি সংগোপনে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'— এই তত্ত্ব একমাত্র স্বামীজীকেই শিখাইয়াছেন।

"এক ব্যক্তি তাঁকে (ঠাকুরকে) বলেছিলেন, 'আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন।' তিনি বল্লেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এইটি ধারণা কর ; ইহা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।"

সুতরাং কেবল শাক্তাদ্বৈতবাদই ঠাকুরের মত নহে। জগন্মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মসত্যত্বের কথাও ঠাকুর বলিয়াছেন ও উহাও তাঁহারই অনুমোদিত এবং অনুভূত তত্ত্ব বলিয়াই উহা তিনি স্বামীজীকে শিখাইয়াছেন, কারণ স্বামীজীর কণ্ঠে বসিয়াই ঐ সত্য তিনি জগতে প্রচার করিবেন এবং বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদেই যে পরংপরাক্রমে সর্বধর্ম ও সর্বমতবাদ সমন্বিত বা পর্যবসিত, এই অভিনব তত্ত্ব জগৎ-কল্যাণার্থ প্রকট করিবেন। স্বামীজীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন—'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর। তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী ॥'

পুনঃ অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বলা যায়, শ্রীমৎ তোতার বেদান্তোক্ত পূর্ণ জ্ঞানই নির্বিকল্প সমাধিতে লাভ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার শক্তি সত্য মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অসুস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিলেও বা দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার জ্ঞানের কিছু কমতি ছিল না বা হইত না। কারণ অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তমতে—

'যেন কেনাপি ভাবেন যত্র কুত্র মৃতা অপি।
যোগিনস্তত্র লীয়ন্তে ঘটাকাশমিবাম্বরে ॥
তীর্থে চান্ত্যজগেহে বা নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্।
সমকালে তনুং মুক্তঃ কৈবল্যপ্রাপকো ভবেৎ ॥'

(অবঃ গীতা, ১।৬৮, ৬৯)

'তীর্থে বান্ত্যজগেহে বা যত্র কুত্র মৃতোঽপি বা।
ন যোগী পশ্যতি গর্ভং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে ॥'

(ঐ ২।২৯)

আরও বলা যাইতে পারে যে, তিনি দেহত্যাগ স্বেচ্ছায় করিতে না পারিয়া বুঝিলেন যে, এসব মিথ্যা মায়ার খেলা। জলে স্থলে সর্বত্র এক মায়িক রচনা। গঙ্গায় চড়া পড়াতে বেশী জল না পাইয়া অন্ধকারে ভাবিলেন যে, গঙ্গায় পর্যাপ্ত জলও নাই, এও মায়ারই এক লীলা। 'মায়ায়াং সর্বসম্ভবঃ।' তিনি মায়াকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিলেন—এ সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া বেদান্তবাদীরা মনে করিতে পারেন।

পুনঃ অদ্বৈতবেদান্তমতে শ্রীমৎ তোতার দেহ-ত্যাগ-সংকল্প এবং তজ্জন্য গঙ্গায় যাওয়া ও ফিরিয়া আসা—এ সব কিছুই দোষাবহ নহে। কারণ এ সবই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে মিথ্যা দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার। আত্মার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াতীত, অদ্বিতীয়, স্বগতাদি সর্বভেদরহিত শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ—এই বোধই বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প সমাধিতে হইয়া থাকে। চল্লিশ বৎসর সাধনার পর তোতাপুরীর ঐ সমাধি হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে তোতার বেদান্তোক্ত পূর্ণ জ্ঞানই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে তাঁহার জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না; একমাত্র শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শাক্তাদ্বৈতবাদ মতেই তাহা অসম্পূর্ণ বলা যায়। কারণ ঐ মতে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ভাব মিলিত এক অদ্বৈত স্বীকার করা হয়। তোতাপুরীর নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল কিন্তু তুল্যরূপে জগদম্বার সগুণভাবটিও সত্য ইহা তাঁহার জ্ঞান হয় নাই, কারণ অদ্বৈতবেদান্তমতে সগুণভাব ঔপাধিক, মিথ্যা। এ জন্যই তন্ত্রমতানুসারে তোতার ব্রহ্মজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা হইয়াছে এবং যখন ঠাকুরের সঙ্গগুণে বা ঈশ্বরেচ্ছায় তোতা জগদম্বার সগুণভাবকে সত্য বলিয়া মানিলেন বা অনুভব করিলেন তখন তাঁহার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল, এরূপ বলা হইল।

এইরূপে দেখা যায় লীলাপ্রসঙ্গে শাক্তাদ্বৈত-বাদই অদ্বৈতবিষয়ে ঠাকুরের মত বলিয়া প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ইহা দোষাবহ নহে। কারণ অনন্তভাবময় ঠাকুরকে লীলাপ্রসঙ্গকার ঐ ভাবেই দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। তিনিও ঠাকুরের ভাবের কোন ইতি করেন নাই।

শাক্তাদ্বৈতবাদের কথাই ঠাকুর সকলকে বিশেষ করিয়া অধিকাংশ সময় বলিয়াছেন; তাহার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, ঠাকুর জানিয়াছিলেন যে, জগৎকারণকে মাতৃভাবে উপাসনাই আধুনিক যুগের বিকৃত কামকলুষিতচিত্ত জনসাধারণের মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বা পন্থা।

ঠাকুর স্বামীজীকে অষ্টাবক্রসংহিতার যে অদ্বৈতবাদ শিখাইয়াছেন তাহা তন্ত্রোক্ত স্বগত-ভেদবিশিষ্ট সগুণ-নির্গুণ উভয়াত্মক এক অদ্বিতীয় জগদম্বার তত্ত্ব নহে। অষ্টাবক্রসংহিতায় বেদান্তের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট। স্বামীজীও উহাই শিখিয়া ও অনুভব করিয়া উহাই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা ও প্রচার করিয়াছেন এবং সোপানারোহণন্যায়-ক্রমে সর্বধর্মমতের উহাই সর্বশেষ পরিণতি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শাক্তাদ্বৈতবাদও সর্বগ্রাসী শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদে বিলীন হইবার পথে শেষ ধাপ বা সোপানমাত্র।

তোতাপুরীর ব্যাধি, অসহনীয় দেহযন্ত্রণা ও তাঁহার দেহত্যাগের সংকল্প—এসব তাঁহার জ্ঞানের অপূর্ণতার জ্ঞাপক নহে। হৃদয়রামের ব্যবহারে ঠাকুরও ব্যাকুল হইয়া গঙ্গায় দেহ বিসর্জন করিতে গিয়াছিলেন। উহা কি ঠাকুরের জ্ঞানের অপূর্ণতার বোধক? ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'মা গেল, বাপ গেল, ভাই গেল, শেষটায় কিনা মা হৃদয়ের হাতে এত যন্ত্রণা দিচ্ছিস?' সে যন্ত্রণা তোতাপুরীর পেটের যন্ত্রণার মতই ঠাকুরের অসহনীয় বোধ হইয়াছিল।

তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যবহার তাঁহার প্রারব্ধদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জ্ঞানসমকালেই তিনি মুক্ত হইয়া যান। তাঁহার দেহেন্দ্রিয় প্রারব্ধবশে বিচিত্র ব্যবহার করিতে থাকে, কিন্তু তিনি ঐ সকলে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন।

'যোগিনো ভোগিনো বাপি ত্যাগিনো
রাগিণোঽপি বা।
জ্ঞানান্মোক্ষো ন সন্দেহ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥'

—ব্যবহারে জ্ঞানী যোগী, ভোগী, ত্যাগী বা রাগী মনে হইলেও তিনি এসব কিছুই নন। তিনি

জানেন, 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ।' জ্ঞানকালেই তাঁহার মোক্ষ অবধারিত হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।

'মুক্তস্য ব্যবহারস্তু ভ্রান্তিবাসনয়া কৃতঃ।
ভ্রান্তিনাশেঽপি সংস্কারান্নুবৃত্তির্দৃশ্যতে খলু ॥'

(বৃহঃ বাঃ সার)

—দেহাত্মবুদ্ধিবিরহিত জীবন্মুক্তের ব্যবহার অভ্যাসবশতঃ পূর্বভ্রান্তির সংস্কার দ্বারা হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তি নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার সংস্কারের অনুবৃত্তি দেখা যায়। উহা ভর্জিত বীজের ন্যায়। উহা দ্বারা কোন ব্যসন উৎপন্ন হয় না, কেবল প্রারব্ধভোগমাত্রই সম্পাদিত হয়।

জ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহারও নানাপ্রকার :

'রাগী কশ্চিৎ বিরক্তোঽন্যঃ
ক্রুদ্ধোঽন্যঃ শান্তিমান্ পরঃ।
প্রারব্ধভোগনানাত্বাৎ
কথং লক্ষ্ম নিয়ম্যতে ॥'

(বৃহঃ বাঃ সার)

—প্রারব্ধবৈচিত্র্যবশতঃ কোন জ্ঞানী রাগী, কেহ বিরক্ত, কেহ ক্রোধপরায়ণ, কেহ বা শান্তিমানরূপে প্রতীয়মান হন। জ্ঞানীর লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না।

তবে ব্রহ্মবিৎ কি প্রকার ?

'ব্রহ্ম যাদৃক্ তাদৃগেব ভবেৎ বিদ্বান্নিবোধতঃ।
বোধোঽতঃ লক্ষণং তস্য বোধশ্চ স্বাত্মসাক্ষিকঃ ॥'

(বৃহঃ বাঃ সার)

—চিদ্রূপ ব্রহ্ম যে প্রকার, জ্ঞানপ্রভাবে বিদ্বানও সেই প্রকারই চিদ্রূপ হইয়া থাকেন। অতএব সম্যগ্‌জ্ঞানই অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাবে সংস্থিতিই বিদ্বানের একমাত্র লক্ষণ। আর ঐ জ্ঞান সদা সাক্ষিবেদ্য অর্থাৎ স্বসংবেদ্য।

প্রারব্ধবশতঃ জ্ঞানীর রাগাদিই বা হইবে কেন, তদুত্তরে আচার্য বলিতেছেন :

'ব্রহ্মাত্মবোধমাত্রেণ শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তিতঃ।
রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপরাধ্যতে ॥'

(বৃহঃ বাঃ সার)

—ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধদ্বারাই জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে। তাহাতেই জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ, এই শাস্ত্রার্থও সার্থক হইয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানানন্তর জ্ঞানীর প্রারব্ধবশতঃ আভাসরূপ (অর্থাৎ বাধিত) রাগাদির অনুবৃত্তি যদি হয় তো হউক, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না, অর্থাৎ উহা জ্ঞানের বাধক নহে।

জ্ঞানীর দেহত্যাগেরও কোন নিয়ম নাই :

'নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুঠন্ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্বথা ॥'

(পঞ্চদশী)

—ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, মূর্চ্ছাবস্থায়, নীরোগ শরীরে, আসনে উপবিষ্ট হইয়া বা ভূলুণ্ঠিত হইয়া, যে ভাবেই তত্ত্বজ্ঞানীর মৃত্যু হউক না কেন, তাঁহার আত্মজ্ঞানের অভাব হয় না বা মুক্তির কোন বাধা হয় না, কারণ তৎকালেও তাঁহার 'আমি ব্রহ্ম'—এই জ্ঞানটি অন্তরে সুপ্তরূপে অর্থাৎ সংস্কাররূপে থাকে। এইজন্য তখনও তিনি মুক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সর্বভাবের মূর্তবিগ্রহস্বরূপ। সর্বভাব ও সর্বধর্ম নিজ জীবনে সাধন করিয়া, সর্ব-পথই অন্তিমে এক অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতিতেই পর্যবসিত হয়—ইহাই তিনি স্বামীজীর কণ্ঠে বসিয়া সকলকে শুনাইয়াছেন। অতএব শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদ বিষয়ে তাঁহার অনুভূতি ও মত জানিতে হইলে তাহা আমাদের স্বামীজীর মুখে শুনিতে হইবে। শাক্তাদ্বৈতবাদ বিষয়ে ঠাকুরের বাণী ও অনুভূতি তদীয় প্রিয় শিষ্য স্বামী সারদানন্দের লেখনীমুখে 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অপরাপর সকলেও আপন আপন ভাবনা ও সংস্কারানুযায়ী ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিপূর্ণ বিগ্রহ রূপেই দর্শন করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন। সর্বত্রই 'The Master as I saw Him'—প্রভুকে যিনি যেমন

দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপেই তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন।

এইজন্যই ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন—

বৈদান্তিকদের পরমহংস, ভক্তদের অবতার, তান্ত্রিকদের কৌলশ্রেষ্ঠ, নবরসিকদের রসিকচূড়ামণি, বাউলের সাঁই, বৈষ্ণবদের গোঁসাই, কর্তাভজাদের আলেখ, শিখদের গুরু নানক, মুসলমানদের পয়গম্বর, খ্রীষ্টানদের যীশু ও ব্রাহ্মদের ব্রহ্মজ্ঞানী।*

* উদ্বোধন ১৩৬৯, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় বর্তমান লেখকের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ'-শীর্ষক প্রবন্ধটির পরিপূরক এই বর্তমান প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে 'শাক্তাদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উহা পাঠ করিবার পর এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠকবর্গের সুবিধা হইবে।—লেখক

দৃষ্টি-সৃষ্টি

স্বামী ধীরেশানন্দ

মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠভক্ত মহাত্মা তুলসীদাস স্বরচিত রামায়ণে (রামচরিতমানসে) একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। মনোনিবেশপূর্বক দেখিলে উহার বিশেষ তাৎপর্য অনুভূত হয়। সীতা-উদ্ধারমানসে সাগরে সেতুবন্ধনপূর্বক বিরাট বানরবাহিনীসহ ভগবান লঙ্কায় আসিয়াছেন ও সাঙ্গোপাঙ্গসহ তিনি 'সুবেল' পর্বতোপরি বিরাজ করিতেছেন। সময় রাত্রি। বন্ধু-প্রবর সুগ্রীবের অঙ্কে শিরঃস্থাপন করিয়া ভগবান মৃগচর্মোপরি শয়ান। পার্শ্বে উপবিষ্ট বিভীষণ কানে কানে মন্ত্রণাদানে রত। বালিপুত্র অঙ্গদ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান উভয়ে তাঁহার পাদসংবাহনে ব্যাপৃত। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হস্তে ধনুর্ধারণ করিয়া বীরাসনে ভগবানের পশ্চাতে উপবিষ্ট। ঊর্ধ্বে নীল নভোমণ্ডল বিমল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত। হঠাৎ চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্কদর্শনে শ্রীরামচন্দ্র সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রে এইরূপ কলঙ্ক কেন, তাহা তোমরা সকলে বল।

'কহ প্রভু সসি মহুঁ মেচকতাই।
কহহু কাহ নিজ নিজ মতি ভাঈ॥'

—চন্দ্রে কলঙ্ক কি করিয়া হইল তাহা তোমরা আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা কর।

'কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ।
সসি মহুঁ প্রগট ভূমি কৈ ঝাঁঈ॥'

প্রথমেই সুগ্রীব বলিলেন—হে রঘুনাথ! চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়াতেই এইরূপ দেখাইতেছে।

বিভীষণ বলিলেন,—

'মারেউ রাহু সসিহি কহ কোঈ।
উর মহঁ পরী স্যামতা সোঈ॥'

কেহ অর্থাৎ বিভীষণ বলিলেন,—চন্দ্রকে রাহু প্রহার করিয়াছে, তাই তার হৃদ্দেশে কালো দাগ।

'কোউ কহ জব বিধি রতি মুখ কীন্হা।
সার ভাগ সসিকর হরি লীন্হা॥
ছিদ্র সো প্রগট ইন্দু উর মাহীঁ।
তেহি মগ দেখিঅ নভ পরিছাহীঁ॥'

পুনরায় কেহ (অঙ্গদ) বলিলেন—কামদেবের স্ত্রী রতির মুখনির্মাণকালে ব্রহ্মা চন্দ্রের সারভাগ হরণ করিয়া নিয়াছেন। উহাতে রতির মুখ সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে চন্দ্রমার হৃদয়ে ছিদ্র হইয়া যাওয়াতে তাহার মধ্য দিয়া আকাশের কালো ছায়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

'প্রভু কহ গরল বন্ধু সসি কেরা।
অতি প্রিয় নিজ উর দীন্হ বসেরা॥
বিষ সংজুত কর নিকর পসারী।
জারত বিরহবন্ত নর নারী॥'

এইবার শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলিলেন তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত,—বিষ চন্দ্রের প্রিয় ভ্রাতা (সমুদ্রমন্থন-কালে উভয়ের উৎপত্তি, ইহা পুরাণপ্রসিদ্ধ)। তাই প্রিয় ভ্রাতাকে স্বহৃদয়ে স্থান দিয়া বিষযুক্ত কিরণসমূহ দ্বারা চন্দ্র বিরহী নরনারীগণকে সন্তাপিত করিয়া থাকে।

সর্বশেষে 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ' আঞ্জনেয় পবন-সুত শ্রীহনুমানের পালা আসিল। তিনি ভগবানের একান্ত ভক্ত। তিনি বলিলেন,—

'কহ হনুমন্ত সুনহু প্রভু
　　　সসি তুমহার প্রিয় দাস।
তব মূরতি বিধু উর বসতি
　　　সোঈ শ্যামতা অভাস॥'

—অর্থাৎ হে প্রভু! চন্দ্র তোমার প্রিয় দাস, অতি প্রিয় ভক্ত। সে তোমার মনোহর নব-দূর্বাদলশ্যামল রূপ নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকে। তাই চন্দ্রে এই শ্যামতা (কলঙ্ক) দৃষ্ট হইতেছে।

কাহিনীটি বড়ই সুন্দর ও কুতূহলোদ্দীপক। সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং এবং হনুমান—সকলেই চন্দ্রের কলঙ্কবিষয়ে স্ব স্ব বিচার প্রকট করিলেন। সকলেই বুদ্ধিমান, বিচারশীল ও সত্যবাদী। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তে পরস্পর বিরোধ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনা অর্থাৎ সংস্কারানুযায়ী চন্দ্র দর্শন ও বিচার করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বালিনিগৃহীত সুগ্রীব রাজ্যহারা হইয়া বহু দিন অশেষ দুঃখ পাইয়াছেন। সম্প্রতি বালি-বধ করিয়া ভগবান তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন মাত্র। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বটে, কিন্তু অধিক ভূমির প্রত্যাশা সর্ব রাজন্য-বর্গেরই সাধারণ দুর্বলতা। তাই তিনি চন্দ্রে ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া দেখিলেন।

বিভীষণ সর্বজনসমক্ষে রাজসভামধ্যে রাবণের পদপ্রহারে জর্জরিত। অবমানিত ও বিতাড়িত হইয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইয়াছেন। হৃদয়ে সেই অপমান, সেই দুঃখ শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন—চন্দ্রকে রাহু মারিয়াছে, সে জন্যই চন্দ্রমার হৃদয়ে সেই মারের কালো দাগ।

বালিপুত্র অঙ্গদও পিতৃহারা ও রাজ্যহারা। হৃদয়ে তাঁহার নিদারুণ দুঃখরূপ ছিদ্র। তাই হৃতসারভাগ চন্দ্রের হৃদয়ে তিনি ছিদ্র ও তন্মধ্য দিয়া আকাশের কালো ছায়া দর্শন করিলেন। অঙ্গদের স্বীয় হৃদয়ের দুঃখরূপ ছিদ্রমধ্য দিয়াও বৈরভাবের কালো ছায়া সময় সময় দেখা দেয়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তমা স্ত্রী সীতার বিরহে নিজে অতীব কাতর। তাই সীতাবিরহাতুর প্রভু চন্দ্রকে বিরহবিষসন্তাপের প্রয়োজকরূপেই

দর্শন করিলেন।

দাস হনুমান নিজে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই তিনি শ্যামল রামরূপ হৃদয়ে ধ্যানকারী ভক্তরূপেই চন্দ্রকে দর্শন করিলেন।

দেখা যাইতেছে সকলেই স্ব স্ব ভাবনা অর্থাৎ পূর্বসংস্কারদ্বারা প্রভাবিত হইয়া তদনুরূপ চন্দ্র দর্শন করিতেছেন ও তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন।

ভাগবতেও দেখিতে পাই,—অগ্রজ বলভদ্র সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় মহারাজ কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার কালে সভাগত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভাবে। যথা—

'মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতে র্বিরাডবিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥' (ভাঃ—১০।৪৩।১৭)

—রঙ্গালয়ে মল্লদের নিকট যেন তিনি সাক্ষাৎ অশনি অর্থাৎ সর্ববিধ্বংসক বজ্ররূপে প্রতীয়মান হইলেন। সর্বজনসাধারণের চক্ষে তিনি পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, সমবেত নারীগণের দৃষ্টিতে তিনি অপূর্ব রূপবান্ সশরীর কামদেব, গোপগণের নিকট তিনি তাহাদের স্বজন, দুষ্টরাজকুলের নিকট ভীতিকর দণ্ডবিধানকারী, পিতা ও মাতা—বসুদেব ও দেবকীর বাৎসল্যরসপূর্ণ স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কোমলাঙ্গ শিশু, ভোজপতি কংসের নিকট সাক্ষাৎ প্রাণান্তকারী যমরাজ, অবিদ্বান্-দিগের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগীদের দৃষ্টিতে পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদিগের সমক্ষে পরদেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব সহ মহারাজ কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

বিষয়টি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। লঙ্কার আকাশে সুগ্রীব যে চন্দ্র দর্শন করিলেন অপর সকলেও সেই চন্দ্রই দর্শন করিলেন কি? অথবা তাঁহারা প্রত্যেকে যে চন্দ্র দর্শন করিলেন অপর সকলেও সেই চন্দ্রই দর্শন করিলেন কি? না, তাহা করেন নাই, কারণ প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্র দর্শন হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের উক্তি হইতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব উদ্ভূত সংস্কার ও ভাবনা অনুযায়ী চন্দ্র দর্শন করিয়াছেন ও তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যথার্থভাষী। মথুরায় মহারাজ কংসের রঙ্গমঞ্চে সমাগত সকলের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ক্ষেত্রেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ সেখানেও সকলে আপন আপন ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণই দর্শন করিয়াছেন। সকলে একই মূর্তি দর্শন করেন নাই।

দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে-বস্তুকে আমি একভাবে দেখি, অপরে তদ্রূপ দেখে না। আবার সে যাহা দেখে, আমি তাহা দেখি না। একই বস্তু বা স্থান একদিন যেভাবে দেখি, সেই বস্তু বা সেই স্থান অপর সময়ে অন্যরূপ দেখি।

পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন দুইটি শান্তস্বভাব ভজনশীল সাধু হৃষীকেশে তপস্যা করিতেন। বেশ ভজন ধ্যান বেদান্তবিচারাদি-সহায়ে সেখানে তাঁহারা কালাতিপাত করিতেছিলেন। শীতকাল আসিল। হৃষীকেশে অত্যধিক শীত। তখন একজন অপরকে বলিলেন,—'কি আছে এখানে? চল দেশে (পাঞ্জাবে) যাই। এখানে সত্রে ভীড়। এক টুকরা রুটির জন্য সত্রে

কুকুরের মত দাঁড়িয়ে থাকা! কত কষ্ট! চল, দেশে মাধুকরী ভিক্ষা ক'রে খাব ও সানন্দে ধ্যানভজন করব। আহা! মাধুকরী ভিক্ষার অন্ন কত পবিত্র! শুদ্ধ অন্ন না খেলে কি ভজনে ঠিক ঠিক মন সমাহিত হয়? এখানে সত্রে গৃহস্থদের দেওয়া কত ঘোর কামনা-বাসনার অন্ন!' ইত্যাদি। দুই বন্ধু পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন। শীতের সময় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাইয়া ধ্যানভজনও করিয়াছেন। এখন শীত শেষ হইয়া আসিল। গ্রীষ্ম সমাগত। এই সময় পাঞ্জাবাদি দেশে ভয়ানক গরম পড়ে। তখন ঐ সাধুটিই বন্ধুকে বলিতেছেন, 'চল, এখান থেকে চলে যাই। কি আছে এখানে? কোন সাধুসঙ্গ নাই, কিছু নাই। চারিদিকে কেবল গৃহস্থ। সাধুদর্শন করতেই পারা যায় না। চল যাই হৃষীকেশ। আহা! হৃষীকেশের মত জায়গা আছে? অমন স্বচ্ছসলিলা, পতিত-পাবনী, কুলুকুলুনাদিনী গঙ্গাদর্শন—দেবতাত্মা হিমালয়দর্শন, পবিত্র উত্তরাখণ্ড! কত সাধু সেখানে, তাঁদের সঙ্গ, আহা! সত্রে ভিক্ষারও অভাব নাই। মন সেখানে স্বভাবতই আত্মস্থ হয়ে থাকে। চল হৃষীকেশে চলে যাই' ইত্যাদি। তখন আবার দুই বন্ধু হৃষীকেশে চলিয়া আসিলেন।

দেখা যায়, মনই ভাল-মন্দ কল্পনা করিয়া আমাদের বাঁদরনাচ নাচায়। আর আমরা সেই তালে নাচিয়া হয়রান হইয়া পড়ি। সব মনের খেলা। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, মান-অপমান, আশা-নৈরাশ্য—সবই মনেরই কল্পনামাত্র, মনঃসমকালীন। মন যেরূপে কোনও বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে, যেন অবশ হইয়া আমরা তাহা সেইরূপেই দর্শন করিতেছি বা শুনিতেছি। মন যখন নাই (যেমন সুষুপ্তিতে), তখন সে সব বস্তু কোথায়? আবার জাগ্রৎ ও স্বপ্নে মন আসিয়া হাজির হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সব ভাল-মন্দ পদার্থ যেন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মন যে বস্তুকে ভাল বলে, আমরা তাহাই ভাল বলিয়া গ্রহণ করি; মন যাহাকে মন্দ বলে, আমরাও তাহা ঐরূপই ভাবি। মনঃকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ববস্তুর উদয় ও মন নিঃসংকল্প হইলেই সর্ববস্তুরও বিলয়। কল্পনার পূর্বেও বস্তু নাই এবং কল্পনাবিরতির পরও তাহা নাই। কেবল কল্পনাকালেই বস্তুর স্থিতি। অতএব সর্বপদার্থ কেবল প্রাতীতিক অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী। স্বপ্নে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য, অগণিত জীবজন্তু, কত কিছু আমরা দেখি ও তৎকালে সেগুলি সব সত্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে উহারা কোথায় মিলাইয়া যায়, উহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। স্বপ্নপদার্থ স্বপ্নদর্শনের পূর্বেও ছিল না ও স্বপ্নভঙ্গের পরও থাকে না। উহা যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণই উহার স্থিতি। অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী। ইহাকেই বেদান্তের পরিভাষায় প্রাতীতিক বা প্রাতিভাসিক বস্তু বলা হইয়া থাকে।

স্বপ্নবিচারে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ তাহা হইলে সৃষ্টিরহস্যসমাধানে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে। নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূত অবস্থাগুলি লইয়া বিচার করিবার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে। নতুবা কে কি বলিয়াছে তাহাই " 'বাবা'-বাক্যং প্রমাণম্" বলিয়া মানিয়া লইয়া 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'—ন্যায়ে অন্ধকূপে পড়িয়া চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। স্বপ্নে এক দ্রষ্টা আমাতেই যাবতীয় দৃশ্যের প্রতীতি হইতেছে। জাগ্রতে আসিয়া কিন্তু আমরা সে অবস্থার দ্রষ্টা

ও দৃশ্যের অধ্যস্তত্ব (মিথ্যা আরোপিতত্ব) স্পষ্টই বুঝিতে পারি। এইরূপে জাগ্রতের দ্রষ্টৃত্ব এবং দৃশ্যত্বও বিচারণীয়।

দেশ কাল বস্তু সবই আমাদের মনেরই কল্পনা বা বিলাসমাত্র। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই যেন করুণাময় ভগবান্ তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টি-রচনার মধ্যে আমাদের জীবনে এই স্বপ্নাবস্থাটি দিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, স্বপ্নের দেশ কাল জীব জগৎ আদি সব কিছুই আমাদের স্বীয় সামর্থ্যে নির্মিত। স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ এক আমিই তখন বিদ্যমান এবং আমার জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য, জীব-ঈশ্বর চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে। আমিই সেখানে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডনির্মাতা—ব্রহ্মা। স্বপ্নে আমার সামর্থ্য কি অপরিসীম! জাগ্রতে আসিয়া কিন্তু আমরা ঐ নিজ সামর্থ্য ভুলিয়া যাই। জাগ্রৎকালীন সৃষ্টিরহস্যসমাধানের চাবিকাঠি ঐ স্বপ্নাবস্থায় পাওয়া যাইবে। জাগ্রৎসৃষ্টিও স্বপ্নের ন্যায় আমারই মনের বিলাসমাত্র অর্থাৎ আমারই জ্ঞানের বিলাসমাত্র। কারণ, আমার কল্পনা হইতে আমি কখনই ভিন্ন নহি। এই তত্ত্বটি সত্য হইলেও ধারণা করা কঠিন। অনাদিকাল-পুষ্ট সুদৃঢ় দ্বৈতভেদের প্রভাবে (সংস্কারবশতঃ) আমরা আমাদের সহজাত এই জাগ্রৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব কল্পিত ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদির উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হই ও সংকটকালে পরিত্রাণ পাইবার আশায় তাঁহাদের আরাধনায় ব্যাপৃত হই অথবা স্তবস্তুতি এবং রসনাপরিতৃপ্তিকর নানা ভোগ্য দ্রব্যসম্ভার উপহার দিয়া তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভের জন্য ব্যাকুল হই! কিন্তু ঐ সব দেবদেবী, ব্রহ্মলোক, শিবলোকাদি কল্পনার মূলেও যে 'আমি', 'চেতন আমি'! 'আমি' না থাকিলে এ সকল কিছুই নাই। প্রমাতার প্রথম অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে প্রমাণপ্রমেয়বিষয়ক কোন অনুসন্ধান বা প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। ('সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণা-ন্বেষণা ভবতি।' —(গীতা, শংকরভাষ্য ২।১৮) জাগ্রৎ ও স্বপ্নে সর্ববস্তুর প্রকাশ আমিই করিয়া থাকি ও সুষুপ্তিতেও সর্বাভাবের আমিই জ্ঞাতা বা প্রকাশক। সুষুপ্তিকালে সর্বাভাব হইলেও 'আমি' থাকি। সুতরাং আমা হইতেই সর্ববস্তুর উদ্ভব, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। আমিই বহুরূপে প্রতীত হই।

'আমি' বা চেতন আত্মা হইতে এই জগৎ-সৃষ্টি হইল কি প্রকারে—এই শঙ্কার উত্তরে আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, নিরবয়ব পরমাণু হইতে ঈশ্বর এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু নিরবয়ব পরমাণু হইতে সাবয়ব স্থূল সৃষ্টি অসম্ভব। উপাসক হয়তো বলিবেন ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্টিরূপ হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বর পরিণামী ও বিনাশী হইবেন। জড়বস্তুর ন্যায় পরিণামী ও বিনাশী ঈশ্বর হইতে পারেন না। অতএব চেতন হইতে সৃষ্টি কেবল ভানাত্মক, প্রতীতিমাত্র, ইহাই স্বীকার্য—যেমন জলে তরঙ্গ, সূর্যে কিরণ ইত্যাদি। সৃষ্টি চেতনে কেবল একটা স্ফুরণ বা প্রতীতিরূপ, দ্রব্যরূপ নহে। সৃষ্টি চেতনের বিবর্ত, অর্থাৎ এক চেতনই সর্বরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। এই প্রতীতি সত্য বা অসত্য কিছুই নহে—উহা অনির্বচনীয় মিথ্যা। সুতরাং চেতনকে ঘটনির্মাতা কুলালের ন্যায় নিমিত্তকারণ বা মৃত্তিকার ন্যায় উপাদানকারণ বা উর্ণনাভির ন্যায় অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ —বস্তুতঃ, এসব কিছুই বলা যায় না। জিজ্ঞাসুকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সময় সময় এ সব কথার অবতারণা করা হয় মাত্র।

স্বপ্নকালে যেমন একই আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্বপ্নদৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন, জাগ্রতেও সেইপ্রকার

এক আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যাকারে প্রতীত হইতেছেন। স্বপ্নের জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এককালে যুগপৎ উৎপন্ন হয় ও উহা সাক্ষিভাস্য। জাগ্রৎকালের জীব, জগৎ ও ঈশ্বরও তদ্রূপ শুদ্ধচৈতন্যের উপর অবিদ্যাবশতঃ যুগপৎ উৎপন্ন ও সাক্ষিদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। স্বপ্নের কার্যকারণভাব, পিতাপুত্র ইত্যাদি একইকালে উৎপন্ন; জাগ্রতেও তদ্রূপ। দেশ-কাল, পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল—সবই জাগ্রতে এক আত্মারই বিস্তার বা মায়িক স্পন্দনমাত্র। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই সেই বস্তু আছে বলিয়া মনে হয়, জাগ্রতেও তাহাই। সর্ববস্তুই জ্ঞাতসত্তা অর্থাৎ জ্ঞানকালেই উহাদের সত্তা, অন্যকালে নহে। অর্থাৎ সৃষ্টি কেবল প্রতীতি-কালমাত্রস্থায়ী। ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ বলিয়া কিছু নাই। এই দৃষ্টিলাভেই জ্ঞানের চরম সার্থকতা। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তোক্ত—

'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ'

—দৃষ্টি অর্থাৎ মনের বৃত্তি বা কল্পনার সমকালে ঐ কল্পনার অনুরূপ বস্তুর একটা মিথ্যা প্রতীতিরূপ সৃষ্টি এবং তদ্রূপ দর্শন ও কথন। বস্তুতঃ বাহিরে বস্তু বলিয়া কিছু নাই। স্বপ্নে যেমন বস্তুতঃ কোন বস্তু না থাকিলেও মনই সব কল্পনা করিয়া থাকে ও সেখানে বাহির ভিতর বলিয়া অনুভব হইলেও সে সবই মনের কল্পনা-মাত্র, জাগ্রদ্ব্যবহারেও সেইরূপ।

'নাস্তি প্রতীত্যবসরে ন পুরা ন পশ্চাদ্
আশ্চর্যমেতদবভাতি তথাপি বিশ্বম্।
যদ্বা কিমদ্ভুতমিবেহ মহেন্দ্রজালং
মায়াবিকল্পিতমপি প্রতিভাসতে হি ॥'

—দৃশ্যমান বিষয়সকল প্রতীতিকালেও বস্তুতঃ নাই এবং প্রতীতির পূর্বে বা পরেও নাই, তথাপি এই দৃশ্য-প্রতিভাস হইতেছে, কি আশ্চর্য! মহা ইন্দ্রজালসদৃশ এই জগৎ মায়া দ্বারা কল্পিত হইলেও সত্যবস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়, ইহা কি অদ্ভুত!

মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণের ও ভাগবতের পূর্বোল্লিখিত স্থলে বেদান্তের এই অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তই ধ্বনিত হইতেছে না কি?

বালাকির ব্রহ্মজ্ঞান

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসমূহের একটি সংকলন করিয়াছিলেন। উহা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' নামে একটি ছোট পুস্তকাকারে ভক্ত সমাজে বহুল প্রচারিত। শোনা যায়, যখন তিনি শ্রুত উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন তখন ভ্রমবশতঃ কিছু স্খলন বা ত্রুটি ঘটিয়া থাকিলে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিতেন—'ওরে, ওরূপ লিখেছিস্ কেন ? আমি তো ওরূপ বলিনি, আমি এইরূপ বলেছি'—এইরূপে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। সুতরাং এই উপদেশ-সমূহের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। ঐ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের নাম রাখা হইয়াছে 'আত্মজ্ঞান'। তাহাতে সর্বপ্রথম উপদেশটি এই প্রকার—'মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে।' তৎপর তিনি বলিয়াছেন—'"আমি কে" এটি বিচার করলে আমি বলে কোন জিনিস পাওয়া যায় না। শেষে যা থাকে তাই আত্মা বা চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দর্শন দেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে।' বিষয়টি বিচার্য। চিনতে পারা অর্থ জানা। তাহা হইলে কথাটার অর্থ হইল এই যে, মানুষ নিজেকে জানিলেই ভগবানকে জানিতে পারে। নিজেকে জানা অর্থাৎ 'আমি কে' তাহা জানা। আর ভগবানকে জানা অর্থ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি জগৎকর্তা পরমেশ্বরকে জানা। প্রথমটিকে জানিলেই যদি দ্বিতীয়টিকেও জানা যায়, তাহা হইলে এই দুইটির পরস্পর সম্বন্ধ কি ? দুইটি বস্তু যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় তবে ঐ দুইটির একটিকে জানিলেই অপরটির জ্ঞানও হইবে, একথা কেহই স্বীকার করিবে না। একটি গরুকে জানিলে তাহা হইতে ভিন্ন একটি বৃক্ষেরও জ্ঞান হইয়া যাইবে, ইহা একান্তই অযৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ প্রমাণবিরুদ্ধ কথা। কিন্তু যদি দুইটি বস্তু অভিন্ন হয় তবে তার একটিকে জানিলে অপরটিও জানা হইয়া যায়—একথা বলিলে কোন দোষ হয় না। একটা অভিন্ন বস্তুই কোন কারণবশতঃ দুইরূপে প্রতীত হইতেছে মাত্র—এরূপ হইলে দুইরূপে প্রতীয়মান বস্তু দুইটির মধ্যে একটির যথার্থ জ্ঞান হইলে ঐ ভেদের উপস্থাপক নিমিত্তটিও বিনষ্ট হইয়া যায় ও দ্বিতীয় বস্তুটিরও জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়, ইহা যুক্তিসঙ্গত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই বাণীতে কি ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন ?

'আমি কে ?' 'ঈশ্বর বা ব্রহ্ম কি ?' 'জগৎটা কি'—এই সব প্রশ্ন সনাতন। উপনিষদে এই সব প্রশ্নের সমাধান ঋষিরা নানা উপায়ে করিয়াছেন দেখা যায়। 'কৌষীতকী' উপনিষদে এই বিষয়-গুলির সমাধান মনোরম আখ্যায়িকার সহায়ে কিরূপে আলোচিত হইয়াছে তাহা আমরা দেখিব।

বাগ্মী ব্রাহ্মণ 'বালাকি' বেদাদি শাস্ত্র যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছেন। উপাসনাতেও তিনি সুনিপুণ। নিজের জ্ঞানের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন এবং সেজন্য তাঁর যথেষ্ট গর্বও ছিল। তপঃ, স্বাধ্যায় ও উপাসনাবলে বালাকির মন বিষয়বাসনারহিত হইয়া শুদ্ধ থাকিলেও একটু গর্বরূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন

প্রাণোপাসক। সমষ্টিপ্রাণ বা সূত্রাত্মাকেই তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও ব্যষ্টি শরীরে নাসিকাদি দেহসঞ্চারী প্রাণবায়ুকেই তিনি জীবাত্মা বলিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গর্বিত লোকের স্বভাবই এইরূপ যে, সে সকলকে নিজের জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বালাকির ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। সেই সময়ে কাশীরাজ অজাতশত্রুর দেশ-বিদেশে খুব নাম। তিনি বিদ্বান্, অশেষ শাস্ত্রপারঙ্গম, বিনয়ী, সেবা-পরায়ণ, সৎসঙ্গী, বিদ্যোৎসাহী, সর্বভূতহিতে রত ও তত্ত্বজ্ঞ। তাঁর প্রশংসা সকলের মুখে। শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানও কাশীরাজের করায়ত্ত ছিল। তিনি ছিলেন সার্থকনামা। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া অন্তরেও কাম ক্রোধ মোহ অজ্ঞানাদির লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না এবং আপন শৌর্যবীর্যাদি প্রভাবে বাহিরেও সর্বশত্রুগণকে তিনি পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই বাহিরেও তাঁহার শত্রু কেহই ছিল না। তাঁহার অজাতশত্রু নাম যথার্থই সার্থক হইয়াছিল।

গর্গগোত্রোৎপন্ন প্রাণোপাসক এই 'দৃপ্ত' স্বীয়জ্ঞানগর্বিত উদ্ধত ব্রাহ্মণ বালাকি একদিন কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'মহারাজ! শুনিয়াছি তুমি তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু, আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব।' শ্রদ্ধা ও বিনয়ান্বিত রাজা বালাকিকে যথাযথ সম্মানপূর্বক আচার্যের আসনে বসাইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বালাকি বলিলেন—'এই দৃশ্যমান আদিত্য-মণ্ডলান্তর্গত পুরুষই ব্রহ্ম। তুমি তাহার উপাসনা কর।' রাজা স্বীয় হস্তোত্তোলনপূর্বক বালাকিকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—'এই উপাসনা আমি পূর্বেই অবগত আছি। ধ্যেয় আদিত্যপুরুষের এই উপাসনার ফলও আমি সম্যগ্‌রূপে জানি। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান নহে। অতঃপর যদি আর কিছু উচ্চতর বিষয় আপনার জানা থাকে তবে তাহা বলুন।' তখন বালাকি আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, মেঘমণ্ডল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল, দর্পণ, ছায়া, প্রতিধ্বনি, শব্দ, স্বপ্ন, দেহ, দক্ষিণাক্ষি, বামাক্ষি—এই ষোড়শ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার কথা পর পর বলিলেন। প্রতিবারই রাজা 'এই উপাসনা ও তাহার ফল আমি পূর্ব হইতেই অবগত আছি। অতঃপর যদি কিছু জানেন তবে তাহা বলুন'—এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। বালাকি কিন্তু এতদতিরিক্ত আর কিছু তত্ত্ব জানিতেন না। তখন তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরব্রহ্মবিদ্ রাজা অজাতশত্রু তখন বালাকিকে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে বৃথাই উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। আপনার ব্রহ্মবিত্ত্বের অভিমান বৃথা। আপনি পরমতত্ত্ব না জানিয়াও নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ মনে করিয়া বৃথাই গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন ও "আমি ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব" এইরূপ ইচ্ছা প্রকট করিয়াছেন। হে বালাকি! ইহা নিশ্চিত-রূপে জানিবেন যে, জীবজগতের কারণ একমাত্র ব্রহ্ম।' বালাকির মনমুখ এক ছিল। তিনি নিজের ভুল বুঝিয়া অনুতপ্ত হইলেন ও সবিনয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে রাজার নিকট ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন—'তাহা হইতে পারে না। আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর আমি ক্ষত্রিয়। আমি কখনই আপনার গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি আপনি সরল, নিষ্কপট ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু। তাই আপনাকে আমি ঐ বিষয়ে বলিব স্থির করিয়াছি। ইহা যদিও বিপরীত রীতি, কিন্তু যথার্থ শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসুকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। আপনি আচার্য হইয়াই থাকুন। আমি আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে বলিব।'

এতদনন্তর বিশ্বাস উৎপাদনার্থ লজ্জাবনতদৃষ্টি বালাকিকে রাজা হাতে ধরিয়া উঠাইলেন ও তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বালাকির দৃঢ়জ্ঞান ছিল যে, সমষ্টি প্রাণ বা সূত্রাত্মাই ব্রহ্ম ও ব্যষ্টি জীবদেহস্থ প্রাণই জীবাত্মা। তাঁহার এই ভ্রম দূর করিবার জন্ম বালাকিসহ রাজা অন্তঃপুরে একটি সুষুপ্ত পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হে বালাকি! সুপ্ত পুরুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বিলীন হইয়া গেলেও তার প্রাণ কিন্তু স্বকর্ম করিতে থাকে, উহা বিলীন হয় না। ঐ দেখুন, এই সুষুপ্ত পুরুষটি দর্শনশ্রবণরহিত হইয়াও কেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে। যদি প্রাণই জীব হয় তবে নাম ধরিয়া ডাকিলে প্রাণ নিশ্চয়ই জবাব দিবে।' এই বলিয়া রাজা প্রাণের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নামসমূহ (সোম, রাজন্, বৃহন্, পাণ্ডরবাস ইত্যাদি) দ্বারা প্রাণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। লোকটি কিন্তু তাহাতে জাগিল না, বরং পূর্বের ন্যায় নাসিকা গর্জন করিতে লাগিল। তখন রাজা তাহাকে একটি যষ্টি দ্বারা তাড়না করাতে সেই ব্যক্তি বায়ুর তাড়নায় ভস্মাবৃত বহ্নির জ্বলনের ন্যায় শীঘ্রই জাগিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন—'দেখুন, প্রাণ বোধহীন, তাই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকাতেও সে জাগিয়া উঠিল না। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত চেতন আত্মাই জীব। চিত্তের আভাস-সহ অহংকারই জাগ্রতে সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। উহাই ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। তাহাকেই আপনি কর্তা ভোক্তা জীবাত্মা বলিয়া জানুন।' প্রাণাত্মবাদী বালাকি ইহা শুনিয়া অতি বিস্মিত ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ মনে করিয়া আর কিছু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। রাজা কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িলেন না। কারণ বালাকিকে ব্রহ্মোপদেশ করিতে তিনি প্রতিশ্রুত। শ্রদ্ধালু বিনয়ান্বিত মন্দধী জিজ্ঞাসু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিলেও তাহাকে বিদ্যোপদেশ কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রের বিধান।

রাজা নিজেই এখন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—'হে বালাকি! যে কর্তা ভোক্তা জীব সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইল, সে এতক্ষণ কোথায় ছিল এবং কোথা হইতেই বা সে আগত হইল, সুষুপ্তিতে তো বুদ্ধি ছিল না, কোথা হইতে উহা ফিরিয়া আসিল?' বালাকি ইহার উত্তর জানিতেন না। তখন রাজা স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন :

দেহ মধ্যে কমলাকার হৃদয়প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া নাড়ীসমূহ সর্বশরীর পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। অহংকার উপাধিক আত্মা জীবরূপে এই হৃদয়েতে অবস্থান করেন। তিনি নাড়ী সহায়ে সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জাগ্রৎকালে বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। জাগ্রতের বাহ্য ভোগপ্রদ কর্ম ক্ষীণ হইলেও সংস্কারবশে সূক্ষ্ম ভোগদায়ী কর্মভোগ প্রদানে উন্মুখ হইলে উক্ত জীবই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন। স্বপ্নভোগপ্রদ কর্মও ক্ষয় হইলে ঐ জীব পুনরায় হৃদয়ে সংকুচিত হইয়া থাকেন। ইহাই সুষুপ্তি অবস্থা। তখন ইন্দ্রিয়সমূহ নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া পড়ে। পরমাত্মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনিই অজ্ঞানকার্য অহংকার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবরূপে প্রতীয়মান হন। তখন সেই জীবই নানা কর্মের কর্তা ও ফলভোক্তা হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ফলদ কর্ম ক্ষয় হইলে ঐ অহংকারই স্বকারণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া পড়ে এবং জীব পরমাত্মাসহ একতা প্রাপ্ত হয়।

সুষুপ্তিকালে সর্ববাহ্য ও আন্তরদৃশ্য প্রাণে লয় হয়, এরূপও বলা হইয়া থাকে। প্রাণ শব্দ বায়ু ও পরমাত্মা উভয়েরই বাচক। দৃষ্টিভেদে সর্বদৃশ্য প্রাণ বা পরমাত্মাতে লয় হয়, এরূপ বলা

যাইতে পারে। সুষুপ্ত পুরুষের ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকল প্রাণে লয় হয়, নিকটে উপস্থিত ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করেন। কারণ তখন একমাত্র প্রাণেরই ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি মনে করেন যে, ঐকালে এক অদ্বৈত পরমাত্মাতেই সর্বদ্বৈত বিলয় ঘটিয়াছে। কারণ তাহার দৃষ্টিতে তখন প্রাণও ছিল না। সুষুপ্ত পুরুষের অভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়াই সর্বশাস্ত্রে পরমাত্মাতেই জগতের লয়ের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং 'সুষুপ্তিকালে জীব কোথায় বিলীন হইয়াছিল এবং কোথা হইতে আগত হইল'—পূর্বোক্ত প্রশ্নের ইহাই উত্তর হইল যে, সুষুপ্তি কালে জীব পরমাত্মা-সহ একাকার (তাদাত্ম্যাপন্ন) হইয়াছিল। অহংকারসহ জগতের অজ্ঞানে বিলয়ের নামই সুষুপ্তি। সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানাবৃত পরমাত্মা হইতেই পুনরায় জীব জাগ্রদ্দশায় আগমন করিয়া থাকে। অগ্নি হইতে বিচ্ছুরিত বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জাগ্রতে সেই পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াভিমানী অগ্ন্যাদি দেবতা সকল ও বিষয়সমূহ উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই প্রতি জীবের প্রাতিস্বিক (নিজ নিজ) সৃষ্টি।

সর্বসাধারণস্বীকৃত আর এক প্রকার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথাও শ্রুতি বলিয়া থাকেন। উহা আকাশাদিক্রমে বর্ণিত। পরমাত্মা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী,—এই ক্রমে সূক্ষ্ম ভূতসৃষ্টি। তৎপর উহারা পঞ্চীকৃত হইলে স্থূল, ভূত ও ভৌতিক বিষয় সকল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। সর্ব-প্রাণীর কর্মক্ষয়ে মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে। পুনরায় জীবকর্মের সমুদ্ভব হইলে পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা এক মত। সর্বসাধারণ এই প্রকার সৃষ্টিক্রমের বিষয়ই অবগত আছেন।—পূর্বোক্ত মতে প্রতি জীবের জাগ্রত স্বপ্ন ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় হইলে সুষুপ্তি নামক প্রলয় হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রে নিত্যপ্রলয় নামে কথিত। পুনরায় ভোগপ্রদ কর্মের উদ্ভবে জাগ্রদবস্থা ও তৎসহ সর্বপদার্থের নিত্যই সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টিক্রম বর্ণনা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। মিথ্যা সৃষ্টি কি প্রকারে হইল তাহার প্রতিপাদনে শ্রুতির আগ্রহ নাই। সর্বত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্ব প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য। অদ্বৈততত্ত্ব বোধনের জন্যই সৃষ্টির কথা পূর্বোক্ত দুই প্রকারে কল্পনা করা হয় মাত্র। জীবের প্রাতিস্বিক সৃষ্টিই হউক বা সর্ব-সাধারণস্বীকৃত মহাসৃষ্টিই হউক তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ শ্রুতির নাই, অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব, ইহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশাল রাজপুরীতে প্রবেশের জন্য সম্মুখে একটি বিরাট আকারবিশিষ্ট ফটক বা সিংহদ্বার থাকে। পুরীর পশ্চাতেও একটি ছোট দ্বার থাকে। সম্মুখের দ্বার সর্বসাধারণের প্রবেশের জন্য। পশ্চাতের ছোট দ্বারটি অন্তঃপুরস্থ বিশিষ্ট রাজসেবকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরীর সম্মুখদ্বারে রাজদর্শনার্থ নিত্য বহু জনসমাগম এবং প্রবেশপথে নানাস্থানে সিপাহীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকায় অনেকের ভাগ্যেই রাজদর্শন সহজে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু স্বামিভক্ত কেহ কেহ পুরীর পশ্চাতে অবস্থিত ছোট দ্বারাবলম্বনে অবিলম্বেই রাজদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। সেইরূপ 'প্রাতিস্বিক সৃষ্টি' বা 'দৃষ্টি-সৃষ্টি' প্রক্রিয়াবলম্বনে জিজ্ঞাসু অতি সহজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। অপর সর্বসাধারণ-পরিজ্ঞাত মহাসৃষ্টি প্রক্রিয়াবলম্বনে প্রথমতঃ 'ত্বং' পদার্থের শোধন অর্থাৎ তাৎপর্য-নির্ণয় ও তৎপর 'তৎ' পদার্থের শোধনানন্তর মহাবাক্যের বিচার-সহায়ে জ্ঞানলাভ বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং রাজা অজাতশত্রু বালাকিকে অনায়াসে অতি অল্পকালের মধ্যে প্রত্যগ্-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করাইবার

উদ্দেশ্যে এই 'দৃষ্টিসৃষ্টি' প্রক্রিয়াই অবলম্বন করিলেন।

দৃষ্টি—অর্থাৎ অহংকার মনোবুদ্ধির উদয়ে অজ্ঞান ও পূর্বসংস্কারবলে আন্তর বিষয়াকার বৃত্তির উদয় ও তৎকালেই বাহ্যদেশে প্রতীতিকালমাত্র-স্থায়ী ভূতভৌতিক বিষয় সকলের সৃষ্টি। সর্ব জগৎ ও বিষয় সকল কেবল একটা মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। সত্য একমাত্র সদাবিদ্যমান জীবের সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি যাহা জীব মন-বুদ্ধি-অহংকারাদির বিলয়ে পূর্ণতাদ্বারা অনুভব করিয়া থাকে।

রাজা অজাতশত্রু বালাকিকে ব্রহ্মতত্ত্ব বোধনের নিমিত্ত একমাত্র সুষুপ্তি অবস্থার বিচারই পর্যাপ্ত মনে করিয়া সাক্ষাৎ স্ব স্ব অনুভব স্মরণপথে আনয়নপূর্বক ইহাই দেখাইলেন যে, সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান বিদ্যমান, সেই অজ্ঞানেই তৎকালে সর্বদৃশ্য পদার্থ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি বিলীন বা সুপ্ত হইয়া থাকে। পুনঃ ভোগপ্রদ কর্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া জাগ্রতে সেই অহংকারাদিরই পুনঃ আবির্ভাব হয়। অহংকার দ্বারা অবচ্ছিন্ন চেতন আত্মাও তখন কর্তা ভোক্তা-রূপে প্রকট হন। ভোক্তা আত্মা হইতেই ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা সকল, ভোগায়তন দেহ ও বাহ্য জগৎ বিস্তার লাভ করে। ইহারই নাম 'প্রাতিস্বিক-সৃষ্টি বা 'দৃষ্টিসৃষ্টি'। নিত্যই এই সৃষ্টি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানাবৃত পরমাত্মাতে বিলীন হইতেছে ও জীবকর্মবশে নিত্যই উহা জাগ্রতে পুনঃ সৃষ্ট বা আবির্ভূত হইতেছে। সুতরাং জীবই স্বয়ং এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। ইহাই বেদান্তোক্ত 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' বা 'একজীববাদ'।

সর্বৈশ্বর্যশালী অন্য একজন পরমেশ্বর জগৎ-কর্তা, যিনি জীব হইতে ভিন্ন ও সর্বজীবজগতের নিয়ামক—পূর্ব পূর্ব সংস্কার প্রভাবে এই ধারণা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের চিত্তেও বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেও অজাতশত্রু তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া সুষুপ্তি অবস্থাতেই পরমাত্মাসহ বালাকির পরিচয় করাইয়া দিলেন। সুষুপ্তিকালে এক অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই অনুভূত হন। মায়িক অহংকার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াই সেই আত্মা জাগ্রতে সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজা বলিলেন—সুষুপ্তিকালে এই অহংকার, কর্তা ভোক্তা জীব যাঁহাতে একাকার হইয়া, বিলীন হইয়া থাকে ও যাঁহা হইতে জাগ্রতে পুনরায় আবির্ভূত হয়, তাহাই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, ইহাই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ। বালাকিকেও তিনি এই তত্ত্বই নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে উপদেশ দিলেন। এবং বালাকিও স্বীয় বিদ্যাগর্ব পরিত্যাগ পূর্বক নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া কৃতকৃত্য হইলেন।

দেখা যাইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণও এই কথাই বলিয়াছেন—'বিচার কল্লে "আমি" বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা-চৈতন্য। "আমার" "আমিত্ব" দূর হলে ভগবান দেখা দেন।'

মন-বুদ্ধি-অহংকারাদির বিলয় ঘটিলে এক অদ্বিতীয় আত্মাই থাকেন। তাঁহাকে জানাই নিজেকে জানা। উহাই ভগবদ্দর্শন বা ব্রহ্ম-দর্শন।

'ইহ চেদবেদীৎ...'

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রুতি নিজমুখে ঘোষণা করিয়াছেন—

'ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,
ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।...'

(কেন উপঃ ২।৫)

—এই জীবনেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান হয় তবেই মানবের সত্যলাভ হইল, সে ধন্য হইল। এই জন্মে লাভ না হইলে মহান্ বিনাশ অর্থাৎ সুদীর্ঘ সংসারগতি অব্যাহত রহিল। সুতরাং বিবেকী পুরুষগণ স্থাবরজঙ্গম সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারপূর্বক 'আমি-আমার'-রূপ সংসারবন্ধন হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান—ইহাই শ্রুতি চান।

সংসার দুঃখের আগার। ইহা সর্বজন-বিদিত। দুঃখনিবৃত্তি সকলেরই কাম্য। কিন্তু সে দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি? সর্বপ্রকার দুঃখ-নিরসনের জন্যই মানুষ লৌকিক, অলৌকিক কত ভাবেই তো চেষ্টা করে, তাহা দ্বারা কিছু দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তি কখন কখন হইলেও উহারা আবার আসিয়া হাজির হয়, উহা দূর হইয়াও যেন হয় না। অতএব উহাকে ঠিক ঠিক দুঃখনিবৃত্তি বলা যায় না। দুঃখের বিরোধী সুখ। তাই মানুষ সুখপ্রাপ্তি দ্বারা দুঃখ দূর করিবার নানা উপায়-অন্বেষণে সদা ব্যাপৃত। বিষয়লাভ ও ভোগে সে সুখ পায়, সেইজন্য বিষয়-সম্পাদনে সে কতই না উদ্গ্রীব! কিন্তু ঐ বিষয়সুখও তো স্থায়ী হয় না! কোন্ মুহূর্তে পুনঃ দুঃখ আসিয়া তাহাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিবে সেই ভয়ে সে সদা কাতর। তাই মাতৃবৎ পরমহিতৈষিণী শ্রুতি করুণা-পরবশ হইয়া স্থায়ী সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় বলিতেছেন,—'ইহ চেদবেদীৎ...'। এই জীবনে এই শরীরেই যদি ব্রহ্মকে জান তবেই বাঞ্ছিত সুখপ্রাপ্তি ও সর্বদুঃখনিবৃত্তি ঘটিবে। কারণ ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ।

ব্রহ্মজ্ঞানে দুঃখনিবৃত্তি হয় কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মকে জানিলে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দুঃখনিবৃত্তি হইবে কেন? দুঃখ বাস্তব, রূঢ় সত্য। ইহা সকলেরই অনুভূত। কোন সত্য বস্তুরই তো জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি দেখা যায় না। সম্মুখস্থিত বৃক্ষটিকে আমি জানিলাম। কিন্তু কই, সেই বৃক্ষজ্ঞান-দ্বারা সেই বৃক্ষ বা অন্য কিছুর নিবৃত্তি বা বিনাশ তো ঘটিল না। বৃক্ষটিকে বিনাশ করিতে হইলে তাহাতে অগ্নিসংযোগরূপ ক্রিয়ার আবশ্যক হইবে। কিন্তু যখন মন্দান্ধকারে ঐ বৃক্ষে আমার পুরুষভ্রম হয়, তখন আলোকাদির সাহায্যে ঐ বৃক্ষজ্ঞান হইলে সেই জ্ঞানের দ্বারা ঐ পুরুষ-ভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ।

দুঃখ কল্পিত :

সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা কল্পিত বস্তুরই, ভ্রান্তিরই নিবৃত্তি হইতে পারে, কোন বাস্তব বস্তুর নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির কথা। অতএব দুঃখ আমাতে, আমার স্বরূপে, নিশ্চিতই কল্পিত, উহা বাস্তব হইতে পারে না।—

'ভ্রান্ত্যারোপিত সংসারো বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ।
রজ্জ্বারোপিত সর্পো ন ঘণ্টাঘোষান্নিবর্ততে॥'

—ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে আরোপিত সংসার-দুঃখ বিচারপ্রসূত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, কোন

কর্মের দ্বারা নহে। কারণ রজ্জুতে কল্পিত সর্প কি কখনও ঘণ্টাবাদনাদি কর্মদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে? তাহা কখনই হয় না। একমাত্র রজ্জুজ্ঞানই সেই কল্পিত সর্পের নিবর্তক।

ব্রহ্মকে অর্থাৎ আত্মাকে জানাই সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, —ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। ব্রহ্মকে না জানিলে বিনাশ অর্থাৎ সংসারচক্রে পুনঃপুনঃ আবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পুরাণ বলেন, চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে জীব মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন—'জন্তুনাং নরজন্ম দুর্লভম্' - সর্ব প্রাণিদেহের মধ্যে এই মনুষ্যদেহ-প্রাপ্তি বড়ই দুর্লভ। মনুষ্যশরীর জগন্নির্মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই শরীরেই তিনি জীবকে বিবেক, সদসদ্‌বিচারের ও তদনুযায়ী কর্ম করিবার যোগ্যতা দিয়াছেন, যাহার সম্যক্ উপযোগসহায়ে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দময় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। একবার অন্য যোনিতে জন্ম হইলে সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার কবে মনুষ্যদেহ লাভ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সেইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—'ইহ চেৎ' —অর্থাৎ যে মনুষ্যশরীর জীব লাভ করিয়াছে উহাকে ব্যর্থ ভোগবিলাসের মধ্যে বিপথগামী না করিয়া এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞানলাভের সম্যক্ চেষ্টা কর্তব্য।

ব্রহ্মরূপতা-প্রাপ্তি কি প্রকার :

শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায় ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? কোন বস্তুকে জানিলেই আমি তো সেই বস্তুর রূপ ধারণ করি না। আমি একটি বৃক্ষকে জানিলাম, তাহাতে সেই বৃক্ষ তো আমি কখনও হইয়া যাই না। তবে ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রহ্ম হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। ভ্রান্তিবশতঃই সে নিজেকে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন সংসারী জীব মনে করিতেছে। জ্ঞানদ্বারা সেই ভ্রান্তিই নিবৃত্ত হয়। তখন জীব নিজের সেই পূর্ব স্বরূপটিই যেন ফিরিয়া পায়। তাই বলা হয় জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও নিত্যনিবৃত্তের পুনঃনিবৃত্তি :

ব্রহ্মপ্রাপ্তি কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নহে। ইহা প্রাপ্ত বস্তুরই পুনঃপ্রাপ্তি মাত্র। প্রাপ্ত বস্তু যখন অজ্ঞানবশতঃ অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতিভাত হয় তখন সেই বস্তুর জ্ঞানদ্বারা ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে ঐ বস্তু লাভ হইল, এইরূপ উপচার হয় মাত্র। কণ্ঠস্থিত হার ভ্রান্তিবশতঃ মনে হয় উহা হারাইয়া গিয়াছে, পরে হার কণ্ঠেই রহিয়াছে দেখিয়া লোকে বলে যে হার পাইয়াছি। বাস্তবিক উহা অপ্রাপ্ত ছিল না, প্রাপ্তই ছিল, জ্ঞান দ্বারা কেবল ভ্রান্তিমাত্র নিবৃত্ত হইল। ব্রহ্মপ্রাপ্তিও তদ্রূপ। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ, কোনপ্রকার দুঃখের গন্ধলেশমাত্রও তাহাতে নাই। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও জীব নিজেকে দুঃখী বলিয়া অনুভব করিতেছে, এবং সেই দুঃখনিবৃত্তির জন্য অশেষ চেষ্টাও সে করিতেছে। দুঃখ বস্তুতঃ নিজেতে কোনওকালেই নাই, অথচ সে তাহা অনুভব করিতেছে। সুতরাং এই দুঃখও একটি ভ্রান্তি, ইহাই অবশ্য বলিতে হইবে। যে রজ্জুতে সর্প কোনকালেই নাই, তাহাতে যদি আমি সর্প দর্শন করি, তবে সেই সর্প ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে অবশ্যই ভ্রান্তি বলিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভ্রান্তি একমাত্র জ্ঞানদ্বারা নিরসনীয়। কারণ পরস্পরবিরোধী বলিয়া একমাত্র আলোকই

যেরূপ অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ, পরস্পর-বিরোধী বলিয়া তদ্রূপ একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। 'জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্'—(পঞ্চপাদিকা)। ব্রহ্মজ্ঞানে সর্বদুঃখ নিবৃত্ত হয়—ইহা বলাও একটি উপচার মাত্র। কারণ যে দুঃখ ব্রহ্মে কোনকালেই নাই, তাহা আবার দূর হইবে কিরূপে? সুতরাং দুঃখ-প্রতীতি—এই ভ্রান্তিমাত্র দূর হইল বলিতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, নিত্য-প্রাপ্ত বস্তুরই পুনঃপ্রাপ্তি এবং নিত্য নিবৃত্তের পুনঃনিবৃত্তি—ইহা একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই হয়, কর্ম উপাসনা বা অন্য কোন উপায়েই নহে। আচার্য নরহরি বলিয়াছেন :—

'জানাতি বা ন জানাতি ব্রহ্ম জীবস্য জীবনম্।
জানাতি চেৎ মহান্ লাভো ন জানাতি
মহদ্ভয়ম্ ॥'—

জীব সদাই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা সে জানুক বা না জানুক। তবে জানিলে মহালাভ, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি, পরমানন্দস্বরূপপ্রাপ্তি! আর না জানিলে মহাভয় অর্থাৎ এই সংসার-চক্রে বারবার নিষ্পিষ্ট হওয়া, এই ভ্রান্তিগর্তে পুনঃপুনঃ পতন।

ব্রহ্মের স্বরূপ :

ব্রহ্ম কিরূপ? উত্তরে শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সদ্রূপ, চিদ্রূপ ও আনন্দরূপ। ইহা দ্বারা তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বা ধর্মের সমষ্টি ব্রহ্ম—এরূপ বুঝায় না। একই অনির্বচনীয় তত্ত্বের এই সংজ্ঞাত্রয়।

সৎ-চিৎ-আনন্দ—নিষেধে তাৎপর্য :

সংজ্ঞা থাকিলে ব্রহ্ম অনির্বচনীয় হইবেন কি প্রকারে, এইরূপ শঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি বলেন—'অথাত আদেশো নেতি নেতীতি'। নিষেধমার্গই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়, ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। সর্ব স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ প্রপঞ্চের, সর্ব দৃশ্যের নিষেধের অবধীভূত যে অনির্বাচ্য তত্ত্ব অবশেষ থাকেন, তাহাই ব্রহ্ম। তবে অনির্বাচ্য ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হয় কেন? উত্তরে বলা যায় যে ইহারও নিষেধেই তাৎপর্য। ব্রহ্ম কোন জড় পদার্থ নহেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে বলা হয় 'চিৎ'। পুনঃ তিনি অসত্তারূপ নহেন, সেইজন্য তাঁহাকে বলা হয় 'সৎ' এবং তিনি দুঃখরূপ নহেন বলিয়া তাঁহাকে 'আনন্দ-স্বরূপ' বলা হয় মাত্র।

চিৎ : এই চিৎ, সৎ ও আনন্দের অনুভব কি করিয়া হয়, সে বিষয়ে এক্ষণে বিচার করা যাউক। ব্রহ্ম চিদ্রূপ অর্থাৎ সদা প্রকাশমান স্ফুরণরূপ। কিন্তু সদা প্রকাশমান বস্তুর তো সদাই অনুভব হওয়া উচিত, তাহা হয় না কেন? উত্তরে বলা যায় যে, উহা সদা অনুভূত কারণ—

'অদৃষ্ট্বা দর্পণং নৈব তদন্তস্থেক্ষণং তথা।
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ ॥'—
(পঞ্চদশী ১৩।১০২)

—প্রথম দর্পণকে না দেখিয়া তাহাতে প্রতিবিম্ব যেরূপ কেহ দেখিতে পারে না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেও প্রথম অনুভব না করিয়া নামরূপাত্মক পদার্থ কেহ জানিতে পারে না।

সর্বজ্ঞানে চিৎ-এরই অনুভব :

ব্রহ্ম সদা অনুভূত। কিন্তু সেই অনুভবকে আমরা ভ্রান্তিবশতঃ বিষয়সহ মিশ্রিত করিয়া উহা বিষয়ানুভব বলিয়া মনে করি। সুতরাং আমরা ব্রহ্মকে জানিয়াও যেন জানিতেছি না। দৃষ্টান্ত সহায়ে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি একটি পুষ্প দেখিতেছি। কেবল পুষ্পই কি দেখি? না, তাহা নহে। আলোক বিনা পুষ্প দেখা যায় না, কারণ

অন্ধকারে সম্মুখস্থ পুষ্পও দৃষ্টিগোচর হয় না। 'যৎসত্ত্বে যৎসত্ত্বং যদসত্ত্বে যদসত্ত্বম্'—যাহা থাকিলে অন্য পদার্থটিও থাকে, যাহা না থাকিলে ঐ অন্য পদার্থটিও থাকে না—সেইস্থানে ঐ অন্য পদার্থটি পূর্ববস্তুরূপ। যেমন মৃত্তিকা থাকিলে ঘট আছে, মৃত্তিকা না থাকিলে ঘট নাই, অতএব ঘট মৃদ্-রূপ। বর্তমান স্থলেও আলোক থাকিলে পুষ্প দৃষ্টি-গোচর হয়, আলোক না থাকিলে হয় না। অতএব আলোকাকার বা আলোক-পরিব্যাপ্ত পুষ্পই আমরা দেখি, শুধু পুষ্প দেখি না। পুষ্পরূপ উপাধি যেন আলোককে তদাকার করিয়া দিয়াছে। পুনঃ ঐ আলোক দেখি চক্ষুবৃত্তিদ্বারা। সুতরাং আলোকাকার চক্ষু-বৃত্তিও অনুভব করি। চক্ষু বন্ধ থাকিলে পুষ্প বা আলোক কিছুই দেখা যাইবে না। চক্ষুবৃত্তির পশ্চাতে মন না থাকিলেও আবার চলিবে না। মন অন্য বিষয়ে মগ্ন থাকিলে খোলা চোখেও আমরা কোন বস্তু দেখিতে পাই না। মন বিষয়াকার হইলে তবেই সেই বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব। এইরূপ আলোক ও চক্ষুর্বৃত্তির মাধ্যমে পুষ্পাকার মনোবৃত্তি ঐ পুষ্পরূপ উপাধির অধিষ্ঠানচৈতন্যে ব্যাপ্ত অজ্ঞান নাশ করিলে তখন ঐ চৈতন্যেরই ভান হয়, ঐ চিদংশেরই ভান হয়, পুষ্পের নহে। নামরূপাত্মক পুষ্পের একটা মিথ্যা প্রতীতি বা অবভাস হয় মাত্র। বস্তুতঃ অনুভব এক চিৎ-তত্ত্বেরই হইয়া থাকে। এই রূপে দেখা যায় যে সর্ববিষয়ে জ্ঞানে এক চিৎ-অনুভবই হইয়া থাকে। বৃত্তি সর্বদা সত্তা ও চিৎ-কেই বিষয় করে, নামরূপকে কখনই করে না। ঘটের নামরূপ কেহ কোন দিন চোখে দেখে নাই বা দেখিবেও না। মৃত্তিকাকেই সকলে দেখে। কিন্তু অজ্ঞানী এ বিষয় জানে না। সে মনে করে যে, সে ঘট দেখিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এ বিষয়ে সচেতন নহি। কিন্তু এই অনুভবও যেন খণ্ডখণ্ড বিষয়ে চিত্তের খণ্ড-খণ্ডরূপে অনুভব।

ব্রহ্মানুভব :

শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনবলে চিত্ত যখন অখণ্ড ব্রহ্মাকার ধারণ করে, তখন সেই বৃত্তিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা ব্রহ্মাবরক ব্যাপক মূল অজ্ঞান বা মায়ার নাশ হইলেই তখন পূর্ণ অখণ্ড চিদ্ অনুভব হয়। তৎপশ্চাৎ সর্ববিষয়-জ্ঞান কালেও (তখন) এক ব্যাপক অখণ্ড চৈতন্যেরই অনুভব হইতে থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'প্রতিবোধবিদিতং মতম্'—(কেন, উপঃ ১।২।৪) অন্তঃকরণের প্রতি বিষয়াকার বৃত্তির প্রকাশক এক ব্যাপক চৈতন্যের অনুভবই ব্রহ্মানুভব। ইহাই ব্যবহারকালেও ব্রহ্মানুভব। আবার চিত্ত নির্বিকল্প হইলে সমাধি-অবস্থায়ও সেই ব্রহ্মানুভবই হয়। প্রভেদ এই যে, ব্যবহারকালীন ব্রহ্মানুভবে নামরূপাত্মক দ্বৈতের একটা প্রতীতি বা প্রতিভাস থাকে মাত্র, সমাধি-অবস্থার ব্রহ্মানু-ভবে সেটুকুও থাকে না।

'ব্যুত্থিতো বা সমাধির্বা বৃত্তিঃ সর্বা চিদা-কৃতিঃ'—ইহারই নাম 'জ্ঞানসমাধি' বা 'সহজসমাধি'। জ্ঞানীর সমাধি সর্বদা সর্বাবস্থায় বর্তমান, তাহার জন্য আর চেষ্টা বা যত্ন করিতে হয় না।

সৎ : ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সর্ব পদার্থে অনুস্যূতরূপে তিনিই প্রতিভাত হন। সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ এক ব্রহ্মসমুদ্রে মায়িক নামরূপের বিচিত্র বিলাসের নামই সৃষ্টি। তরঙ্গফেন-বুদ্বুদাদিবিকারের মধ্যে সর্বত্র যেমন একমাত্র

জলই রহিয়াছে, সর্ব দুঃখের মধ্যেও তদ্রূপ এক ব্রহ্মই রহিয়াছেন। 'ঘট আছে', 'পট আছে'—সর্ববস্তুই এইরূপে সত্তাসহ মিলিত-রূপেই প্রতিভাত হয়। ঘট কি বস্তু, ইহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহা কপাল-সমষ্টিমাত্র। কপালখণ্ডসমূহও মৃত্তিকাচূর্ণ ব্যতীত আর কিছু নহে। ঐ চূর্ণসকলও পার্থিব অণুসমুদায়রূপ। অণুসমূহও পৃথিবী-তন্মাত্রা সহ অভিন্ন। পৃথিবীতন্মাত্রাও জল-তন্মাত্রা হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদ্রূপ। এই-রূপে উহাও ক্রমে তেজ, বায়ু ও সর্বশেষে আকাশতন্মাত্রারূপ। আকাশতন্মাত্রাও অহংকার হইতে উৎপন্ন। অহংকারও ক্রমে মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মূল প্রকৃতিও স্বতন্ত্রসত্তারহিত বলিয়া সদ্‌ব্রহ্মরূপ।—এইরূপে দেখা যায় যে, জগতে যত বস্তুই আছে, তাহা সদ্‌ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। এক ব্রহ্মসত্তাই সর্বনামরূপের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু আমরা মোহবশতঃ তাহা ধরিতে অপারগ। ঐ সত্তা পৃথক পৃথক বস্তু-সমূহেরই স্বভাব বা ধর্ম মনে করিয়া আমরা ভ্রান্ত হইয়া থাকি।

আনন্দ: ব্রহ্মের সৎ-চিৎ রূপটি সর্বত্র সর্বাবস্থায় সর্ব-অনুভবে অনুগতরূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি। সত্ত্বগুণের পরিণাম দয়া, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে, কাম-ক্রোধাদি রাজসিক বৃত্তিতে ও জড়তা, তন্দ্রাদি কালে তমোগুণাক্রান্ত চিত্তে সমভাবেই সত্তারও স্ফুরণ ও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দ-রূপটি সর্বাবস্থায় ভান হয় না কেন? উত্তরে দৃষ্টান্ত সহায়ে বলা যাইতে পারে যে, অগ্নির আলোতে প্রকাশ ও উষ্ণতা উভয়ই বিদ্যমান থাকিলেও উহার প্রকাশ দূরবর্তী স্থান হইতেও উপলব্ধ হয়, কিন্তু অগ্নির উষ্ণতার অনুভব করিতে হইলে যেমন অগ্নির নিকট যাইতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সৎ ও চিৎ অংশের অনুভব সর্ব বৃত্তিতে হইলেও আনন্দাংশের অনুভব একমাত্র সাত্ত্বিক. শান্ত চিত্তবৃত্তিতেই হইয়া থাকে। চিত্ত শান্ত হইলে তখনই আনন্দানুভব হয়।

বিষয়ানন্দের সহিত সকলেই পরিচিত। বিষয়লাভের জন্য পুরুষ কত ব্যাকুল! তখন ঐ চঞ্চল চিত্তে দুঃখই অনুভূত হয় সুখ নহে। বিক্ষেপ, চাঞ্চল্যই দুঃখ। বিষয়লাভ হইলে তখন চিত্তের সেই চাঞ্চল্য কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়। ঐ শান্ত অবস্থা সত্ত্বগুণের পরিণাম। এই অবস্থা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকে না। কারণ চিত্ত পুনরায় আপন স্বভাববশে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া থাকে। সে যাহাই হউক, ঐ স্বল্পকালস্থায়ী সত্ত্বগুণাক্রান্ত চিত্তে স্বরূপানন্দ প্রতিফলিত হয়। উহাই বিষয়ানন্দ। আনন্দ বাহ্য পদার্থে নাই। আনন্দ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সুতরাং বস্তুতঃ জীবের নিজের স্বরূপ হইতেই আনন্দ বাহ্য পদার্থে আরোপিত হইতেছে মাত্র। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ জীব উহা বিষয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছে। চিত্তের বিষয়াকারতা রুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্ত পূর্ণ নির্বিষয় হইলে তখন অন্তরে পরিপূর্ণ আনন্দের প্রকাশ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাই স্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দানুভব। বর্তমান শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই 'সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই আমি'—সংশয়বিপর্যয়রহিত এইরূপ অভেদজ্ঞান হইলে তবেই লোকে কৃতকৃত্যতা লাভ করে ও সর্ব সংসারবন্ধন-সর্বদুঃখ-নিবৃত্তি হয়, নতুবা 'মহতী বিনষ্টিঃ'—অনিবার্য সংসার-দুঃখ আসিয়া জীবকে চিরতরে অভিভূত করিয়া থাকে।

অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তি :

শ্রুতি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের কথাই মুক্তিলাভের উপায়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পুনঃ শতমুখে শ্রুতি ভেদ-দর্শনের নিন্দাও বহু স্থলে করিয়াছেন। যথা—'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' —(কঠ,উপ, ২।১।১০,১১) আত্মাতে ভেদদর্শী পুরুষ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হয়। 'যদা হোবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে. অথ তস্য ভয়ং ভবতি।' (তৈ.উপঃ ২।৭)—যখনই অজ্ঞানী এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয়।—ইত্যাদি। অভেদেই শ্রুতির তাৎপর্য না হইলে ভেদ-দর্শনের এইরূপ নিন্দা কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। এইজন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার (ব্রহ্ম) অভেদ-বোধনেই সর্বশ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে সমন্বিত, ইহাই সিদ্ধান্ত।

আত্মা অর্থ আমি। আমা হইতে ভিন্ন যাহা, তাহা আমি নই। আমা হইতে অভিন্ন যাহা, তাহাই আমি। বিচারদৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, শরীর মন, ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য, সুতরাং উহারা আমা হইতে ভিন্ন এবং ভিন্ন বলিয়াই সেগুলি আমি নই। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই পরস্পরব্যভিচারী অবস্থাত্রয়ের মধ্যে এক সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে অনুগত আমিই সদা বিদ্যমান। ব্রহ্মের লক্ষণও শ্রুতি সৎ-চিৎ-আনন্দরূপেই নির্ণয় করিয়াছেন। কোন ভেদক ধর্ম না থাকাতে এবং জীব ও ব্রহ্ম একই লক্ষণবিশিষ্ট হওয়ায় উভয়েই অভিন্নস্বরূপ, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই।

ভেদ সর্বলোকপ্রত্যক্ষ। জন্মাবধি লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিতেই অভ্যস্ত। তাই ভেদসংস্কার সকলেরই প্রতি প্রবল। ভেদ ছাড়া লোকে কিছু ভাবিতেই পারে না। সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি সকলেরই কাম্য। উহাও লোকে ভেদজ্ঞান সহায়েই লাভ করিতে চায়। জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি—এ বিষয়ে সকল দার্শনিকই একমত হইলেও এক অদ্বৈত বেদান্ত ব্যতীত অপর সকলেই বলেন যে, ঐ জ্ঞান ভেদ-জ্ঞান। যথা—

সাংখ্য বলেন—বিচার সহায়ে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য-বোধই ত্রিবিধদুঃখধ্বংসরূপ মুক্তির হেতু। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য। অসঙ্গ চিৎ ও বিভু পুরুষ বহু।

পাতঞ্জল মতে—নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা পুরুষের জ্ঞানই মুক্তিহেতু। অন্যান্য বিষয়ে ইহারা সাংখ্য সহ একমত, কেবল ঈশ্বর অধিক স্বীকার করেন।

ন্যায়, বৈশেষিক মতে—যাবতীয় পদার্থ হইতে ভিন্ন আত্মার জ্ঞান হইলেই একবিংশতি দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

পূর্বমীমাংসা মতে—বৈদিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তিই মোক্ষ। একমাত্র উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তই বলেন যে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

জীব কি স্বতন্ত্র ?

স্বামী ধীরেশানন্দ

জীব কি স্বাধীন ? নিজের ইচ্ছামত কর্মাদি করিবার সামর্থ্য তাহার আছে অথবা নাই —এ-বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা সংক্ষেপে আমরা বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রে তিন প্রকার বচন পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ বচনগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ। অতএব বিষয়টি বিচার্য, কারণ বিচার ব্যতীত বিরোধ পরিহারপূর্বক সমন্বয় সাধিত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখা যায়, বেদাদি শাস্ত্র জীবের জন্য নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধের অবতারণা করিয়াছেন। যথা : 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত', 'স্বর্গকামঃ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ', 'কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ' —নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা উপাসনাদি করিবে, স্বর্গ-কামী অগ্নিহোত্র করিবে, কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না —ইত্যাদি। একজন কর্তা না থাকিলে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যদি জীবের কিছু করিবার বা না করিবার স্বাধীনতাই না থাকে, তবে 'এটা কর', 'ওটা করিও না'—শাস্ত্র এ-সব বলিতেছেন কাহাকে ? বিধি-নিষেধ পালন করিবে কে ? অতএব এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতার জন্য জীবের কিছু করা বা না করা বিষয়ে স্বাধীনতা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ব্যাকরণেও বলে : 'কর্তা স্বতন্ত্রঃ'—কর্তা স্বাধীন।

ব্রহ্মসূত্রেও আছে : কর্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ' (২।৩।৩৩)। —'জীবই কর্তা, কারণ তাহা হইলেই কর্তার অপেক্ষিত উপায়বোধক বিধিনিষেধ-শাস্ত্র সার্থক হয়। গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন : 'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত' (২।১৮) —হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ কর'। 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ' (২।৩৭) —তুমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (৯।৩৪)—তুমি আমার চিন্তা কর, আমাকে ভালবাস, আমারই জন্য কর্ম কর ও আমার কাছে নত হও অর্থাৎ অহংকারকে নত কর। 'কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বম্' (৪।১৫)— অতএব হে অর্জুন! তুমি কর্মই কর—ইত্যাদি।

জীবের কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এ-সব বাক্যের কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব জীব স্বতন্ত্র কর্তা এবং তাহা হইলেই স্বকৃত শুভাশুভ কর্মের জন্য জীব দায়ী হইবে। পরাধীন হইলে ভাল মন্দ কর্মের জন্য জীব দায়ী হইতে পারে না—এইটি আমরা প্রথমপক্ষ-রূপে ধরিয়া লইতে পারি।

দ্বিতীয় পক্ষে শঙ্কা হয় : জীব পরতন্ত্র বা পরাধীন কি না ? এই পক্ষে বলা যায়, সবই ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কিছুই হইতে পারে না। তিনিই সর্বভূতে অন্তর্যামিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন। এই বিষয়ে শ্রুতি-বচন দেখা যায় :

'এষ হি এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যম্
এভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে',
'এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো
নিনীষতে'। (কৌ উপ.—৩।৮)

—অর্থাৎ যাহাকে ঊর্ধ্বতন লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া ঈশ্বর শুভকর্ম করান, আর যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া তিনি অশুভ কর্ম করান। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শুভাশুভ কর্ম সব ঈশ্বরই করাইতেছেন। জীব নিতান্তই যন্ত্রবৎ

পরাধীন। অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যক উপ-নিষদ্‌ও বলিতেছেন—'যঃ পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্ ....…পৃথিবীমন্তরো যময়তি' ইত্যাদি (৩।৭।৩।২৩)—যিনি পৃথিব্যাদি সর্ব পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই অন্তর্যামী।

ব্রহ্মসূত্রও বলিতেছেন, 'পরাত্তু তৎ শ্রুতেঃ' (২।৩।৪১)—জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্বকর্মাধ্যক্ষ সর্বকর্তা ঈশ্বরের দ্বারাই অবিদ্যাবদ্ধ জীবের কর্তৃত্বাদি সংসার-বন্ধন ও তাঁহার কৃপাতেই জীবের মোক্ষসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরই কর্তা। গীতাতেও ভগবান্ বলিতেছেন ঃ

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

—হে অর্জুন, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া স্বমায়াবলে ঈশ্বর সকলকে যন্ত্রারূঢ়বৎ ভ্রামিত করিতেছেন। পুনঃ

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

—অর্থাৎ হে হৃষীকেশ, হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া তুমি আমাকে যেমন করাইতেছ, আমি তেমনি করিতেছি। আমি যন্ত্রমাত্র, তুমিই যন্ত্রী। দুর্যোধনের এই উক্তিটিও লক্ষণীয়। দুর্যোধনের ন্যায় সংসারে অনেকে এইরূপ বলিয়া নিজের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপকর্ম-ফলভোগ পরিহারের নিমিত্ত কোন কর্তৃত্বাভিমানী পুরুষের দ্বারা এই বাক্য কথিত হয় নাই। মূলতঃ ইহা জ্ঞানলাভের ফলে নিজেকে অকর্তারূপে অনুভবকারী কোন জ্ঞানী মহাজনেরই উক্তি।

এইরূপে পূর্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-আদির বাক্য-দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বরই কর্তা এবং জীব নিতান্তই পরতন্ত্র বা পরাধীন।

জগৎ, দেহ, মন ও বুদ্ধি-রূপ উপাধিসমূহে যে পর্যন্ত সত্যত্ব-বুদ্ধি জীবের বিদ্যমান, ততক্ষণ তাহার কর্তৃত্ব-বুদ্ধিও তাহার নিকট সত্য। তখন সে কর্তা ভোক্তা—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন গুরু, শাস্ত্র ও সৎসঙ্গের মহিমায় ঐ উপাধিগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন ঐ বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই কর্তা, জীব তাঁহার হাতে যন্ত্রমাত্র। কথঞ্চিৎ শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ, ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা—এই তত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না। কর্ম ঈশ্বরের, কর্মফলও ঈশ্বরের, আমি তাঁর দাস, যন্ত্রমাত্র—এই বুদ্ধিতে অহংকার-রহিত হইয়া এবং কর্মফলে আসক্তি ও অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে করিতে চিত্ত যতই নির্মল হইতে থাকে, ততই সাধকের স্পষ্ট ধারণা হয় যে, সর্বকর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব ঈশ্বরেরই, জীব মিথ্যাই কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকে মাত্র। জীব ঈশ্বরের অধীন।

তৃতীয় পক্ষটি হইতেছে অদ্বৈতবাদ। শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যবোধক বহু বাক্য দৃষ্টিগোচর হয়। যথা—'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই-সকল বাক্যের তাৎপর্য জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্ম অকর্তা, অভোক্তা, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, আকাশবৎ নির্লিপ্ত ও সর্বগত। ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিয়া জীবও তাহা হইলে অকর্তা, অভোক্তা, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি অবশ্যই হইবেন। সুতরাং জীবের স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র কর্তৃত্বাদির কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ জীবাভিন্ন ব্রহ্ম কর্তৃত্বাদিরহিত। জীব নিয়ম্য ও ঈশ্বর নিয়ামক—এ-কথা আর বলা চলে না।

এইরূপে জীব-স্বাতন্ত্র্য, জীব-পারতন্ত্র্য ও অদ্বৈতশ্রুতি—এই তিন পক্ষে পরস্পর বিরোধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এখন ইহার সমাধান কি? পৃথক্‌ভাবে এই বচনগুলি গ্রহণ করিলে একের

দ্বারা অপরটি খণ্ডিত হইয়া যায়। অতএব সোপানারোহণন্যায়-ক্রমে ইহাদের সমন্বয় করাই বিধেয়।

আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এই তিন প্রকার শাস্ত্র-বাক্যসমূহে কোন বিরোধ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাঁচজন ব্যক্তি যখন অন্নসম্পাদন করিবার জন্য একত্র হয়, তখন কেহ জল আনিতে যায়, কেহ কাষ্ঠসংগ্রহার্থ অন্যদিকে গমন করে, কেহ স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য সম্মার্জনী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত এবং দ্রব্যক্রয়ার্থ কেহ যায় দোকানে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল—বাহ্যতঃ এইরূপই মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে। ঐ পাঁচ ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম একই উদ্দেশ্যে সমন্বিত। আমাদের বিচার্য স্থলেও তদ্রূপ।

প্রথম পক্ষে জীব কর্তা। অজ্ঞানী জীবের কর্তৃত্বাদি-বুদ্ধি রহিয়াছে। শুভাশুভ কর্ম সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই করে এবং ইহার জন্য সে নিজেই দায়ী ও তাহার কর্মানুসারে ঈশ্বর তাহাকে সুখদুঃখ-ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অজ্ঞ জীবের পুরুষকার রহিয়াছে, কিছু করিবার সামর্থ্য তাহার আছে, ইহা সে ভালরূপেই জানে। তাই তাহারই কল্যাণের জন্য শাস্ত্র তাহাকে 'এটা কর', 'ওটা করিও না' ইত্যাদি বিধিনিষেধ বলিয়াছেন। কিন্তু জীবের এই সামর্থ্যও দত্ত সামর্থ্য, নিরঙ্কুশ সামর্থ্য নহে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোন বড় রাজকীয় কর্মচারী, তাহার কত ক্ষমতা! কিন্তু এ-সকল ক্ষমতাই তাহার রাজ্যসরকার হইতে প্রাপ্ত। সেই ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে সে অনেক কিছু করিতে পারে, নাও করিতে পারে। যদি ভালভাবে স্বকর্তব্য পালন করে, তবে সে পুরস্কার পায়, আর যদি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তবে সেও শাস্তি পায়। তেমনি স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে জীব স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারে, নাও করিতে পারে—এটুকু স্বাধীনতা তাহার আছে। অহংকার- এবং কর্তৃত্ববুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব কিছুটা পুরুষকার প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তাই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ তাহার প্রতি সার্থক।

দ্বিতীয় পক্ষে বলা যায়, বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই সর্বকর্তা আর জীব তাঁহার হাতে যন্ত্রমাত্র। যে মিথ্যা অহংকার ও কর্তৃত্ববুদ্ধির জন্য জীব সংসারে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ দুঃখানুভব করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্যই পরম-কারুণিক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আজ্ঞারূপ শ্রুতি-স্মৃতি-আদি শাস্ত্র বলেন: 'হে জীব, তুমি কর্তা নও, ঈশ্বরই পরম কর্তা। তুমি নিজেকে তাঁহার অধীন জানিয়া তাঁহার শরণাগত হও এবং ভৃত্যবৎ তাঁহার কর্ম করিয়া যাও। তিনিই সব করাইতেছেন, আমি কিছু নই; তিনি যেমন করান, তেমনি করি—এইরূপ ভাব লইয়া কর্ম কর।' নিজের ব্যষ্টি অহংকার খর্ব করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। অধ্যাত্মপথের সাধনাদি সে পরিপূর্ণভাবে করিবে, কিন্তু অহংকার করিবে না। অহংকার আসিলেই সব মাটি হইয়া গেল। আমি এত কর্ম করিয়াছি, এত সাধনা করিয়াছি, তাহার ফল ঈশ্বর দিলেন কোথায়?—এরূপ অভিমান থাকিলে তাহার সর্বকর্ম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

তাই জীব অহংকার করিবে না। সাধন-ভজন সবকিছুই পূর্ণমাত্রায় করিবে, প্রযত্ন কিঞ্চিন্মাত্রও শ্লথ হইবে না। কিন্তু অহংকার-রূপ মলিনতা তাহার কর্মকে যাহাতে কলুষিত করিতে না পারে, সে-বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে। সে বলিবে—তিনি অন্তর্যামী, তাঁহার ইচ্ছায় সব হইতেছে, আমি কিছুই নই। আমার সাধ্য কি যে কিছু করি। তিনি যতটুকু আমাদ্বারা

করাইয়া লন, তাহাই আমি করিয়া ধন্য হইতেছি মাত্র। ইনি পূর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের সাধক।

তৃতীয় পক্ষ সর্বোত্তম। সাধক অহংকার-রহিত ও ঈশ্বরতৎপর হইয়া সাধন করিতে করিতে যখন সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত হন এবং তাঁহার প্রাণে তীব্রভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগে, তখন তিনি গুরুর কৃপায় বেদান্তের মহাবাক্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। জীব ও ব্রহ্মপদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ তখন সাধক বুঝিতে সমর্থ হন এবং জীব ও ঈশ্বরের উপাধি অজ্ঞান ও মায়া মিথ্যা-জ্ঞানে বিচারসহায়ে ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ এক অখণ্ডচৈতন্য-বস্তুতেই তিনি মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ মননের ফলে সংশয় বিপর্যয়াদি সর্ব প্রতিবন্ধ-রহিত হইয়া অখণ্ড এক সচ্চিদানন্দ বস্তু অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারপূর্বক তখন সাধক ধন্য, কৃতকৃত্য হন। তখন তাঁহার আর করিবার বা জানিবার কিছুই বাকি থাকে না। অকর্তাত্মজ্ঞানে তিনি তখন কৃতার্থ। তখন তিনি প্রারব্ধবশে বাহ্যতঃ শরীরমন-সহায়ে সব কিছু করিলেও অন্তরে অহংকার-রাহিত্যবশতঃ কিছুই করেন না। এই অবস্থার কথাই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন :

'তথা চ কুর্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ।'

—অর্থাৎ অদ্বয়াত্মবোধ-সহায়ে যিনি সর্ববস্তু দর্শন করিয়াও তত্ত্বতঃ দর্শন করেন না, তদ্রূপ সব কিছু করিয়াও যিনি তত্ত্বতঃ নিষ্ক্রিয়, তিনিই যথার্থ আত্মতত্ত্ববিৎ, অপরে নহে। ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

গীতাও তত্ত্ববিদের নিশ্চয়-বিষয়ে বলিতেছেন :

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥

—দেখা, শুনা, স্পর্শ করা, গন্ধ লওয়া, ভোজন, গমনাগমনাদি সর্ব কর্ম করিয়াও তত্ত্ববিদ্ দৃঢ়রূপে জানেন যে, 'আমি কিছুই করি না'।

'কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।'—কর্মে অহংকার-রহিত হইয়া ও ফলের কামনা না রাখিয়া তিনি সর্বকর্মে প্রবৃত্ত হইলেও বস্তুতঃ কিছুই করেন না।

এই দৃঢ় অকর্তাত্মবোধ তাঁহার দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেই হইয়া থাকে। তখন তিনি অজ্ঞানাদি সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তি-পদবীতে আরূঢ় হইয়া থাকেন। সর্ব দৃশ্য প্রপঞ্চ তখন তাঁহার নিকট স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা ও অলীক বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। এক ব্রহ্মই সত্য, সেই ব্রহ্মই আমি এবং সর্বদ্বৈতের একান্ত অভাব—এই জ্ঞানে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা যায়, বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের পরস্পর কোন বিরোধ নাই। সর্ব শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে এক অদ্বৈত ব্রহ্মেই সমন্বিত।

জীবন্মুক্তিপ্রসঙ্গ

স্বামী ধীরেশানন্দ

প্রস্তাবনা

সংসারে কেহ দেহ, যৌবন, পদমর্যাদাদি লইয়া, কেহ বা স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি লইয়া, কেহ বা পোষা জীবজন্তু লইয়া মশগুল—আনন্দলাভের আশায়। কিন্তু স্বরূপানন্দের অনুভব না হইলে মানুষ যাহা চায় তাহা পায় না ও অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুর্দশা ভোগ করে।

সংসারে মানুষ কি চায় তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়, মানুষ স্ত্রীপুত্র ধন বিষয়াদি কিছুই চায় না। চায় কেবল একটু সুখ। আর চায় যাহাতে তাহার কোন দুঃখ না হয়। অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের কাম্য। বিষয়-প্রাপ্তিতে সুখানুভব হয় বলিয়া জীব মনে করে সুখ বিষয়গত, তাই বিষয় চায়। বিষয় বিনাশী বলিয়া বিষয়াবলম্বনে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাও বিনাশী। সে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু মানুষ ক্ষণিক সুখে তৃপ্ত হইতে পারে না, তাই সে সুখলাভার্থে পুনরায় বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। আলেয়ার আলো ধরিবার এই ব্যর্থ চেষ্টায় গোটা জীবনটাই অবশেষে একদিন নিঃশেষিত হইয়া যায়।

শারীরিক ব্যাধি আদি দুঃখ, মানসিক সন্তাপাদি দুঃখ, চোর ব্যাঘ্র আদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত দুঃখ—এই সব দুঃখ জীবের নিত্য সহচর। তেমনি শারীরিক ও মানসিক সুখ, অনুকূল অন্য প্রাণী হইতে প্রাপ্ত সুখ ও প্রকৃতির আনুকূল্যলব্ধ সুখও জীব ভোগ করিয়া থাকে। এই সুখগুলিই জীব সর্বদা কামনা করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত দুঃখগুলি সে মোটেই চায় না।

সুখ ও দুঃখের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে উহাদের প্রত্যেকটিই দুই প্রকার। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সহযোগে প্রথমে সুখের অনুভব হইল; তারপর আমি উল্লাসে 'আমি আজ ধন্য, কৃতকৃত্য' এইরূপ মনে করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তেমনি দুঃখের অনুভব হইল, তারপর আমি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। এই ভাবেই সংসার-নাটক চলিতেছে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জীবকে দুঃখানুভব করিতে হইতেছে আর ইচ্ছাসত্ত্বেও নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সে সুখ প্রাপ্ত হইতেছে না। কিন্তু সকলেই চায়, দুঃখ চির-নিবৃত্ত হউক এবং অসীম সুখ নিত্য অক্ষুণ্ণ থাকুক। অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও নিরবশেষ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দ-প্রাপ্তি—ইহাই সকলের কাম্য। এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিরবশেষ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রাপ্তিকেই শাস্ত্রে মোক্ষ বলে। এই মোক্ষ যে চায় সেই মুমুক্ষু। সুতরাং একভাবে বলিতে গেলে জগতে সকলেই মুমুক্ষু; কারণ সকলেই কার্যতঃ এইটিই চায়। কিন্তু মোক্ষলাভের যথার্থ উপায়টি সকলে জানে না।

বেদান্ত বলেন জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ভ্রান্তিবশতঃ জীব নিজেকে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া সংসারে নানা রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, লাভ-অলাভ ও সুখ-দুঃখে অভিভূত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। এই বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় হইতেছে আত্মস্বরূপাববোধ। অজ্ঞানীর দুঃখ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও সে উহার ঠিক সাধনটি জানে না। দুঃখদ ও বিনাশী

বিষয়সুখ হইতে পরাবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ চিত্তে আত্ম-তত্ত্বানুশীলন করার পরিবর্তে সে স্থায়ী সুখের আশায় ঐ বিষয়ভোগ-সম্পাদনের ব্যর্থ চেষ্টাতেই অধিকতর কষ্ট পায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বশতঃ শ্রীগুরু ও ঈশ্বর-কৃপায় দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবদ্দশাতেই সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহারাই জীবন্মুক্ত। এই জীবন্মুক্তি বিষয়েই আমরা এখানে শাস্ত্রদৃষ্টি সহায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ প্রারব্ধভোগাবসানে দেহ-পাতান্তর বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

সম্যক্ বিচার প্রভাবে উৎপন্ন ব্রহ্ম ও জীবাত্মা বিষয়ক অভেদ জ্ঞানই জীবন্মুক্তিরূপ ফল প্রদান করতঃ বিদেহমুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীবশিষ্ঠজী বলিয়াছেন—'জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে স চ কেবলঃ।'

—যিনি জ্ঞানদ্বারা জীবদ্দশাতেই কেবলভাব বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন দেহপাতানন্তর তিনিই বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন।

'বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে'—(কঠ ২।২।১)

'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে'—(ছাঃ ৬।১৪।২)

'জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ'—(শ্বে ১।১১)

'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি'—(কেন ১।২।৫)

—ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীবন্মুক্তি পূর্বক বিদেহমুক্তি প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

আত্মজ্ঞানের কারণ মহাবাক্য

জীবন্মুক্তি পূর্বক বিদেহমুক্তি সম্পাদনসমর্থ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান বেদান্তোক্ত মহাবাক্য হইতেই অধিকারী পুরুষ লাভ করিয়া থাকেন। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক বাক্যের নামই **মহাবাক্য**। যে বাক্য শ্রবণের পর আর কিছু শ্রোতব্য থাকে না এবং যে বাক্য-জন্য জ্ঞানের উদ্ভাসের পর ঐ জ্ঞানের প্রভাবে ঐ বাক্যও আর থাকে না, তাহাই **মহাবাক্য**। এই মহাবাক্যার্থ সাক্ষাৎকারের জন্য উপযুক্ত গুরু ও শিষ্য প্রয়োজন। গুরুর উপদেশে শিষ্য মিথ্যাভূত উপাধির স্বরূপ জানিয়া বিচার সহায়ে উহা ত্যাগ করেন এবং লক্ষ্য চৈতন্যের অভিমুখী হইয়া অন্তে অখণ্ড-চৈতন্য-স্বরূপে অবস্থান করেন। মহাবাক্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্ব বেদান্তের সার। উহার অর্থ গ্রহণে সামর্থ্য সম্পাদন নিমিত্ত পূর্বে শম-দমাদি বহু সাধন অভ্যাস প্রয়োজন। সমর্থ পুরুষই মহাবাক্য শ্রবণ বা তদর্থ বিচার জনিত জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কারণ—

'অধিকারিণি প্রমিতি জনকো বেদঃ।'

—অধিকারী পুরুষের প্রতিই বেদ প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকেন।

এই জ্ঞান অতি দুর্লভ। ভগবান গীতামুখে বলিয়াছেন—

'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।' (৭।৩)

'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।' (২।২৯)

'আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।' (কঠ ১।২।৭)

—ইত্যাদি শ্রুতি- ও স্মৃতি-বাক্যসমূহ অধিকারীর দুর্লভতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরকৃপা, গুরুকৃপা, আত্মকৃপা ও শাস্ত্র-কৃপা হইলে তবেই জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর। অহেতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে মহাবাক্য শ্রবণে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, কেবল নিজে নিজে শাস্ত্র পড়িয়া ও বিচার করিয়া তাহা হয় না। বেদান্ত-বাক্য শ্রবণে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বোধমাত্র অবশেষ থাকে। উহাই আত্মবোধ। উহা ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানবিশেষ নহে; স্বপ্রকাশ অপরোক্ষ আত্মবোধ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়।

মহাবাক্য এইরূপেই আত্মজ্ঞানের জনক। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা জীবদ্দশাতেই সর্ব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি এবং অজ্ঞান ও তৎকার্য জীবজগৎ বাধিত হওয়াকেই জীবন্মুক্তি অবস্থা বলা হয়।

আত্মাশ্রিত অজ্ঞাননাশ ত্রিবিধ। বরাহ শ্রুতি (২।৬৯) বলেন—

'শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থরূপম্,
কার্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষ্যাৎ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশঃ,
এবং ত্রিধা নশ্যতি চাত্মমায়া ॥'

—অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রবিচার দ্বারা এইরূপ বোধ হয় যে জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, উহা কেবল ব্যবহারিক। ইহাকে যৌক্তিক বাধ বলা যাইতে পারে। পুনঃ শ্রবণমননাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জগতের ঐ ব্যবহারক্ষম (কার্যক্ষম) সত্তাও বাধিত হইয়া যায়। তখন বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ জীবজগতের সত্তাবিহীন প্রতীতি মাত্র বা প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র অবশেষ থাকে। এই প্রতীতি বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানের কার্য। ইহাও প্রারব্ধভোগাবসানে নিবৃত্ত হইয়া যায়। অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা আবরণশক্তি-যুক্ত অজ্ঞান নষ্ট হয়। উহাই অপরোক্ষ বাধ। তাই অজ্ঞান-জীব-জগতের প্রথম হয় যৌক্তিক বাধ, দ্বিতীয়তঃ অপরোক্ষ বাধ বা সরূপনাশ, তৃতীয়তঃ প্রারব্ধভোগাবসানে আত্যন্তিক নাশ বা অরূপ নাশ হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞাননিবৃত্তি ত্রিবিধ।

বিদ্যাধিকারী দুই প্রকার

কৃতোপাস্তি ও অকৃতোপাস্তি ভেদে আচার্য-গণ দুই শ্রেণীর বিদ্যাধিকারীর কথা বলিয়া থাকেন। যিনি উপাস্যদেবতার দর্শন পর্যন্ত উপাসনা সমাপ্ত করিয়া পরে তত্ত্ববিচারাদি সহায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি **কৃতোপাস্তি**। আর যাঁহারা কিছু উপাসনা করিয়া বা না করিয়াই জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা **অকৃতোপাস্তি**। কৃতোপাস্তি জ্ঞানীর উপাসনাকালেই মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানের পর আর তাঁহার কিছু কর্তব্য অবশেষ থাকে না। কিন্তু যিনি প্রথমে উপাসনা করেন নাই তাঁহাকে জীবন্মুক্তি অবস্থার দৃঢ় স্থিতির জন্য জ্ঞানের পরও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সাধন করিতে হয়।

(এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ 'জীবন্মুক্তি-বিবেক' ও গীতা ৬।৩২ মধুঃ টীকা দ্রঃ)

জীবন্মুক্তির কারণত্রয়

তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—এই তিনটি দৃঢ় হইলেই **যথার্থ** তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। অকৃতো-পাস্তির যে তত্ত্বজ্ঞান উহা **অদৃঢ়**। উহা দৃঢ় করিবার জন্য মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের আবশ্যকতা আছে। তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপাবরণ নিবৃত্ত করিয়া থাকে, বাসনাক্ষয় চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্ত করে এবং মনোনাশ মলদোষ দূর করিয়া থাকে। এই তিনটি একত্র পরিপূর্ণভাবে প্রকট হইলে তবেই জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হয়। তখন তাঁহার আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তিনি তখন কৃতকৃত্য, জ্ঞাতজ্ঞেয়, প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য ও হতহেয় অবস্থায় সমারূঢ়। দেহেন্দ্রিয় ও ব্যবহারে তাঁহার কোন অভিমান থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এগুলিকে ত্যাগও করিতে পারেন না। প্রারব্ধচালিত হইয়া তিনি সর্ব ব্যবহার করিয়া যান। শরীর, মন, ব্যবহার—সব প্রারব্ধাধীন। তিনি নির্লিপ্ত, স্বরূপানন্দে সদা বর্তমান। প্রারব্ধভোগাবসানে দেহপাত হইলে তিনি বিদেহমুক্ত হন।

প্রারব্ধান্তে ত্রিপুটিরহিত ব্রাহ্মীস্থিতির নামই বিদেহমুক্তি। জীবন্মুক্তি অবস্থায় জ্ঞানদগ্ধ ত্রিপুটি সহায়ে সর্ব ব্যবহার সত্ত্বেও বোধস্বরূপে অবস্থিতি—এই মাত্র ভেদ। সংসার-কারণ অজ্ঞান নাশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

প্রথমাবস্থায় জীবন্মুক্ত যখন বোধস্বরূপে অবস্থান করেন তখন নিজেকে প্রসন্ন ও কৃতার্থ বোধ করেন। বৃত্তি বাহ্যবিষয়ক হইলে তিনি উদ্বিগ্ন হন। অল্প সময়ই এই অবস্থায় তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও ব্যবহারে বিক্ষিপ্ত ও উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন 'জগৎ মিথ্যা' এইরূপ অখণ্ডিত বৃত্তি থাকে না। জগৎদৃষ্টিও নিবৃত্ত হয় না বলিয়া তখন তিনি উহা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন কারণ জগৎবৃত্তি হইলেই দুঃখানুভব হয়।

মধ্যমাবস্থায় তিনি জগৎবৃত্তি নিরোধ করিতে করিতে অধিকতর সময় (ব্যবহারকালেও) সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন। সাক্ষীনিশ্চয় তখন সদা অক্ষুণ্ণ হয়। তিনি ব্যবহারে গ্লানি বোধ করেন এবং কর্তৃত্বাভিমানরহিত হইয়া যাহা করিবার তাহা করিয়া যান মাত্র।

উত্তমাবস্থায় আর তাঁহার কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তখন তাঁহার অখণ্ডিত সাম্যভাব। এই অবস্থায় ব্যুত্থান ও সমাধি তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। তখন সর্ব-সংসার, মূঢ়, অজ্ঞানী, চর, অচর সবই স্বস্বরূপ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য মনোনাশ- ও বাসনাক্ষয়-অভ্যাসের ক্রমবিকাশ সহ পূর্বোক্ত তিন অবস্থা জীবন্মুক্তের জীবনে আসিয়া থাকে। জীবন্মুক্তি অবস্থা সকলের এক প্রকার হয় না।

জীবন্মুক্তিতে শরীর, জীব, জগতাদি প্রতীতি-সহ ব্রহ্মপ্রাপ্তি; আর বিদেহমুক্তিতে শরীরাদি প্রতীতিরহিত ব্রাহ্মী স্থিতি—ইহাই বৈশিষ্ট্য। মুক্তির দিক হইতে উভয়ই সমান। তবে জীবন্মুক্ত না হইলে কেহ বিদেহমুক্ত হইতে পারে না।

ঈশ্বরকোটি ও ব্রহ্মকোটি জীবন্মুক্ত

জীবন্মুক্ত দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন।—ঈশ্বরকোটি ও ব্রহ্মকোটি। প্রারব্ধ-বৈচিত্র্যই এই ভেদের কারণ। তন্মধ্যে ব্রহ্মকোটি জীবন্মুক্ত জগৎসম্বন্ধরহিত, মূক ও আত্মারাম হইয়া থাকেন। ইঁহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সাধিত না হইলেও, পরোক্ষভাবে জগতের সমূহকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। জগতে ইঁহাদের অবস্থানই পরম শুভের জনক, (সন্ন্যাসগীতা—১১।৩২,৩৩)। ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে জগৎকল্যাণে রত থাকেন,—এইরূপ পুরুষধুরন্ধরগণকৃত উপকার দ্বারাই জগৎ ধন্য হইয়া থাকে। যথা—

'ব্রহ্মেশকোটিভেদেন জীবন্মুক্তো দ্বিধা মতঃ।
প্রারব্ধকর্মণাং তত্র জীবন্মুক্ত মহাত্মনাম্॥
বৈচিত্র্যমেব হেতুঃ স্যাৎ প্রভেদে দ্বিবিধে ধ্রুবম্।
ব্রহ্মকোটিং সমাপন্না জীবন্মুক্তা ভবন্ত্যহো॥
আত্মারামাঃ সদামূকাঃ জগৎসম্বন্ধবর্জিতাঃ।
ঈশকোটিং শ্রিতা যে চ জীবন্মুক্তাঃ স্ববেদিনঃ॥
ত ঈশপ্রতিমাঃ সন্তো ভগবৎকার্যরূপতঃ।
সংরক্তা বিশ্বকল্যাণে সন্তিষ্ঠন্তে মহীতলে॥
বিশ্বমেবংবিধৈরেব হ্যেকমাত্রং স্বধাভুজঃ।
ভবন্ত্যপকৃতং ধন্যং জীবন্মুক্তৈর্মহাত্মভিঃ॥'

(শম্ভুগীতা ৬।৮০-৮৪)

ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত পুরুষের ক্রিয়াকারিতা দুই প্রকারে হইয়া থাকে প্রথম আপন প্রারব্ধের ভোগদ্বারা ক্ষয়; দ্বিতীয়, ব্যষ্টিকেন্দ্র নষ্ট হইয়া যাওয়াতে সমষ্টিকেন্দ্র অর্থাৎ বিরাট্-কেন্দ্র বা ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া।

ঈশ্বরকোটি প্রথম হইতেই পরোপকার করিবার অধিকার লাভকরতঃ জগদ্গুরুরূপে অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। বিরাট্‌কেন্দ্রচালিত এই মহাপুরুষগণ বিরাট্‌পুরুষের ইঙ্গিতে অনায়াসেই ভগবৎকার্য সাধনে সমর্থ হন। যথা—

'**জীবন্মুক্তঃ ঈশকোটিঃ** পূর্বস্মাদেব বস্তুতঃ।
পরোপকারতত্ত্বাধিকারিত্বং বৈ সমাশ্রয়ন্॥ ৩৪
জগদ্গুরুত্বমাপন্নোঽধ্যাত্মজ্ঞানং প্রচারয়ন্।
বিশ্বপ্রভূতকল্যাণং জনয়ত্যবিলম্বিতম্॥ ৩৫
সতঃ সমুচিতাৎ কেন্দ্রান্নূনং ভগবদিঙ্গিতৈঃ।
স কর্তুং ভগবৎকার্যং প্রভবত্যনুপদ্রবম্॥ ৩৭
এতাদৃগেব পরমহংসাদর্শো জগদ্গুরুঃ।
জীবন্মুক্তো হি সর্বেষাং কল্যাণং কর্তুমর্হতি॥ ৩৮
জগতাং জীবনায়ৈব জীবন্মুক্তস্য জীবনম্॥ ৭২
জগৎপবিত্রতাসিদ্ধ্যৈ জীবন্মুক্তস্য কর্ম বৈ॥ ৭৩'

(সন্ন্যাসগীতা—১১শ অধ্যায়)

ব্রহ্মকোটি ও ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীরামচন্দ্রেরও এই শংকা হইয়াছিল। তদুত্তরে শ্রীবশিষ্ঠজী বলিয়াছেন যে ত্রিগুণময় সংসারদৃশ্যের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় পূর্বক অন্তঃশীতলতার নামই সমাধি। উহা অনন্ত তপস্যার ফল। অতএব ব্যবহারে নানাকর্মে ব্যাপৃত জ্ঞানী ও সমাধিস্থ-জ্ঞানী, উভয়েই সমান। যথা—

'ইমং গুণসমাহারমনাত্মত্বেন পশ্যতঃ।
অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধিরিতি কথ্যতে॥
দৃশ্যৈর্ন মম সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য শীতলঃ।
কশ্চিৎসংব্যবহারস্থঃ কশ্চিদ্ধ্যানপরায়ণঃ॥
দ্বাবেতৌ রাম সুসমাবন্তশ্চেতসি শীতলৌ।
অন্তঃশীতলতা যা স্যাত্তদনন্ততপঃফলম্॥'

(যোগবাশিষ্ঠ)

অন্তরের শীতলতা যদি ব্যবহারকালেও রহিল, তবে সমাধি অবস্থা হইতে ব্যবহারাবস্থার কোন পার্থক্যই রহিল না। যেমন নেশা হইলে তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখন কেহ অপমান করিলেও সে তাহা বোধ করে না। সে আপন ভাবেই স্থিত থাকে। তাহা জ্ঞানবিচারের নেশাই হউক, মানপ্রতিষ্ঠার নেশাই হউক বা সুরা প্রভৃতি পানের নেশাই হউক, সব সমান।

জ্ঞানের গভীর নিষ্ঠা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করাইবার উদ্দেশ্যেই এখানে এইরূপ অতি-পরিচিত লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া হইল মাত্র। জ্ঞানের সহিত উহাদের তুল্যতা দেখাইবার জন্য নহে।

জীবন্মুক্তের ব্যবহারবৈচিত্র্য

সকল জীবন্মুক্তেরই নিশ্চয় জ্ঞান এক। কিন্তু প্রারব্ধকর্মবৈচিত্র্যবশতঃ তাঁহারা নানারূপে প্রতীত হন এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার এবং চিত্তের প্রশান্তিতেও ভেদ হয়। ব্যবহারিক কর্মে ব্যস্ত থাকিয়া বা না থাকিয়াও জীবন্মুক্তি হইতে পারে। জীবন্মুক্তির হেতু তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—বর্ণাশ্রমধর্মরাহিত্য নহে। বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদক। ঐ চিত্তশুদ্ধিপূর্বকই জ্ঞান হয়। সুতরাং জ্ঞানীর আর ঐ কর্মের কোন প্রয়োজন নাই। জ্ঞানের পর ব্যবহার প্রারব্ধানুসারেই হইয়া থাকে। যদি প্রারব্ধ বর্ণাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের অনুকূল হয় তবে বিদেহকৈবল্য পর্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রমধর্মানুষ্ঠান করেন, আর যদি প্রারব্ধ তৎ প্রতিকূল হয় তবে জ্ঞানীর ব্যবহার বর্ণাশ্রম-ধর্মানুষ্ঠানরহিত হইয়া থাকে।

কোন আচরণই জীবন্মুক্তির বাধক নহে। অবশ্য তিনি স্বভাববশে শুভাচরণই করিয়া থাকেন; অশুভাচরণ করেন না বা করিতে পারেন না। মনের শুদ্ধি, নির্লিপ্ততা, প্রসন্নতা, নিস্পৃহতাদি সাত্ত্বিক গুণসকল জ্ঞানীরই অন্তরে

সূক্ষ্মরূপে থাকে। ব্যবহারকালে ঐ সকল গুণ বাহিরে দেখা যায়; কখনও বা দেখা যায় না বলিয়াও মনে হইতে পারে। জীবন্মুক্ত কর্মকাণ্ডী, অতি তপস্বী, অতি ত্যাগী, বক্তা, মৌনী, ঐশ্বর্যধারী, নিষ্কিঞ্চন—নানাপ্রকার হইয়া থাকেন। কোন বিষয়েই তাঁহার নিজের কোন অভিনিবেশ বা আগ্রহ নাই। প্রারব্ধবশে আচরণ বিচিত্র হইয়া থাকে। সকলের একই প্রকার প্রারব্ধ যেমন হয় না, তেমনি আচরণও একই প্রকার হয় না।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত, গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীর যত লক্ষণই দেখান যাউক না কেন, সে সবই স্বসংবেদ্য বলিয়া অপরের দৃষ্টির বিষয় নহে। স্থূল ব্যবহার দর্শনে ঐগুলি কেবল অনুমিত হইতে পারে মাত্র। সাধক ঐ গুণগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—এই জন্যই উহার উল্লেখ। উহা জ্ঞানীকে পরীক্ষা করিয়া চিনিবার জন্য নহে। অজ্ঞাননিবৃত্তি স্থূল আকারে দেখা যায় না। দেহ, ইন্দ্রিয়, জগৎ, সর্ব দৃশ্যই অজ্ঞান-কার্য, কিন্তু উহা অজ্ঞান নহে। কারণ এগুলি থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানীর অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জ্ঞানীর নিকট দেহ-জগতাদির প্রতীতি জ্ঞানের বাধকরূপে প্রতীত হয় না। জ্ঞান কেবল অজ্ঞানেরই নাশক। 'জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নাশকম্' (পঞ্চপাদিকা)।

জীবন্মুক্তের ব্যবহার বিচার

ব্যবহারকালে জ্ঞানীর বুদ্ধি ব্যবহারের অনুকূল হইয়াই সব করিয়া থাকে কিন্তু আত্মভাব হইতে বিচলিত হয় না। নট যেমন অনেক বেশ ধারণ করতঃ সুখ-দুঃখের ভাব প্রকাশ করে কিন্তু নিজের নটভাব বিস্মৃত হয় না, তদ্রূপ। জ্ঞানী সকলের সঙ্গে মিলিত হইলেও তিনি কাহারও প্রতি আসক্ত হন না। তিনি জড়পদার্থ নন তাই শীত-উষ্ণাদি, প্রারব্ধপ্রাপিত সুখ-দুঃখের সর্ব অনুভবই তাঁহার হয় কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন না। সুখপ্রাপ্তিতে তাঁহার আনন্দানুভব হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু হর্ষ হয় না। হর্ষ একপ্রকার মদ বিশেষ। 'অহো, আমি কি ভাগ্যবান, এরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি!'—এরূপ উল্লাসকেই হর্ষ বলে। তদ্রূপ দুঃখপ্রাপ্তিতে তাঁহার দুঃখানুভবও নিশ্চয়ই হয় কিন্তু শোক অর্থাৎ 'অহো আমি কি হতভাগ্য! এখন কি করি, কোথায় যাই'—এরূপ বিলাপ তিনি কখনই করেন না। কারণ—

'বোধাৎ প্রাক্ দ্বিবিধং দুঃখমেকং বুদ্ধিস্বভাবজম্।
রোগাবমানদারিদ্র্যপুত্রহান্যাদিরূপকম্॥
অপরং ত্বীদৃশে দুঃখে মগ্নোঽহং বহুজন্মসু।
ইত উদ্ধর্তুমাত্মানং ন শক্নোমীতি **মোহজম্**॥
তত্রাদ্যং **কর্মজত্বেন** নশ্যেদ্ ভোগাদৃতে নহি।
দ্বিতীয় **ভ্রমজং** তত্ত্ববোধাদেব নিবর্ততে॥
হর্ষশোকৌ বিভ্রমোত্থৌ কর্মোত্থসুখদুঃখয়োঃ।
বোধহেয়ৌ হর্ষশোকৌ ভোক্তব্যৌ তু সুখেতরে॥
(বৃহঃ বার্ত্তিকসার, ১ম অধ্যায় শ্লোক ৩২—৩৫)

—জ্ঞানের পূর্বে দ্বিবিধ দুঃখে লোকে সন্তপ্ত হইয়া থাকে। একটি হইতেছে রোগ, অপমান, দারিদ্র্য, পুত্রনাশাদিরূপ **কর্মজ** দুঃখ। অপরটি হইতেছে ঐ দুঃখে পতিত হইয়া 'হায়, কত জন্ম এরূপ দুঃখ আমি পাইতেছি, কি করিয়া আমি দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব তাহা বুঝিতেছি না'—এইরূপ শোক বা বিলাপ। ইহা **মোহজ** অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্মজ দুঃখ ভোগ বিনা নাশ হয় না। মোহজ বা ভ্রান্তিজ দুঃখ

তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কর্মজ সুখ-দুঃখ প্রাপ্তিতে জীব যে হর্ষ ও শোক অনুভব করে উহা বিভ্রম- বা অজ্ঞান-জনিত; জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান নাশ হইলে ঐ হর্ষ-শোক আর থাকে না কিন্তু কর্মজ সুখ-দুঃখ জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্বিশেষে সকলকেই ভোগ করিতে হয়।

জীবন্মুক্ত সব কিছু করিয়াও, সব কিছু অনুভব করিয়াও, অন্তরে অকর্তা অসঙ্গ আত্ম-বোধ বলে সর্বাবস্থায় নিবিকার থাকেন।

অজ্ঞানী শত চেষ্টা করিয়াও জ্ঞানী জীবন্মুক্তের নিষ্ঠা বুঝিতে অপারগ। তাই অনেকে জ্ঞানীর বিচিত্র ব্যবহার দর্শনে নানাবিধ আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

'অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে॥'

—অন্তরে আত্মদৃষ্টি সহায়ে নির্বিকল্পনিশ্চয়, কিন্তু বাহিরে যেন অজ্ঞানীতুল্য স্বচ্ছন্দ ব্যবহার—জীবন্মুক্ত পুরুষের এই অপূর্ব স্থিতি তত্তুল্য অন্য জ্ঞানীগণই জানিয়া থাকেন। যেমন স্বপ্ন-সৃষ্টির নির্ণয় স্বপ্নমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া কখনও হইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানীর স্থিতিও অজ্ঞানীর বোধগম্য নহে। অজ্ঞানী থাকেন এই ব্যবহারিক জগতে, আর জ্ঞানী থাকেন এই জগতের সাক্ষী-চৈতন্যে। ব্যবহার উভয়ের একই প্রকার হইয়া থাকে। তবে ভাবে পার্থক্য। বর্ণ বা আশ্রম অনুযায়ী ব্যবহারই জ্ঞানী করিয়া থাকেন কিন্তু নিষ্ঠা তাঁহার পরমার্থে। স্ত্রীবেশে নট ষোল-আনা স্ত্রীজনোচিত ব্যবহারই করিবার চেষ্টা করে, সেই সঙ্গে তাহার এই বোধও থাকে যে সে নট, সে স্ত্রী নহে। জ্ঞানীরও তদ্রূপ।

সাধারণ জীব দৃশ্য-জগৎকে সত্য বলিয়া জানেন, আর জ্ঞানী জানেন যে এ সব স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা—এই পার্থক্য।

ব্যবহারিক শরীর-প্রতীতি সহ ব্রাহ্মীস্থিতির নামই জীবন্মুক্তি; শরীররহিত হইয়া ঐ ব্রাহ্মীস্থিতির নামই বিদেহমুক্তি। মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। তবে শাস্ত্রে যে ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্ম-বিদ্‌বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ ইত্যাদি স্তর কল্পনা করিয়াছেন উহা চিত্তের সমাহিত অবস্থার তারতম্য মাত্র। জ্ঞানের বা মুক্তির তারতম্য কখনই নহে।

চতুর্বিধ জিজ্ঞাসু

বেদান্তে চারি প্রকার জিজ্ঞাসুর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম, যথা বিরাট্ আত্মা। তিনি জানিলেন যে তাহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, অতএব কাহার দ্বারা তিনি ভয় পাইবেন? এইরূপে সর্বপ্রপঞ্চ বিলাপন অর্থাৎ প্রপঞ্চাভাব জ্ঞানপূর্বক তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছিলেন। (বৃহঃ ১।৪।২) জন্মান্তরশ্রুত বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ-বিচারের ফলেই বিরাট্‌পুরুষের এই জন্মে জ্ঞান হইল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, যেমন ভৃগু। তিনি পিতার নিকট ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ জানিয়া নিজে বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। (তৈঃ ৩।১—৬) পিতা বলিলেন—'যাঁহা হইতে সব জাত হয়, যাঁহাতে সব স্থিত এবং যাঁহাতে সব লয় পায়, তাহাই ব্রহ্ম। তুমি তপস্যা অর্থাৎ বিচার দ্বারা এইটি জান। ভৃগু লক্ষণ মিলাইয়া অন্ন, প্রাণ, মন ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলে পিতা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে এখনও হয় নাই, আবার বিচার কর। অবশেষে শ্রুত পিতৃবাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া ভৃগু অনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, শ্বেতকেতু। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত, বিদ্যামদগর্বী শ্বেতকেতুকে পিতা আরুণি তাঁহার বিদ্যাগর্ব দূর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, তুমি কি সেই

বিষ্ণা লাভ করিয়াছ যৎসহায়ে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয়?' কিন্তু শ্বেতকেতু উহা জানিতেন না। তখন তাঁহার গর্ব দূর হইল। অতঃপর পিতা আরুণি নিজেই পুত্রকে পুনঃপুনঃ নয়টি পর্যায়ে নানা যুক্তি সহায়ে অপূর্ব উপদেশ প্রদান করিলেন এবং তাহাতে অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা নিরাকরণ-পূর্বক পুত্র শ্বেতকেতু 'আমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম'—এইরূপ দৃঢ় অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভকরতঃ কৃতকৃত্য হইলেন (ছাঃ ৬।৮—১৬)। এখানে দেখা যায় যে গুরু কর্তৃক পুনঃপুনঃ স্মারিত হইয়া শিষ্য জ্ঞান লাভ করিলেন।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত, পিশাচক। পিশাচক নামক কোন ব্যক্তি কার্যোপলক্ষে বনে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে ঋষিগণ গুরুমুখে বেদান্তোক্ত তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের ব্যাখ্যান শুনিতেছিলেন। দূর হইতে পিশাচকও উহা সকলের অলক্ষ্যে শ্রবণ করিল। পূর্ব জন্মজন্মান্তর-কৃত সুকৃতি-ফলে অতিশুদ্ধান্তঃকরণ মহাভাগ্যবান্ পিশাচকের চিত্তাকাশ ঐ মহাবাক্য শ্রবণ প্রভাবেই দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পিশাচক কৃতকৃত্য হইলেন। তাঁহার অজ্ঞানাদি যাবতীয় বন্ধন নির্মূল হইল। বাক্য শ্রবণ মাত্রই জ্ঞান হওয়া বিরল কোন ভাগ্যবান্ পুরুষেই ঘটিয়া থাকে।

তাই আচার্য সুরেশ্বর বলিয়াছেন—

'কৃৎস্নানাত্মনিবৃত্তৌ চ কশ্চিদাপ্নোতি নির্বৃতিম্।
শ্রুতবাক্যস্মৃতেশ্চান্যঃ স্মার্যতে চ বচোঽপরঃ॥
বাক্যশ্রবণমাত্রাচ্চ পিশাচকবদাপ্নুয়াৎ।
ত্রিষু যাদৃচ্ছিকী সিদ্ধিঃ স্মার্যমাণে তু নিশ্চিতা॥
সর্বোঽয়ং মহিমা জ্ঞেয়ো বাক্যস্যৈব যথোদিতঃ।
বাক্যার্থং ন হ্যতে বাক্যাৎ
কশ্চিজ্জানাতি তত্ত্বতঃ॥'
(নৈঃ সিদ্ধিঃ ২।২-৪)

অর্থাৎ কোন কোন বিমলমতি পুরুষ কৃৎস্ন প্রপঞ্চাভাব নিশ্চয়করতঃ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন—যথা বিরাট্। কেহ বা শ্রুত বেদান্তবাক্য পুনঃপুনঃ স্মরণকরতঃ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষপদবীতে আরূঢ় হইয়া থাকেন—যথা ভৃগু। পুনঃ কোন অধিকারী বার বার মহাবাক্য স্মারিত হইয়া অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন—যথা শ্বেতকেতু।

মহাবাক্য শ্রবণমাত্রই আবার কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যথা—পিশাচক। বিরাট্, ভৃগু ও পিশাচকের যে জ্ঞানলাভ তাহা যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ হঠাৎ, যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে হইয়া গেল। ঐরূপ সকলের হয় না। কাহারও কাহারও হয় কিন্তু সকলের পক্ষে এই ভাবে জ্ঞান হয় না। কিন্তু বাক্য-স্মার্যমাণ হইলে জ্ঞান সকলের অবশ্যই হইয়া থাকে, যেমন শ্বেতকেতুকে পিতা পুনঃপুনঃ বিবিধ যুক্তি সহায়ে বুঝাইয়া সংশয়-বিপর্যয়-রহিত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিলেন। এইটিই সকলের পক্ষে নিশ্চিত মার্গ। গুরুমুখে ও সৎসঙ্গে পুনঃপুনঃ বেদান্ত শ্রবণ ও মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারাই সকলের নিশ্চিতরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অহো! বেদান্তবাক্যের কি অলৌকিক মহিমা! কিন্তু বেদান্তোক্ত মহাবাক্য বিচার বিনা কেহ বাক্যার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও সিদ্ধ হয় যে যাঁহার মহাবাক্য শ্রবণমাত্রই জ্ঞান হইয়া যায় তাঁহার আর মনন-নিদিধ্যাসনের কোন প্রয়োজন নাই। আবার যাঁহার শ্রবণানন্তর মনন বা বিচার দ্বারাই জ্ঞান হইয়া যায় তাঁহার পক্ষে আর নিদিধ্যাসন নিষ্প্রয়োজন। বার্ত্তিককার বলেন যে বিচার-দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই নিদিধ্যাসন।

নিদিধ্যাসন জ্ঞানরূপ ; ধ্যানরূপ নহে। যাহারা বিচার-দ্বারা জ্ঞানসম্পাদনে অসমর্থ তাহাদের জন্য ধ্যান সমাধিরূপ নিদিধ্যাসন বিহিত রহিয়াছে।

বিচার করিতে করিতেও চিত্ত স্বভাবতই একাগ্র ও সমাহিত হইয়া পড়ে। অতি অল্প-ক্ষণের জন্য হইলেও ঐ সমাধিদ্বারাই বিচারলব্ধ জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এইরূপে দেখা যায় কেহ কেহ জ্ঞানদ্বারা সমাধিপ্রাপ্ত হন, (মাঃ কারিকা ৩।৩২-৩৪)। ইঁহারা উত্তম অধিকারী। আবার কোন কোন মন্দাধিকারী পুরুষ মনোনিরোধ অর্থাৎ সমাধি সম্পাদন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান, দুঃখক্ষয় ও অক্ষয় শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। (মাঃ কারিকা ৩।৪০)। বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন পথ। উপায় বিভিন্ন হইলেও সকলেই কিন্তু জ্ঞানদ্বারা একই জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। ইহাই মানবজীবনের চরম কাম্য। এ অবস্থায় জ্ঞানী সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত হন। যাবতীয় সাংসারিক দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে পরম আনন্দে তখন তিনি অবস্থান করেন। নিত্যমুক্ত আত্মার মায়িক জন্মধারণের সার্থকতা এই অবস্থা প্রাপ্তিতে। তাই আচার্য নরহরি তদ্‌রচিত 'বোধসার' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্ত্যৈ স্বীকৃতং জন্মলীলয়া।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া'॥

—(বোধসার। জীবন্মুক্ত্যষ্টাদশী-৩)

—জীবন্মুক্তি-সুখলাভের জন্যই নিত্যমুক্ত আত্মা মায়িক জন্ম স্বীকার করিয়াছেন, সংসার-ভোগের জন্য নহে।

উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম

স্বামী ধীরেশানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন : 'সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল এক ব্রহ্মবস্তু আজ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয়নি। বেদ পুরাণ ইত্যাদি সব মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা কেউ মুখে বলতে পারেনি।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, পৃঃ ৪০) শ্রুতিও বলিয়াছেন : 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈ উপঃ)—মনসহ বাণী ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়।—শ্রুতির এই কথাই ঠাকুর স্বকীয় অনুপম ভাষা ও ভঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাক্যমনের অতীত তত্ত্বকে কল্পনাত্মক মন দ্বারা কখনও গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। উহা একমাত্র অনুভবগম্য। ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়াই যত মত মতান্তরের সৃষ্টি হইয়া সদা দুঃখভারাক্রান্ত এই জগৎ আরও কোলাহলময় হইয়া পড়িয়াছে। শব্দদ্বারা উহা প্রকাশ করিতে গেলেই কিছু না কিছু ঝগড়ার বা মতানৈক্যের উপাদান আসিয়া জুটে। ঢোল ও বোল যেন একই প্রকারের বস্তু। উভয়ের মধ্যেই ফাঁক বিদ্যমান। তাই কোন মহাত্মা বলিয়াছেন :

'বোল সবহী ঢোল বরাবর,
পোল সবহীঁমে পূরা।
অবোল তত্ত্বকো সম্ঝাওত নহীঁ,
জো সম্ঝাওত সো কূরা॥'

—ঢোল ও বোল উভয়ই সমানধর্মী, উভয়ের মধ্যেই ফাঁক বিদ্যমান। বাণীর অতীত তত্ত্বকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা বিবাদাস্পদ কল্পনামাত্র—মিথ্যা।

ঠাকুর পুনঃ বলিয়াছেন : 'জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল "নেতি, নেতি" বিচার করে। বিচার করে জ্ঞানীর বোধ হয় যে, "আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।" জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।…

'যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না —আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ, কিরূপ হয়, সে কথা কে বলবে?' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৩।৪) 'বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়।'

শ্রীযোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র গুরু শ্রীবসিষ্ঠজীকে বলিয়াছিলেন : 'তত্ত্ববস্তু যখন ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে এবং মৌন অবলম্বন করিলেই যখন তত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তখন আপনি আমাকে এত উপদেশ প্রদান করিলেন কেন? প্রথম হইতে মৌনাবলম্বন করিলেই তো হইত?' প্রত্যুত্তরে শ্রীবসিষ্ঠজী বলিলেন : 'তাহা হইলে লোকে আমাকে মূর্খ মনে করিত। মনে করিত যে আমি কিছুই জানি না। তাই নানা কথা বলিয়া এখন মৌন ধারণ করিয়াছি। এখন তুমিও আমার এই মৌন ধারণের রহস্য বুঝিবে।'

আসল তত্ত্বটি মুখে বলা যায় না। তাই আচার্যগণ ঋত, আত্মা, ব্রহ্ম, সত্য ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ, তত্ত্ব বুঝাইবার সহায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন :

'ঋতম্, আত্মা, পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং সংজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ॥'

মহাত্মনঃ অর্থ পরমাত্মার, অন্য অর্থ স্পষ্ট। মুখস্পৃষ্ট কোন পদার্থকেই সাধারণতঃ 'উচ্ছিষ্ট' বলা হয়। ভুক্তাবশিষ্ট অন্নকে উচ্ছিষ্ট বা

চল্তি ভাষায় 'এঁটো' বলে। ঠাকুর তাই বললেন যে, মুখদ্বারা উচ্চারিত হওয়াতে বেদ পুরাণ সব যেন মুখস্পর্শে উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রহ্মকে কেহ মুখোচ্চারিত শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে নাই বলিয়া ব্রহ্মই জগতে একমাত্র অনুচ্ছিষ্ট বস্তু। এই সুন্দর কথাটিই একদিন ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিতে পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন: 'বাঃ, আজ একটা নূতন কথা শিখলাম।' ঠিক এই কথাই 'জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্র, ৫২' মুখেও আমরা অবগত হই:

'উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্ব বিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তচেতনাময়ম্॥'

—সর্বশাস্ত্র ও সর্ববিদ্যা মুখে মুখে উচ্চারিত হইয়া উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্যময় জ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্মই এযাবৎ উচ্ছিষ্ট হন নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মকে কেহই বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে নাই।

দেখা গেল তন্ত্রশাস্ত্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মকে অনুচ্ছিষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি একটু বিচার্য। উচ্ছিষ্ট শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? সাধারণতঃ আমরা উচ্ছিষ্ট বলিতে মুখস্পৃষ্ট কোন ভোজ্য পদার্থকেই বুঝি। আমাদের মানসচক্ষে সোপকরণ অন্নপূর্ণপাত্র ও ঐ পাত্রস্থ ভুক্তাবশেষই যেন ভাসিয়া উঠে, ও তাহাকে আমরা 'এঁটো' বলি। মুখস্পর্শ হইয়াছে বলিয়া উহা অপবিত্র এবং ঐ এঁটো স্পর্শ হইলে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকি। কিন্তু বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যায় উচ্ছিষ্ট অর্থ, যাহা অবশেষ থাকে। তাহা খাদ্যদ্রব্যই হউক অথবা আর যাহাই হউক। উৎ+শিষ্টম্= উচ্ছিষ্টম্। উৎ ঊর্ধ্বম্ অনন্তরম্ শিষ্টম্ অবশিষ্টং যৎ বিদ্যতে তৎ উচ্ছিষ্টম্। কোন কার্যানন্তর যাহা অবশেষ থাকে তাহাই উচ্ছিষ্ট। দেখা যাউক শ্রীশ্রীঠাকুর এ বিষয়ে কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন: 'বিচার করলে "আমি" বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে তাই আত্মা—চৈতন্য!' ঠাকুরের 'শেষে যা থাকে' এই কথাগুলি গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ, গভীর অর্থদ্যোতক, অতএব লক্ষণীয়। ঠাকুর বলিলেন 'শেষে'। কিসের শেষে? তাহাও ঠাকুর বলিয়া আসিয়াছেন 'বিচার করলে', অর্থাৎ বিচারের শেষে। কি বিচার? তাহাও ঠাকুর দেখাইয়াছেন: '"আমি কে" ভালরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় "আমি" বলে কোন জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোন্টা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে "আমি" বলে কিছু পাইনে। "শেষে যা থাকে" তাই আত্মা—চৈতন্য।' এখানে ঠাকুর স্পষ্ট উপনিষদের 'নেতি, নেতি' বিচারের কথা বলিলেন। হাত, পা, রক্ত, মাংস—এর কোন্টা আমি? এটা নয়, এটা নয়, এইরূপে অনাত্মবোধে সর্ব জড়পদার্থ ত্যাগানন্তর অবশেষ থাকেন যে এক আত্মা, তিনিই চৈতন্য বা ব্রহ্ম। সুতরাং 'নেতি, নেতি' বিচারের শেষে অবশিষ্ট থাকেন এক ব্রহ্ম। তিনিই উচ্ছিষ্ট।

সুতরাং ঠাকুরের মতে ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট এবং অনুচ্ছিষ্ট—অর্থভেদে উভয়ই সত্য বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট এ কথা শুনিলে অনেকেই আশ্চর্যবোধ করিবেন। কিন্তু অর্থবোধ হইলে আর আপত্তির কিছু থাকিবে না। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট এই কথা কেবল বাগাড়ম্বর বা বুদ্ধির বিলাসমাত্র নহে। স্বয়ং বেদও এই কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাহাই আমরা এখন দেখিব। অথর্ববেদে ব্রহ্মকে উচ্ছিষ্ট বলা হইয়াছে। সেখানে 'উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মসূক্ত' নামে একটি সূক্তই রহিয়াছে। যথা অথর্ববেদ (১১।৪।১।১):

"ও উচ্ছিষ্টে নামরূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিতঃ।
উচ্ছিষ্ট ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বিশ্বমন্তঃ সমাহিতম্॥ ১

উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বং ভূতং সমাহিতম্।
আপঃ সমুদ্র উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমা বাত আহিতঃ ॥ ২
ইত্যাদি।

বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য প্রথম অর্থ করিয়াছেন যে, হোমানন্তর হুতাবশিষ্ট ওদনই উচ্ছিষ্ট। সেই হুতাবশিষ্ট সর্বকারণভূত ব্রহ্মাভিন্ন অন্নে নামরূপাত্মক শব্দপ্রপঞ্চ ও অর্থপ্রপঞ্চ উভয়ই আশ্রিত হইয়া লব্ধসত্তাক হইয়া থাকে। অথবা—

'যদ্বা "অথাত আদেশ নেতি নেতীতি" "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" ইত্যেবং দৃশ্যপ্রপঞ্চনিষেধাৎ ঊর্ধ্বং তদবধিত্বেন শিষ্যতে ইত্যুচ্ছিষ্টং বাধাবধিত্বেন শিষ্যমানং পরংব্রহ্ম। তস্মিন্ শুক্ত্যাদৌ রজতাদিবৎ নামরূপং চেতি দ্বিধাভূতং সমস্তং জগৎ আহিতম্ আরোপিতম্ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। ইত্থং সামান্যেন জগদাধারত্বম্ অভিধায় বিশেষতো নির্দিশতি—উচ্ছিষ্টে লোক আহিত ইত্যাদিনা।...' —'ঊর্ধ্বম্' অর্থাৎ—'অথাত আদেশ নেতি নেতীতি' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা দৃশ্যপ্রপঞ্চ নিষেধানন্তর সর্ব নিষেধের অবধিরূপে যাহা 'শিষ্যতে'—অবশেষ থাকে তাহাই উচ্ছিষ্ট। উহাই সর্ববাধের অবধিভূত বিদ্যমান পরব্রহ্ম। তাঁহাতেই শুক্তিকাতে রজত কল্পনার ন্যায় নামরূপে দ্বিধাবিভক্ত জগৎ আরোপিত। এইরূপে সামান্যভাবে ব্রহ্মের জগদাধারত্ব কথন করিয়া বিশেষতঃ তাঁহার জগদাধারত্ব নিরূপিত হইতেছে। উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মেই সর্বলোক, ইন্দ্র, অগ্নি, সমগ্রবিশ্ব, দ্যুলোক, পৃথিবী, জল, সমুদ্র, চন্দ্রমা, বায়ু সবই আরোপিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিয়াছেন: 'সব শেষে যা থাকে তাই আত্মা-চৈতন্য।' আচার্য সায়নের ভাষ্যের মধ্যে আমরা আমাদের ঠাকুরের সুপরিচিত সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি না কি?

অতএব বেদান্তোক্ত প্রধান সাধন 'নেতি নেতি' বিচার সহায়ে কল্পিত প্রপঞ্চ মিথ্যাবোধে পরিত্যাগ হইলে এক সত্যবস্তু ব্রহ্মই অবশেষ থাকিয়া যান বলিয়া তিনিই 'উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম'। 'নেতি নেতি' দ্বারা ইহাই ঘোষিত হইয়াছে। দ্বৈত নিষিদ্ধ হবার পর সর্ববাধের অর্থাৎ সর্বনিষেধের অবধিরূপে যে প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম শেষ থাকেন তিনিই উচ্ছিষ্ট। যেমন ভুক্তাবশিষ্ট অন্নকে উচ্ছিষ্ট বলা হয় সেইরূপ বিচারের পর অবশিষ্ট ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট। এই উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মেই বিশ্বসংসার আশ্রিত ও আরোপিত। ইহাই অথর্ব বেদের 'উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম সূক্তে'র ঘোষণা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাক্ততন্ত্র স্পষ্টভাষায় ব্রহ্মকে 'অনুচ্ছিষ্ট' বলিয়াছেন, আর বেদ তাঁহাকে 'উচ্ছিষ্ট' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সমন্বয়াবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক উভয় মতই গ্রহণ করিয়া সকলের সুখবোধ্যরূপে বিষয়টি আরও সুন্দররূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ অপরিণামী অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই-সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতে শুধু প্রতীত হইতেছে। উহার উপরে নাম-রূপ এই-সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র আঁকিয়াছে। রূপ বা আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস

স্বামী ধীরেশানন্দ

'কঠ'-শ্রুতি যথার্থই বলিয়াছেন, 'পরাঞ্চি খানি' (২।১।১)—অর্থাৎ মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই বহির্মুখ। জন্মাবধি মানব ইন্দ্রিয়সহায়ে রূপরসাদি বিষয়ভোগের জন্যই লালায়িত। সুখ মানুষের কাম্য। বিষয়প্রাপ্তি ও তাহার ভোগে মানুষ সুখ অনুভব করে, তাই সকলেই বিষয়কে এত ভালবাসে।

কিন্তু কোন পার্থিব বিষয়ই তো দীর্ঘস্থায়ী নহে। স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-গৃহ, অন্নপানাদি সবই যে কোন্ অদৃশ্য নিয়মের বিধানে কালের করাল কবলে নিমেষে কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়! আবার বিষয় হস্তগত থাকিলেও রোগাদি নানা প্রতিবন্ধবশতঃ ভোগসামর্থ্য বিলুপ্ত হইলে মানুষ ব্যর্থতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কারপূর্বক দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। ইহাই মনুষ্যজীবনের যথার্থ চিত্র।

বিষয়ভোগে তাৎকালিক তৃপ্তি হইলেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ—মানুষ তাহাতে কখনই পায় না। জীবনের শত আশা প্রতিহত ও আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে কোন কোন ভাগ্যবানের চিত্তে তখন এই চিন্তা জাগ্রত হয়: দুঃখবিরহিত যথার্থ সুখ কোথায়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের কী উপায়?

যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিত্য সুখ বলিয়া কিছু না থাকিত, তবে মানুষের প্রাণে উহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে কেন? কই একান্ত 'অসৎ' বন্ধ্যাপুত্রজাতীয় কোন বস্তু লাভের কামনা তো কাহারও হয় না? সুতরাং এমন বস্তু—দুঃখসংস্পর্শবিরহিত শাশ্বত সুখ—নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানব-মনে আকুল আগ্রহ। এই নিত্য সুখ বা অমৃতত্ব লাভের কথাই পূর্বোক্ত শ্রুতি (কঠ ২।১।১) পুনরায় বলিতেছেন:

> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
>
> আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।

—বিষয়বিমুখ চিত্তে কোন কোন অমৃতত্বাভিলাষী পুরুষ প্রত্যগাত্মজ্ঞান লাভকরত সেই নিত্য সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। মুমুক্ষুর 'আবৃত্তচক্ষুঃ'—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়বিমুখতা বা বৈরাগ্যই এই আত্মজ্ঞানবিকাশের সর্বপ্রধান সাধন—ইহাই শ্রুতির নিজ-মুখের ঘোষণা। বিনা মূল্যে জগতে কোন বস্তুই লাভ হয় না। কিন্তু এই আত্মবস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতি বড়ই কঠিন মূল্য নির্ধারণ করিলেন। যে চিত্ত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিষয়ের প্রতি নিরন্তর ধাবমান, তাহাকে বিষয়বিমুখকরত অন্তর্মুখ করিতে হইবে। এ যেন সাগরাভিমুখে প্রধাবিতা নদীকে তাহার উৎসমুখে ফিরাইয়া লইবার সুকঠিন প্রয়াস। সুতরাং মুমুক্ষুর বৈরাগ্য-সাধনার জীবন আরামের জীবন নহে।

অন্তরে আনন্দস্বরূপ আত্মদেবের নিত্য অধিষ্ঠান, তাঁহাকে জানিতে হইবে; তবেই দুঃখের চিরনিবৃত্তি; 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ' (শ্বেঃ ৫।১৩) — আত্মজ্ঞানেই সর্ববন্ধননিবৃত্তি।

'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্' (শ্বেঃ ৬।১২)—অদ্বিতীয় আত্মাকে যাঁহারা স্ববুদ্ধিস্বরূপে সাক্ষাৎ অবগত হন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্যের নহে।

এই প্রকার অসংখ্য শ্রুতিবাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ। আলোক ও অন্ধকারের সহাবস্থানের ন্যায় চিত্তের বাহ্যবিষয়প্রবণতা ও আত্মমুখীনতা একই কালে হওয়া অসম্ভব। বিষয়বিমুখ না হইলে চিত্ত অন্তর্মুখ হইতে পারে না। সুতরাং নিত্য আত্মসুখলাভের পথে বৈরাগ্যই মূলমন্ত্র। ইহাতেই অধ্যাত্মজ্ঞান-সাধনার প্রারম্ভ বা সূত্রপাত এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত সাধকের নিত্য সহচর বা অঙ্গভূষণ।

বৈরাগ্যের স্বরূপ, উহার প্রকারভেদ, তৎসাধনের উপায় এবং উহার স্বাভাবিক পরিণতি সন্ন্যাস—ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহা যথাযোগ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহায়ে আলোচনা করা হইতেছে।

বৈরাগ্য

'রঞ্জ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় প্রয়োগ-দ্বারা 'রাগ' শব্দ নিষ্পন্ন। অর্থ—ঈপ্সিত বস্তুতে রতি বা প্রীতি। বি + রাগ = বিরাগ, অর্থ—বিষয়ে প্রীতিরাহিত্য।

বিরাগ + ষ্ণ্য = বৈরাগ্য, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শনাভ্যাসবশতঃ বিতৃষ্ণা।

বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণাই মোক্ষমার্গের প্রথম সোপান। বৈরাগ্য দুই প্রকার—অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য।

অপর বৈরাগ্য

অপর বৈরাগ্য নামভেদে চারি প্রকার হইয়া থাকে, যথা: (১) যতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় ও (৪) বশীকার।

(১) সংসারে সার বস্তু কি ও অসার বস্তুই বা কি, ইহা গুরু ও শাস্ত্র সহায়ে জানিব—এই প্রকার উদ্যোগের নাম 'যতমান বৈরাগ্য'।

(২) চিত্তগত রাগদ্বেষাদির মধ্যে বিবেক সহায়ে এতগুলি দোষ আমার নিবৃত্ত হইয়াছে এবং এতগুলি এখনও বিদ্যমান, চিকিৎসকের ন্যায় এই প্রকার বিচার-করত বিদ্যমান দোষ-সমূহের নিবৃত্তির জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাকে 'ব্যতিরেক বৈরাগ্য' বলে।

(৩) ঔৎসুক্যবশতঃ মনে বিষয়তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দুঃখাত্মকবোধে সর্ব-ভোগ্যবিষয় হইতে বহিরিন্দ্রিয়প্রবৃত্তি নিরোধের যে প্রযত্ন, উহা 'একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য' নামে প্রসিদ্ধ।

(ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য পদার্থে তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিবেক-তারতম্য-বশতই পূর্বোক্ত 'যতমানা'দি ত্রিবিধ ভেদ)।

(৪) ইহ ও পরলোকের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি সর্বথা যে বিতৃষ্ণা, জ্ঞানপ্রসাদরূপ সেই চিত্তবৃত্তির নাম 'বশীকার বৈরাগ্য'।

এই 'বশীকার বৈরাগ্য' সম্বন্ধেই ভগবান্ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যম্' (যোগ সূত্র ১।১৫)। এই বৈরাগ্য সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। (গীতা, মধু: টীকা ৬।৩৫ দ্রঃ)

পূর্বোক্ত চারি প্রকার 'অপর বৈরাগ্যে'র শেষোক্ত 'বশীকার' নামক বৈরাগ্যও মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যথা:

(১) স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি প্রিয় পদার্থের নাশে সংসারে তাৎকালিক ধিক্কার বুদ্ধিপূর্বক ঐ বিষয়-সমূহের যে ত্যাগেচ্ছা—তাহা 'মন্দ বৈরাগ্য'।

(২) বর্তমান জন্মে স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি আমার অভিলষিত নহে, এই প্রকার স্থির বুদ্ধিপূর্বক বিষয়ত্যাগের ইচ্ছাকে 'তীব্র বৈরাগ্য' বলে।

(৩) পুনরাবৃত্তিযুক্ত ব্রহ্মলোকপর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ভোগ-ত্যাগেচ্ছা 'তীব্রতর বৈরাগ্য' নামে অভিহিত।

সন্ন্যাস

'মন্দ বৈরাগ্য'-বান্ পুরুষের কোন প্রকার সন্ন্যাসেই অধিকার নাই। শ্রুতি বলিতেছেন :

যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বান্ অন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
(মৈত্রেঃ উপঃ ২।১৯)

—অর্থাৎ সর্ববিষয়ের প্রতি যথার্থ বৈরাগ্য চিত্তে জাগ্রত হইলে তখনই বিবেকী পুরুষ সর্বকর্মসন্ন্যাস করিবেন, বৈরাগ্য বিনা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি ভ্রষ্ট বা পতিত হইবেন।

বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সন্ন্যাস চারি প্রকার হইয়া থাকে। যথা : (১) কুটীচক, (২) বহূদক, (৩) হংস ও (৪) পরমহংস।

মন্দ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির কোন প্রকার সন্ন্যাসেই অধিকার নাই, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য 'কুটীচক' ও 'বহূদক'—এই দুই প্রকার সন্ন্যাস বিহিত। যে তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের শরীর তীর্থ-যাত্রাদি করিতে অসমর্থ, তাঁহার 'কুটীচক' সন্ন্যাসে অধিকার ; যাঁহার সেরূপ সামর্থ্য আছে, তিনি 'বহূদক' সন্ন্যাসের অধিকারী।

'কুটীচক' সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী ও স্বপুত্রগৃহে ভিক্ষাগ্রহণকারী।

'বহূদক' সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ড-, শিক্য- (সিকে), জলপবিত্র- (জল ছাঁকিবার বস্ত্র), কৌপীন- ও কাষায়বেশ-ধারী। ইঁহারা তীর্থাটন, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন ও আত্মোপাসনায় রত থাকেন।

তীব্রতর বৈরাগ্যযুক্ত হইলে পুরুষ 'হংস' সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকেন। 'হংস' সন্ন্যাসী একদণ্ডী, শিখারহিত, যজ্ঞোপবীত-ধারী, শিক্য- ও কমণ্ডলু-হস্ত, গ্রামে একরাত্রি-নিবাসী এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-অনুষ্ঠানতৎপর।

পূর্বোক্ত ত্রিবিধসন্ন্যাস-প্রাপক তীব্র ও তীব্রতর বৈরাগ্যই 'বোধসার'-গ্রন্থে আচার্য নরহরি কর্তৃক 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে কথিত হইয়াছে। যথা :

আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ।
যে জীবা মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা॥

—যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ ও পরাধীনতা প্রভৃতি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া মোক্ষলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বৈরাগ্য 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হয়।

তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি।
বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমেব তৎ॥

—তীব্র সংসারবৈরাগ্যহেতু পুণ্যবান্ পুরুষের চিত্তে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদিত হয়, 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য'ই উহার কারণ।

এই বৈরাগ্যে বিষয়ত্যাগেচ্ছাই প্রধান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে মাত্র।

পরবৈরাগ্য

এখন পূর্বকথিত 'পরবৈরাগ্য' বর্ণিত হইতেছে। এই 'পরবৈরাগ্য' পূর্বোক্ত সর্ব-প্রকার বৈরাগ্য হইতে উৎকৃষ্ট।

ভগবান্ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্' (যোগ সূত্র ১।১৬)। —অর্থাৎ প্রত্যগাত্মজ্ঞানলাভে তিন গুণের পরিণামস্বরূপ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্যের নাম 'পরবৈরাগ্য'। এই পরবৈরাগ্যই নির্বিকল্প সমাধিনামা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। ইহাও যোগসূত্রে কথিত হইয়াছে, যথা 'তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ' (১।২১)—অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্

পুরুষ শীঘ্রই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই 'পরবৈরাগ্য'ই 'বোধসার'-গ্রন্থে 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা :

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্তং সচ্ছাস্ত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ।
যদি ন ব্রহ্মবিশ্রান্তিস্তদস্যাভিঃ কিমর্জিতম্ ॥
ইত্যেবং ব্যবসায়েন হ্যাকাশফলপাতবৎ।
জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীরা জিজ্ঞাসামুখ্যতা তু সা ॥

—দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, বেদান্তবাক্য শ্রবণদ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিতও করিয়াছি, এখন যদি ব্রহ্মবিশ্রান্তি লাভ করিতে না পারি, তবে আমরা কি লাভ করিলাম? এই প্রকার নিশ্চয়করত বিবেকাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আকাশ হইতে ফলপতনের ন্যায় অকস্মাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের এই বৈরাগ্যকে 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য' বলে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া তাত তীব্রয়া যো বিধীয়তে।
বিরাগো দৃশ্যভাবেষু জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ ॥

—তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাবশতঃ যাবতীয় দৃশ্য-পদার্থে যে বৈরাগ্য হয়, তাহার নাম 'জিজ্ঞাসা-মুখ্যবৈরাগ্য'। এই স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই মুখ্য, বিষয়ত্যাগেচ্ছা তাহার অনুগামী। এই 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য'যুক্ত অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষই 'পরমহংস' সন্ন্যাসের অধিকারী।

'পরমহংস'-সন্ন্যাস

'পরমহংস'-সন্ন্যাসী একদণ্ডধারী, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখাযজ্ঞোপবীত-রহিত, সর্বকর্মপরি-ত্যাগী ও একমাত্র আত্মচিন্তনপরায়ণ।

পরমহংস-সন্ন্যাস—'বিবিদিষা' ও 'বিদ্বৎ' ভেদে দুই প্রকার। প্রত্যগাত্মাভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ বিবেকাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষ যে সর্বকর্ম সন্ন্যাস করিয়া থাকেন, তাহা 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'। শ্রুতি বলিয়াছেন (বৃঃ ৪।৪।২২) :

'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি'

—বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রাপ্য আত্মলোকের অভিলাষী হইয়া অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন।

'ন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (মহাঃ নারাঃ ৮।১৪, কৈবল্যঃ ১।৩)—অর্থাৎ কর্মদ্বারা, তথা পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা অথবা গো-সুবর্ণাদি ধনসহায়ে মোক্ষের চরম সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। চিত্তবিক্ষেপের হেতু হওয়ায় ও 'ত্বম্'-পদার্থ-শোধনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ এবং উচ্চাবচ জন্ম-প্রাপ্তির হেতুভূত যে কর্ম, তাহা ত্যাগকরতই অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বনকরতই জ্ঞানমার্গের অধিকারী বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পথে আরোহণ করেন।

'বিবিদিষা সন্ন্যাস'-আশ্রম বিষয়ক আরও শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা : 'এতদ্ বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি' (বৃঃ ৩।৫।১)। এই শ্রুতি আপাত-বেদনবিশিষ্ট পুরুষের বিবিদিষা-সন্ন্যাস বিধান করিতেছেন। পুনঃ

'দণ্ডম্ আচ্ছাদনং কৌপীনং পরিগৃহেৎ শেষং বিসৃজেৎ' (আরুঃ ১)—অর্থাৎ সন্ন্যাসী দণ্ড, শীতনিবারক কন্থা, পরিধানের কৌপীন ও কমণ্ডলু আদিমাত্র গ্রহণ করিবেন এবং তদ্‌ভিন্ন অন্য সর্ব দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। পুনঃ শ্রুতি :

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ ॥

(নারঃ পঃ ৩।১৫)

—ব্রহ্মলোকপর্যন্ত সর্ব সংসার অসার জানিয়া সারতত্ত্ব পরমাত্মবস্তুদর্শনমানসে পর-

বৈরাগ্যবান্ পুরুষ বিবাহ না করিয়া 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ ভাষ্যকার 'কেন'-উপনিষদের ভাষ্য-প্রারম্ভে বলিয়াছেন, 'প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞান-পূর্বক: সর্বৈষণাসন্ন্যাস এব কর্তব্য:'—ঐ স্থলের টীকাতে টীকাকার শ্রীমদ্ আনন্দগিরি বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানস্যাত্মানুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে পরোক্ষনিশ্চয়পূর্বক: সন্ন্যাস: কর্তব্য:। সিদ্ধে চানুভবাবসানে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে স্বভাবপ্রাপ্ত: সন্ন্যাস ইতি দ্রষ্টব্যম্।'

—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মবিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সর্বৈষণা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিধেয়। অপরোক্ষ অনুভব-সিদ্ধির জন্য ঐ পরোক্ষ জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস কর্তব্য। ইহাই 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'। অন্ত্যাশ্রমীর অপরোক্ষ অনুভবের পর সন্ন্যাস স্বভাবপ্রাপ্ত। তাহার নাম 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'।

ভগবান্ ভাষ্যকার 'মুণ্ডক'-উপনিষদের ভাষ্যপ্রারম্ভে বলিতেছেন, "জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্বাশ্রমিণামধিকারস্তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্ম-বিদ্যা মোক্ষসাধনং ন কর্মসহিতেতি 'ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্ত:' (মু: উপ: ১।২।১১), 'সন্ন্যাসযোগাৎ (মু: উপ: ৩।২।৬) ইতি ব্রুবন্ দর্শয়তি [শ্রুতি:]।"—

—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যায় সর্বাশ্রমিদিগের অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের সাধন, কর্মসহিত ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের সাধন নহে, 'ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্ত:' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য ইহাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণা:… …ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি' (বৃ: ৩।৫।১)—এই শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য শংকর বলিতেছেন, 'আত্মানং স্বং তত্ত্বং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা অয়মহমস্মীতি পরং ব্রহ্ম ··ব্যুত্থায় ·· দারসংগ্রহমকৃত্বা ···ব্যুত্থায় কর্মভ্য: কর্মসাধনেভ্যশ্চ যজ্ঞোপবীতাদিভ্য: পরমহংসপারিব্রাজ্যং প্রতিপদ্য ভিক্ষাচর্যং চরন্তি।'

—অর্থাৎ আত্মবিষয়ক পরোক্ষ বা অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের অনন্তর মুমুক্ষু যাবতীয় কর্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগপূর্বক পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণকরত ভিক্ষাচর্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন। —এই শ্রুতিটি সন্ন্যাস-বিধায়ক। পরোক্ষ জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস বিহিত। দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর যে সন্ন্যাস স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'। তাহাতে বিধি হইতে পারে না, কারণ উহা বিদ্বানের অর্থাৎ জ্ঞানীর স্বভাবপ্রাপ্ত।

বিদ্বৎ-সন্ন্যাস

বিবিদিষা-সন্ন্যাস নিরূপণানন্তর এক্ষণে 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস' বিষয়ে বলা হইতেছে। পূর্ব-জন্মানুষ্ঠিত সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থাশ্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ চিত্তবিক্ষেপের নিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তিসুখ লাভার্থ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন (অথবা যে সন্ন্যাস তাঁহার স্বতই উপস্থিত হইয়া থাকে), তাহার নাম 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'। ইহাও প্রমাণসিদ্ধ। জীবন্মুক্তি-সুখলাভই এই সন্ন্যাসের ফল। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীর কোন চিহ্ন নাই। তিনি অব্যক্তচিহ্ন, অব্যক্ত-আচার। এই কারণেই শ্রুতি-আদিতে কোথাও তাঁহার দণ্ডবস্ত্রাদি ধারণাভাব, কোথাও বা দণ্ডবস্ত্রাদি ধারণের কথা বর্ণিত আছে।

বিহিত কর্মের বিধিপূর্বক ত্যাগদ্বারা 'বিবিদিষা-সন্ন্যাস'ই আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, ইহা পূর্বে শ্রুতিসহায়ে বলা হইয়াছে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে সন্ন্যাসবিহীন কাহারও এই জন্মে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বুঝিতে

হইবে যে, জন্মান্তরীয় 'বিবিদিষা-সন্ন্যাস'ই তাঁহার বর্তমান জন্মে আত্মজ্ঞানের হেতু। শ্রীসর্বজ্ঞাত্মমুনি স্বরচিত 'সংক্ষেপ-শারীরক' গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। যথা :

জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ
সংন্যাসপূর্বকমিদং শ্রবণাদিরূপম্।
বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্র
তত্রাশ্রমাদিষু বসন্ন নিবারয়ামঃ॥ (৩।৩৬১)

—অর্থাৎ যদি অধিকারী পুরুষের জন্মান্তরে সন্ন্যাসপূর্বক শ্রবণাদি সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তিনি যে-কোন আশ্রমেই বিদ্যমান থাকুন না কেন, সেই জন্মান্তরীয় সাধনের বলেই তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে, ইহা আমরা নিষেধ করি না, অর্থাৎ আমরা ইহা স্বীকার করিয়া থাকি।

এই প্রকারে 'পর' ও 'অপর'-ভেদে দুই প্রকার বৈরাগ্যের বিষয় এবং সেই প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সন্ন্যাসের বিবিধ ভেদ আলোচিত হইল। 'পরবৈরাগ্য'-সহকৃত বিবিদিষা-সন্ন্যাসই আত্মজ্ঞান উৎপাদনপূর্বক মুমুক্ষুর ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষের একমাত্র হেতু—ইহা সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। (ক্রমশঃ)

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস

স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিষয়বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যই মুমুক্ষুর পরম সাধন। ইহা ব্যতীত অন্য যাবতীয় সাধন নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। গোস্বামী শ্রীতুলসীদাসজী বলিয়াছেন, 'বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্ম বিচারু'—অর্থাৎ বৈরাগ্য বিনা ব্রহ্মবিষয়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিচারাদি সকলই বৃথা। বৈরাগ্যই সাধুর প্রধান ভূষণ। ইহার অভাবেই দূষিতচিত্ত হইয়া সন্ন্যাসিগণও অতি হীন দশা প্রাপ্ত হন। আচার্য শ্রীসুরেশ্বরও অতিশয় খেদের সহিত বলিয়াছেন :

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ॥

বৃহদারণ্যক-বার্তিক—১।৪।১৫৮৪

—দেখা যায়, চিত্তগত বিষয়-ভোগবাসনা-রূপ কলুষতাবশতই বহু সন্ন্যাসী তত্ত্ববিচার-রহিত, বহির্মুখ, খল, পরছিদ্রান্বেষী ও কলহপরায়ণ। দেবতাদির সম্যক্ আরাধনা না করাতেই তাহাদের চিত্ত ঐরূপ দূষিত।

বিষয়ে দোষদৃষ্টি ও বিচারসহায়ে বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষ-সাধনই আশু জ্ঞানলাভের মুখ্য উপায়।

বীভৎসং বিষয়ং দৃষ্ট্বা কো নাম ন বিরজ্যতে।
সত্তামুত্তমবৈরাগ্যং বিবেকাদেব জায়তে॥

যোগবাশিষ্ঠ—২।১১।২৩

—বীভৎস বিষয়দর্শনে সকলেরই মনে সাময়িক বৈরাগ্যোদয় হয়, কিন্তু বিচারসহায়েই পুরুষের অতি উত্তম বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্মশানমাপদং দৈন্যং দৃষ্ট্বা কো ন বিরজ্যতে।
তদ্বৈরাগ্যং পরং শ্রেয়ঃ স্বতো যদভিজায়তে॥

ঐ—২৮

—শ্মশান, আপদ ও দৈন্য দর্শনে কাহার চিত্তে (সাময়িক) বৈরাগ্যের উদয় না হয়? কিন্তু সেই বৈরাগ্যই উৎকৃষ্ট ও পরমশ্রেয়োহেতু, যাহা (সর্ব ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান সত্ত্বেও) পুরুষের চিত্তে স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হয়।

অধ্যাত্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে চরম সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত একমাত্র বৈরাগ্যই মুমুক্ষু সাধকের পরম হিতকারী বান্ধব।

বৈরাগ্যসাধনের মুখ্য উপায় : সর্বদা (১) মৃত্যুচিন্তন, (২) বিষয়ে দোষদর্শন, (৩) সাধুসঙ্গ ও (৪) ভগবদনুরক্তি।

মৃত্যুচিন্তন

আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল বস্তুই সংসারে মৃত্যু-কবলিত। স্বকীয় অতিপ্রিয় দেহও প্রতি মুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই চিন্তা চিত্তে সদা জাগ্রত রাখিতে পারিলে নশ্বর বিষয়ভোগের আকর্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে।

মস্তকস্থায়িনং মৃত্যুং যদি পশ্যেদয়ং জনঃ।
আহারোঽপি ন রোচেত কিমুতান্যা বিভূতয়ঃ॥

—শিরোপরি আসন্ন মৃত্যু বিদ্যমান, ইহা জানিলে আহারেও রুচি হইতে পারে না, অন্য ভোগৈশ্বর্যাদির তো কথাই নাই। বিষয়াসক্তির মূল স্বদেহে প্রীতি ও তাহাতে

সত্যত্ববুদ্ধি। অতএব নিয়ত দেহের বিনাশিত্ব-চিন্তন ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। তখনই মানুষ বুঝিতে পারে যে, এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সবই বিনাশী। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়লাভের জন্ত মানুষ সদা ব্যাকুল। বিষয় নিত্য ও পরম রমণীয়, এই বুদ্ধিতেই চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট হয়। বিষয়ের স্বরূপ বিচার করিলে উহার নশ্বরতা চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হয় ও বিষয়াসক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে।

বিষয়ে দোষদর্শন

যৎ প্রাতঃ সংস্কৃতং চান্নং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি
তদীয়রসসংপুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা॥

—প্রাতে প্রস্তুত অন্ন সায়ংকালেই বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অন্নরসে পুষ্ট শরীরের নিত্যতা কখনই হইতে পারে না।

স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বৈরাগ্যকারণং তস্য কিমন্যদ্ উপদিশ্যতে॥

মুক্তিকোপনিষৎ—২।৬৬

—অশুচি গন্ধপরিপূর্ণ স্বদেহে যে ব্যক্তির বিতৃষ্ণা হয় না, তাহাকে বৈরাগ্যজনক আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে?

মাংসাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ॥

নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদ্—৩।৪৮

—মাংস, রুধির, পুঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি-আদি মলিন পদার্থের সমষ্টিরূপ এই দেহে যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, সে মূর্খ নরকেও প্রীতিমান্ হইয়া থাকে।

যদি নামাস্য কায়স্য যদন্তস্তদ্ বহির্ভবেৎ।
দণ্ডমাদায় লোকোঽয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ॥

—এই দেহের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ঘৃণ্য বস্তু বিদ্যমান তাহা যদি বহির্দেশে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করা যায়, তবে কুকুর ও কাক প্রভৃতি হইতে ঐ সকল রক্ষা করিবার জন্য পুরুষকে দণ্ডহস্তে সদা সচেষ্ট হইতে হইবে।

সর্বদা পূর্বোক্তরূপে বিচার দেহাদি যাবতীয় বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদক। অতএব মুমুক্ষুর পূর্বোক্ত বিচার সদা কর্তব্য।

সাধুসঙ্গ

সৎসঙ্গ বিষয়ে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর সাধনপঞ্চকে বলিয়াছেন, 'সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্।'—মুমুক্ষু সদা সৎসঙ্গ করিবে ও শ্রীভগবানে দৃঢ় ভক্তি সহকারে চিত্ত নিবিষ্ট করিবে, কারণ—

মহানুভাবসম্পর্কঃ কস্য নোন্নতিকারণম্।
অশুচ্যপি পয়ঃ প্রাপ্য গঙ্গাং যাতি পবিত্রতাম্॥

—মহাপুরুষগণের সঙ্গ কাহার না উন্নতি বিধান করিয়া থাকে? অশুচি জলধারাও গঙ্গায় পতিত হইয়া শুদ্ধরূপতা প্রাপ্ত হয়।

সৎসঙ্গ ও ভগবন্নিষ্ঠা বৈরাগ্যের একান্ত সহায়ক। সৎসঙ্গে চিত্তে সারাসারবস্তুবিবেক সদা জাগ্রত হয়। সজ্জন-সমাগম অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়, তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে বিষয়বাসনা ক্ষীণ হয়। গোস্বামী তুলসীদাসজী বলিয়াছেন:

বিনু সতসঙ্গা বিবেক ন হোই।
রামকিরপা বিনু সুলভ ন সোই॥

—সৎসঙ্গ বিনা চিত্তে বিবেক অর্থাৎ সদসদ্-বিচার জাগ্রত হয় না। ঐ সৎসঙ্গও ভগবৎ-কৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে। বিবেক হইতে বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তখন শুদ্ধচিত্তে পরম তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

'বৈরাগ্যের' অর্থ—বিষয়ে বিরক্তি ও শ্রীভগবানে অনুরক্তি। ঈশ্বরানুরাগ না হইলে

কেবল বিষয়ে বিতৃষ্ণা অত্যন্ত শুষ্কতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। 'বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ' (সাংখ্যকারিকা—৪৫) কেবল বৈরাগ্য-অভ্যাসে 'প্রকৃতিলয়' অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহা একটি বদ্ধাবস্থা; দীর্ঘ সুষুপ্তিতুল্য অজ্ঞানাবস্থা।

সৎসঙ্গই বিষয়ে বিরাগ ও ঈশ্বরে প্রীতির প্রেরণা সম্পাদন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত-কুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, 'মানুষ যতদিন না সশ্রদ্ধচিত্তে বিষয়ত্যাগী মহানুভবগণের পদ-ধূলিতে পবিত্র হয়, ততদিন অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলেও তাহার বুদ্ধি শ্রীভগবানের চরণকমল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন:

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥
(ভাঃ—১০।৪৮।৩১)

—জলময় স্থানবিশেষই একমাত্র তীর্থ নহে, অথবা মৃত্তিকা ও পাষাণনির্মিত মূর্তিবিশেষই একমাত্র দেবতা নহে; দীর্ঘকাল সেবিত হইয়া তাঁহারা পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সাধু-গণের দর্শন কিন্তু তৎকালেই শুদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। অতএব তত্ত্বদর্শী সাধুগণই যথার্থ তীর্থ ও দেবতা। শাস্ত্রে সাধুদিগকে জঙ্গম তীর্থ ও শ্রীভগবানের চলবিগ্রহ বলা হইয়াছে।

তত্ত্ববেত্তা সাধুগণ সর্বদা উপদেশ না করিলেও তাঁহাদের সঙ্গ করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ

সন্তঃ সদৈব গন্তব্যাঃ যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশাঃ ভবন্তি তাঃ॥

—সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ না হইলেও সাধুসঙ্গ সদা কর্তব্য। তাঁহাদের স্বাভাবিক কথা-প্রসঙ্গও মুমুক্ষুর পক্ষে উপদেশরূপই হইয়া থাকে। সমচিত্ত, প্রশান্তাত্মা, রাগদ্বেষাদি-রহিত, সদাচারী সাধুগণের সাধারণ বার্তালাপও এমন অনন্তসুন্দর অনাসক্ত ও মাধুর্যমণ্ডিত যে, তৎশ্রবণে যথার্থ মুমুক্ষুর চিত্ত তাঁহাদের অলৌকিক তত্ত্বানুভূতি সমুজ্জ্বল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। ঐ দিব্য জীবনের প্রভাবে সাধকের চিত্তও তখন বিষয়-বিমুখ হইয়া ভগবন্মুখী হয়।

সর্বদা সৎপুরুষ-সঙ্গ না পাইলেও অসৎ-সঙ্গ কখনই করা উচিত নহে, কারণ

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ॥

নিঃসঙ্গতাই সন্ন্যাসিগণের মুক্তি-প্রাপ্তির দ্বার। বিষয়াসক্ত বহির্মুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগের নামই যথার্থ নিঃসঙ্গতা। বিষয়াসক্ত পুরুষের সাহচর্যে কামাদি অশেষ দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সঙ্গ বিবেকী পুরুষকেও অধঃপাতিত করিয়া থাকে, সামান্য সাধকের তো কথাই নাই।

সন্ন্যাসীর সাধনা

এইরূপে সদা মৃত্যুচিন্তন, বিষয়ে দোষদর্শন ও সাধুসঙ্গাদিদ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই পুরুষের চিত্তে সর্ববস্তু পরিত্যাগপূর্বক সদ্গুরুর আশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা সমুদিত হয়। সন্ন্যাসী সদা অবহিতচিত্ত না হইলে অর্থাৎ চিত্ত আদর্শনিষ্ঠ করিয়া না রাখিলে কোন্ মুহূর্তে দুর্বলতা—বিষয়-বাসনা তাহাকে কবলিত করিয়া ফেলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসীদিগকে বেদান্ত শ্রবণ-মননাদি সহায়ে ব্যাপৃত থাকিতে আদেশ করেন। 'সংন্যস্য শ্রবণং কুর্যাৎ'—সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর মুমুক্ষু গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ করিবেন। অখিল বেদান্ত-বাক্যসমূহ 'জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'-প্রতিপাদক, এইরূপ নিশ্চিত অবধারণের নামই 'শ্রবণ'।

ত্বং-পদার্থবিবেকায় সংন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্।
শ্রুত্যাভিধীয়তে যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥
(উপদেশসাহস্রী, ১৮।২২২)

—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যগত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থ অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপবিষয়ক বিচার করিবার জন্যই সর্ব সকাম কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস শ্রুতি বিধান করিয়াছেন। অতএব যে সন্ন্যাসী ঐরূপ করেন না, তিনি পতিত অর্থাৎ আদর্শভ্রষ্ট হইবেন।

আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া।
দদ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি॥

—প্রতিদিন নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুপর্যন্ত সন্ন্যাসী বেদান্তচিন্তার কালাতিপাত করিবেন, যাহাতে কামাদি দোষ কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তে জাগ্রত হইবার অবকাশ না পায়।

আচার্য শ্রীসুরেশ্বরও তদ্‌রচিত 'সম্বন্ধ-বার্তিকে' বলিয়াছেন যে, সর্বসকামকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীরই বেদান্তবিচারে অধিকার। যথা—

ত্যক্তাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ।
জিজ্ঞাসোরেব চৈকাত্ম্যং ত্রয্যন্তেষ্বধিকারিতা॥

—সর্বকর্মপরিত্যাগী, সংসারবন্ধনমূলোচ্ছেদকামী এক আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরই বেদান্ত-শ্রবণাদিতে মুখ্য অধিকার। অতএব বেদান্তোক্ত তত্ত্ব-চিন্তনই সন্ন্যাসের অনুকূল।

দর্শন, শ্রবণ, গমন, ভোজনাদিতেও সন্ন্যাসী কি প্রকার আচরণ করিবেন, তাহাও শাস্ত্র অতি সুন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্তই তাহার বৈরাগ্যের সংরক্ষক ও মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক। নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদে আছে (৩।৬২—৬৮):

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড্‌ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥

—অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ—এই ছয় প্রকার মানুষের বাহ্য আচরণ অভ্যাস করিয়া সন্ন্যাসী ক্রমে জীবন্মুক্তি-অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই ছয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে:

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতি।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥

—অন্নাদিভোজনকালে যিনি ইহা সুস্বাদু, ইহা স্বাদবিহীন, এইরূপ মনে করিয়া আসক্ত হন না; যিনি সদা হিতকারী, সত্য ও পরিমিতভাষী, তিনি 'অজিহ্ব' বলিয়া কথিত হন।

অদ্য-জাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ॥

—সদ্যোজাতা বালিকা বা শতবর্ষা স্ত্রী দর্শনে যেরূপ, ষোড়শী নারী দর্শনেও যাঁহার চিত্ত সেই একই রূপ অর্থাৎ নির্বিকার থাকে, তিনি 'ষণ্ডক' নামে অভিহিত হন।

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথা পঙ্গুরেব সঃ॥

—যিনি কেবল ভিক্ষাদি গ্রহণ ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগনিমিত্তই আসন ত্যাগ করত অন্যত্র গমন করেন, এবং তদুদ্দেশ্যেও যিনি কখনও এক যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন না, তিনিই 'পঙ্গু'।

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং ত্যক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে॥

—কোথাও অবস্থান বা ভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর চক্ষুর্দ্বয় সম্মুখে ষোড়শহস্ত পরিমিত স্থান হইতে দূরে নিপতিত হয় না, তিনি 'অন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

হিতাহিতং মনোরমং বচঃ শোকাবহং চ যৎ।
শ্রুত্বাপি ন শৃণোতি যো বধিরঃ স প্রকীর্তিতঃ॥

—যিনি হর্ষোৎপাদক অনুকূল বচন অথবা দুঃখজনক প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিয়াও

হর্ষ-বিষাদরূপ কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত হন না, তিনি 'বধির' নামে খ্যাত।

সান্নিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্ বর্ততে নিত্যং স ভিক্ষুর্মুগ্ধ উচ্যতে॥

—বিষয়ভোগোপযোগী সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও যিনি বিষয়সমূহের সান্নিধ্যে সুষুপ্ত পুরুষের স্থায় নিত্য নির্বিকার থাকেন, সেই ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে 'মুগ্ধ' বলা হয়।

চিন্মাত্র-বাসনার অভ্যাস

পূর্বোক্ত অজিহ্বাদি ধর্মের আচরণ সহ 'চিন্মাত্রবাসনা'র অভ্যাসই সন্ন্যাসীর মুখ্য কর্তব্য। এই নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ—এক অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, চিন্মাত্রস্বরূপে কল্পিত ও স্বতঃ সত্তাস্ফুরণাদি-রহিত; অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সত্তা ও স্ফুরণ দ্বারাই সর্ব জগৎ সত্তা ও প্রকাশ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বিচারসহায়ে জগতের নাম ও রূপ—এই উভয় অংশের মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্বক উহা উপেক্ষাকরত সর্বত্র পরিপূর্ণ 'অস্তি, ভাতি ও প্রিয়'-রূপ অধিষ্ঠান-চৈতন্যই আমি—এই প্রকার নিরন্তর ভাবনাকেই 'চিন্মাত্রবাসনা' বলে। নিরন্তর এই চিন্তাধারা সর্ব মলিনবাসনা নিঃশেষে বিলীন হয়, কারণ

জন্মান্তরচিরাভ্যস্তা রাম সংসারসংস্থিতিঃ।
সা চিরাভ্যস্তযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচিৎ॥

—ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, হে রাম! বহু জন্মের দীর্ঘ অভ্যাসপ্রসূত সংস্কার-বলেই এই মিথ্যা সংসার মানবচিত্তে সত্য বলিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, ঐ ভ্রান্তি দীর্ঘকালাভ্যস্ত, ব্রহ্মবিচার বিনা বিনাশ হইবার নহে। শুদ্ধচিত্তে বিমল আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলে সাধক কৃতকৃত্য হন। আর তাঁহার করিবার বা জানিবার কিছুই অবশেষ থাকে না। তিনি পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়া প্রারব্ধচালিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সাক্ষী-রূপে অবলোকন করিতে থাকেন। ইহাই জীবন্মুক্তি-অবস্থা।

জীবন্মুক্তের স্থিতি

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ।
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিচয়াঃ
পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো
বারাণসী মেদিনী।
সর্বৈব স্থিতিরস্য মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

—পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারবান্ সেই পুরুষপ্রবরের নিকট সম্পূর্ণ জগৎ নন্দনকানন বলিয়া প্রতিভাত হয়। সর্ব বৃক্ষই তাঁহার দৃষ্টিতে কল্পবৃক্ষ, যাবতীয় জলপ্রবাহ তাঁহার নিকট গঙ্গাবারি-তুল্য শুদ্ধ, সমস্ত কর্মই পবিত্র, প্রাকৃত অথবা সংস্কৃত—সকল শব্দই তাঁহার কর্ণে বেদবাণীরূপে ধ্বনিত এবং সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার নিকট বারাণসীতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়। তখন যেরূপেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, তিনি সদা মুক্ত।

প্রারব্ধ-ক্ষয়ান্তে এই দেহাদি জগৎ-প্রতিভাস নিবৃত্তির অনন্তর তিনি চিরতরে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—অর্থাৎ তিনি 'বিদেহ-মুক্ত' হন। তাঁহাকে আর এই সংসারে জন্মমৃত্যুপ্রবাহে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তখনই এই সংসার-যাত্রার চিরনিবৃত্তি।

জীবত্বভ্রান্তি ও তন্নিবৃত্তি

জীবভাব অনাদি। কবে কিরূপে এই মিথ্যা জীবত্বের উদয় হইয়াছিল, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু জীব সেই স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার যাত্রার পথে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নানা অভিজ্ঞতা জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চয়

করিতে থাকে এবং পুণ্যপুঞ্জ পরিপক্ব হইলে দৈবাৎ কোন জন্মে দেবজনদুর্লভ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। ক্রমে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণকমলে শরণ লইয়া সন্ন্যাস-অবলম্বনে আত্মতত্ত্বানুশীলন সহায়ে পরমাত্ম-জ্ঞানোদয় হইলে ঐ জীবত্বভ্রান্তি সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুরুষার্থের এখানেই পরিসমাপ্তি; সর্বসাধনার এইখানেই শেষ। মানব-জীবনের ইহাই চরম উদ্দেশ্য, ইহাই চরম কাম্য—'জীবাভিন্ন পরমাত্ম-জ্ঞান' সহায়ে অবিদ্যার চিরনিবৃত্তিপূর্বক জীবন্মুক্তি-অবস্থালাভ।

'বোধসার' গ্রন্থে আচার্য নরহরি বলিয়াছেন:

জীবন্মুক্তি-সুখপ্রাপ্ত্যৈ স্বীকৃতং জন্ম লীলয়া।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥

—জীবন্মুক্তি-সুখলাভার্থই নিত্যমুক্ত আত্মার স্বেচ্ছায় এই ভ্রান্তিসিদ্ধ জীবরূপে জন্ম স্বীকার, সংসারভোগের কামনাবশতঃ নহে।

এক নিত্যমুক্ত চিন্মাত্রস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা সদা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মায়া-রচিত দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসমূহ দ্বারা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান। বিদ্যাসহায়ে ঐ ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে তিনিই অনাদিসিদ্ধ নিত্যমুক্তস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলা হইয়া থাকে মাত্র। ভ্রান্তি একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্তিযোগ্য, অন্য কোন উপায়ে নহে; কারণ

ভ্রান্ত্যারোপিতঃ সংসারো বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ।
ন রজ্জ্বারোপিতঃ সর্পো ঘণ্টাঘোষান্নিবর্ততে॥

—ভ্রান্তি দ্বারা আরোপিত এই সংসার একমাত্র বিচারপ্রসূত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, অন্য কোন ক্রিয়াদি দ্বারা নহে; কারণ রজ্জুতে কল্পিত যে সর্প তাহা কখনও ঘণ্টাবাদনাদিরূপ কোন কর্ম দ্বারাই অপসারিত হয় না। একমাত্র অধিষ্ঠান-রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানই কল্পিত সর্প ও তজ্জ্ঞানের নিবর্তক।

প্রকাশ ও অন্ধকার পরস্পরবিরোধী। প্রকাশ যেরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত করিয়া থাকে, একমাত্র জ্ঞানই তদ্রূপ বিরোধী অজ্ঞানের নিবর্তক। ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত। 'জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্'—কেবল জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া থাকে—(পঞ্চপাদিকা)।

শুভ নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদি—চিত্তশুদ্ধির দ্বারা—ঐ জ্ঞানোৎপত্তির উপ-কারক, এবং বিষয়ে যথার্থ বৈরাগ্যই সাধনার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সাধকের অন্যতম সহায়ক, সুহৃদ্ ও পরিচালক।

এই বৈরাগ্যই 'বৈরাগ্যশতক'-গ্রন্থে বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়তৃষ্ণার অনর্থ-কারিতা, ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগের কঠিনতা, অর্থিত্বের ক্ষুদ্রতা, জাগতিক সর্বপদার্থের অস্থিরতা, সর্বসংহারী কালের বিচিত্র প্রভাব, নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ও পরমবৈরাগ্যবান্ তত্ত্বচিন্তননিমগ্ন পুরুষপ্রবরের আচরণাদি কথন-প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল মহিমা রাজর্ষি শ্রীভর্তৃহরি এই গ্রন্থরচনাসহায়ে জগৎ সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিচার ও মনন যথার্থই বৈরাগ্যের উদ্দীপক।*

* গত বৎসর উদ্বোধনে আষাঢ় হইতে ছয় মাসে প্রকাশিত লেখকের 'বৈরাগ্যশতকম্' গ্রন্থের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

বেদান্ত-সাহিত্যের ভূমিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

বৈদিক সাহিত্য বিচার দ্বারা ইহাই নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় যে, স্ব-স্বরূপাববোধই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। মানব পরমেশ্বরের সৃষ্টিপ্রদর্শনীর সর্বোৎকৃষ্ট শোভনীয় বস্তু, সৃষ্টির ভূষণস্বরূপ। একমাত্র মনুষ্যকেই তিনি বিবেক-বিচারাদি গুণে সমলংকৃত করিয়াছেন, যাহার সদ্ব্যবহার করিয়া মানুষ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে এবং অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জন্মমরণ-আবর্তসংকুল এই দুঃখময় সংসার-সাগর হইতে চিরতরে মুক্তও হইতে পারে।

মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, 'মত্বা কর্মাণি সীব্যন্তি ইতি মানবঃ'—অর্থাৎ পরিণাম বিচারপূর্বক যিনি কর্ম করিতে সমর্থ, তিনিই মানব। বিচার ও নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা মানুষ জীবনের কোন-না-কোন সময়ে বুঝিতে পারে যে, পরিণামে দুঃখমাত্রপর্যবসায়ী ঐহিক ভোগমাত্রই তাহার মুখ্য কাম্য বস্তু হইতে পারে না। তখন সে বিষয়ভোগের প্রতি আস্থাহীন হয় ও বৈরাগ্যপ্রবণ চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের মুখে পরমতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইয়া থাকে। একমাত্র বেদান্তই মানুষকে সেই পরম তত্ত্বের সন্ধান দিয়া তাহার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী গুরু শরণাগত শিষ্যকে তাহার যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তির জন্য বেদান্ততত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকেন। বেদান্তোক্ত তত্ত্বজ্ঞানই রাগদ্বেষমূল অজ্ঞান নিবৃত্তিকরত মানবকে সর্বাত্মভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন :

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

—ঈশাবাস্যোপনিষদের এই মন্ত্রের ভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীআদিশংকরাচার্য লিখিয়াছেন, 'সর্বা হি ঘৃণা আত্মনঃ অন্যদ্ দুষ্টং পশ্যতো ভবতি।'—আপন হইতে ভিন্ন কাহাকেও দোষদুষ্টরূপে দর্শনকারী পুরুষের চিত্তেই ঘৃণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্যকারণাত্মক সর্ব দ্বৈতপ্রপঞ্চকে স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মভাবে অবগত হইলে অর্থাৎ সর্ব বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ এই জ্ঞান পরিপক্ক হইলে চিত্তগত রাগদ্বেষ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আচার্য সুরেশ্বর তৎকৃত 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ' গ্রন্থের প্রারম্ভে এইভাবে লিখিতেছেন :

জগতে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকল প্রাণীরই চিত্তে দুঃখ-পরিহারের ইচ্ছা ও তৎপরিহারার্থ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান। দেহধারণ করিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। জীব স্বকৃত পূর্বসঞ্চিত পাপপুণ্যকর্মফলবশতই বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকে, সুতরাং ঐ কর্ম ও তৎফল বিদ্যমান থাকিতে দেহধারণ অপরিহার্য। কর্মানুষ্ঠান রাগদ্বেষমূলক। অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষপ্রযুক্ত হইয়াই সকলে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ নানাবিধ কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। রাগ-দ্বেষের কারণ শোভন ও অশোভন অধ্যাস, অর্থাৎ অনিত্য ব্যভিচারী মিথ্যাভূত বিষয়ে রমণীয়তা- ও অরমণীয়তা-বুদ্ধির আরোপ। (অস্থির বিষয়ে এই বুদ্ধিও স্থির নহে, কারণ একই বিষয় কখন রমণীয় কখন বা অরমণীয়

বলিয়া প্রতীত হয়।) এই অধ্যাস অবিচারিতসিদ্ধ দ্বৈতবস্তুমূলক। দ্বৈতবস্তু যে পর্যন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে, সে পর্যন্ত এইরূপ অধ্যাসও হইবেই। এক অদ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অনববোধ-বশতই শুক্তিকাতে রজতাদির ন্যায় সর্ব দ্বৈতের সত্যবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ দেখা যায়, এক আত্মার অনববোধ বা অজ্ঞানই পরম্পরাক্রমে সর্ব অনর্থের মূল হেতু। অজ্ঞান প্রভাবেই আত্মার সুখরূপতা ও নিত্যমুক্ততা মানবের প্রতীতি হয় না ও অজ্ঞানবদ্ধ জীব নিজেকে ক্ষুদ্র দীনহীন ও দুঃখী মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব এই অজ্ঞানের আত্যন্তিক উচ্ছেদ-সাধনই দুঃখপরিহারেচ্ছু সকল জীবের একান্ত কাম্য। বিরোধিতাবশতঃ প্রকাশ যেরূপ অন্ধকারের নিবর্তক, তদ্রূপ এই অজ্ঞানেরও বিরোধী ও তন্নিবর্তক একমাত্র আত্মবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। আত্মা প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের অবিষয়। একমাত্র বেদান্তবাক্য হইতেই জীবের ঐ সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সর্বদুঃখনিবৃত্তির জন্য মুমুক্ষুর বেদান্ত-বাক্য হইতেই এই সম্যক্ জ্ঞান সম্পাদন করা একান্ত কর্তব্য।

'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বিদ্বান্‌গণ এরূপ বলিয়া থাকেন: 'বেদ' শব্দ জ্ঞানার্থক। বেদের অন্ত অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণতা বা পর্যবসান অথবা পরমাবধিকেই 'বেদান্ত' বলে। অর্থাৎ যে-জ্ঞানের পর আর জ্ঞাতব্য কিছু অবশেষ থাকে না, তাহাই বেদান্ত। অল্পজ্ঞানে শান্তি হয় না, সর্বাধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের দৃঢ় অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকারই পূর্ণ জ্ঞান। উহাই যথার্থ বেদান্ত।

পুনঃ এরূপ কথিত হয় যে, সমগ্র বেদে এক লক্ষ মন্ত্রের সংগ্রহ আছে। উহার মধ্যে আশী হাজার মন্ত্র কর্মকাণ্ড-বিষয়ক, ষোল হাজার উপাসনাত্মক এবং অবশিষ্ট চারি হাজার আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক। এই শেষ চারি হাজার বেদের অন্তভাগে সন্নিবিষ্ট বলিয়াও এই অংশকে 'বেদান্ত' বলা হয়।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বেদান্ত সর্বোত্তম। সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ আচার্য শ্রীমধুসূদন বলিয়াছেন, 'ইদমেব সর্বশাস্ত্রাণাং মূর্ধন্যম্। শাস্ত্রান্তরং সর্বম্ অস্যৈব শেষভূতমিতীদমেব মুমুক্ষুভিরাদরণীয়ং শ্রীভগবৎপাদোদিতপ্রকারেণ ইতি'—বেদান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্র ইহার অঙ্গীভূত। অতএব ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্যপ্রদর্শিত-মার্গে বেদান্তপাঠ ও বিচারাদি করাই মুমুক্ষুগণের একান্ত কর্তব্য।

উপনিষদের অপর নাম 'বেদান্ত'। 'উপ' ও 'নি'-পূর্বক 'সদ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয়-যোগে 'উপনিষৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'উপ' শব্দ দ্বারা সত্বর ও সামীপ্য, 'নি' শব্দ নিশ্চয় বা নিঃশেষ অর্থ বুঝায় এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ বিশরণ, শিথিলীকরণ, গতি বা প্রাপ্তি ও অবসাদন বা বিনাশ। অতএব 'উপনিষৎ' শব্দের অর্থ—জীবব্রহ্মের ঐকাত্ম্য-জ্ঞানসহায়ে যে-বিদ্যা সত্বর সকারণ সংসার-বন্ধন শিথিল করে বা যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায় অথবা যে-বিদ্যার অভ্যাস করিলে উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সংসার-বন্ধনকে বিনাশ করে, সেই বিদ্যাই উপনিষৎ। এইরূপে বেদান্ত- বা উপনিষৎ-শব্দ ব্রহ্মবিদ্যাকে বুঝাইলেও উপনিষদ্‌রূপে কথিত গ্রন্থসমূহ সাহায্যে ঐ বিদ্যা লাভ হয় বলিয়া গৌণভাবে গ্রন্থকেও 'উপনিষদ্ বা বেদান্ত' বলা হয়। হৃদয়গুহাচারী প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম-বিষয়ে এই বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রপন্ন শিষ্যকে

কেবল করুণা-প্রণোদিত হইয়াই প্রদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু বেদান্তোক্ত তত্ত্বটি অতি সূক্ষ্ম ও দুরূহ। উহার মর্মার্থ সরলভাবে সকলের বোধগম্য ও প্রতিবাদিগণের বিকৃত মতসমূহ হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীনকাল হইতেই ঐ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—এই তিনটিকে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়। এই তিনটি 'প্রস্থান'ই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রে পরমতখণ্ডনপূর্বক উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের মর্মার্থ সংক্ষেপে সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা 'ন্যায়প্রস্থান' নামে খ্যাত। গীতাকে 'স্মৃতি-প্রস্থান' ও উপনিষদ্‌সমূহকে 'শ্রুতি-প্রস্থান' বলে।

আত্মার একত্বই উপনিষদ্‌সমূহের মূল বক্তব্য; অধিকারভেদে অপর সমস্ত বিভিন্ন উপদেশ—যাহা উপনিষদে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা ঐ একত্ব-বোধনের সহায়কমাত্র। এইরূপে সর্ব বৈদিক মতসমূহের সমন্বয় স্থাপন-করত উদার অদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমন্বয়াচার্য শ্রীশংকরকৃত প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যসমূহই সর্বোৎকৃষ্ট। এ-বিষয়ে বৈদেশিক পণ্ডিতগণও একমত। সকল উপনিষদ্‌ই একবাক্যে এবং নির্বিরোধে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং জগতের মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিতেছেন। গুরুপরম্পরাগত এই বিদ্যা গুরুমুখে লাভ করিলে সর্ব বিরোধের অবসান হয়। আচার্য শ্রীশংকর প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্য-সহায়েই পৌর্বাপর্য নির্ণয়করত শ্রুতি-ব্যাখ্যানপূর্বক স্বমত অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুনঃ কর্ম, পূজা, যোগ, উপাসনা প্রভৃতি অধিকারীর রুচি- ও যোগ্যতানুযায়ী এই মতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কিছুই অনাদৃত হয় নাই। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদ সর্বংসহ। শ্রুতিসমুদ্র মন্থনপূর্বক শিবাবতার আচার্য শ্রীশংকর এই অদ্বৈতামৃত জগতের হিতের জন্য সকলকে পরমকরুণাপরবশচিত্তে সাদরে পরিবেশন করিয়াছেন।

আচার্য শ্রীশংকর-প্রচারিত অদ্বৈতবাদই যে ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত এবং ভগবান শ্রীবেদব্যাস-সম্মত ও সর্ব উপনিষদের যথার্থ তাৎপর্য—ইহা নিঃসন্দেহ।

পরস্পর-বিরুদ্ধ মতমতান্তরসমূহদ্বারা বিভ্রান্ত, শান্তিপিপাসু জীবগণকে অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব-রহস্য বুঝাইবার জন্য পরমকারুণিক সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীবেদব্যাস সর্বোপনিষৎ-সিদ্ধান্তের সারভূত 'ব্রহ্মসূত্র'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাই 'বেদান্তদর্শন', 'শারীরক সূত্র', 'উত্তরমীমাংসা-দর্শন' ইত্যাদি নামে সুপ্রসিদ্ধ। মানব-কল্যাণের নিমিত্ত প্রকট শিবাবতার আচার্য শ্রীশংকর স্বীয় সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভব ও লোকোত্তর প্রতিভা-সহায়ে অতি প্রসন্ন ও গম্ভীর বাক্যরচনাদ্বারা উক্ত 'ব্রহ্মসূত্র', 'দশোপনিষৎ' ও 'গীতা'র উপর অপূর্ব অনবদ্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উহাতে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-সম্মত তাৎপর্য সুনির্ণীত হইয়াছে। আচার্যশিষ্য শ্রীসুরেশ্বর, পদ্মপাদ ও তৎপশ্চাৎ সর্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি তত্ত্ববেত্তা বিদ্বান্‌গণও বেদান্ত-বিষয়ক স্ব স্ব রচনাসমূহদ্বারা বেদান্ত-শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিত-ধুরন্ধর শ্রীবাচস্পতিমিশ্র সূত্রভাষ্যের উপর 'ভামতী'-নামক এক অপূর্ব টীকা রচনা করিয়া সর্বলোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। সূত্রভাষ্যের উপর আরও বহু টীকাদি রচিত হইয়াছে। আচার্যপদানুগ স্বনামধন্য শ্রীমধুসূদন

সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'অদ্বৈতরত্নরক্ষা' প্রভৃতি, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিৎসুখাচার্য 'চিৎসুখী', অলৌকিক প্রতিভাশালী শ্রীহর্ষ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি গ্রন্থরচনা দ্বারা প্রতিপক্ষের কুতর্কসমূহ খণ্ডনকরত অদ্বৈততত্ত্বাববোধ অধিকতর সুগম করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্তের দুরূহতা অনুমান করিয়া সর্ববিদ্যাপারঙ্গত শ্রীবিদ্যারণ্যস্বামী 'পঞ্চদশী' আদি ও যাজ্ঞিক শ্রীধর্মরাজ 'বেদান্তপরিভাষা'-নামক মনোরম গ্রন্থরচনা দ্বারা সাধারণ সংস্কৃতাভিজ্ঞ পুরুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এইরূপে আরও বহু বিদ্বদ্বৃন্দের রচনাভারে সমৃদ্ধ হইয়া অদ্বৈতবেদান্ত-সাহিত্য কালক্রমে এক বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে।

সংস্কৃতানভিজ্ঞ হিন্দিভাষাভাষিগণের জন্য সর্বদর্শনতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীনিশ্চলদাস লোক-কল্যাণেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া 'বিচারসাগর' ও 'বৃত্তিপ্রভাকর' নামক দুইখানি গম্ভীর সিদ্ধান্তপূর্ণ বেদান্তগ্রন্থ রচনা করিয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ কর্তৃক অনূদিত 'তত্ত্বানুসন্ধান', 'আত্মপুরাণ' আদি গ্রন্থও বহুলোকের অধ্যাত্ম-জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছে। পণ্ডিত পীতাম্বরকৃত 'বিচার-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি ও 'পঞ্চদশী' আদি গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদও মুমুক্ষুগণের সমাদর লাভ করিয়াছে।

বঙ্গভাষাতেও শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ), স্বামী গম্ভীরানন্দ ও অন্যান্য সুপণ্ডিত লেখকগণ বহু বেদান্ত-শাস্ত্র বঙ্গভাষাভাষিগণের নিকট সুখবোধ্য করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

সংসারে আবদ্ধ হইয়া জীব কত দুঃখ পায়। এই দুঃখের কারণ সে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের উপর আরোপ করিয়া থাকে। অজ্ঞান-রোগে আক্রান্ত হইয়াই সে সংসারে হাবুডুবু খাইতেছে, কষ্ট পাইতেছে—ইহা সে জানে না বা বুঝিতে পারে না। ভাগ্যবশে সৎসঙ্গ লাভ হইলে তখন জীবের লক্ষ্য বস্তুর উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়। সৎসঙ্গের মহিমাবলেই জীব নিজের রোগবিষয়ে সচেতন হয় ও তন্নি-বৃত্তির জন্য ক্রমশঃ সচেষ্ট হয়। তখনই এই বিচার চিত্তে জাগ্রত হয় যে, রাগদ্বেষাদিপূর্ণ বহির্মুখ জীবনে যদি নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে এতদিনে উহা অবশ্যই লাভ হইত। অতএব বহির্মুখ জীবনে শাশ্বত সুখ-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। বিষয়ে দোষ-দৃষ্টিপূর্বক বাহ্যবিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া অন্তর্মুখ হইতে হইবে। বেদান্ত মানুষকে এই অন্ত-র্মুখীনতাই শিক্ষা দেয়। কিন্তু ভোগবাসনা দ্বারা চঞ্চল ও কলুষিত চিত্ত সহসা অন্তর্মুখ হইয়া আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাই শাস্ত্র নিষ্কাম-কর্ম ও উপাসনাদির বিধান করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তগত ভোগবাসনা বিনষ্ট হইলে ও উপাসনা দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইয়া একাগ্রতা সাধিত হইলে দৃঢ় আত্মজিজ্ঞাসা উদিত হয়। তখন তাহার জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী আচার্যগণের নিকট উপসন্ন হইয়া সেই পরমতত্ত্ব অবগত হও। ভগবতী শ্রুতি শুধু 'বোধত' বলেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন 'নিবোধত'—অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে অবগত হও। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মননাদি সহায়ে তত্ত্বাবগতির নিমিত্ত শ্রুতি সাদরে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। এই বিদ্যা গুরুমুখেই লব্ধব্য। বিদ্বান্‌গণ বলেন: উপনিষদ্ অধ্যয়ন দ্বারা গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যালাভ

উত্তম কল্প, ঋষি-প্রণীত ইতিহাস-পুরাণাদি অধ্যয়ন দ্বারা গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যালাভ মধ্যম কল্প, এবং ভাষা-প্রবন্ধাদি অধ্যয়ন দ্বারা গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যালাভ অধম কল্প। বিভিন্ন অধিকারীর জন্যই এই বিভিন্ন ব্যবস্থা, ইহা বলা বাহুল্য।

বেদান্ত পতিত জীবনকে উন্নত করে। ইহা আমাদিগকে কোন অভিনব অপূর্ব বস্তু প্রদান করে না। যে স্ব-স্বরূপ আমরা অজ্ঞানবশতঃ বিস্মৃত হইয়াছি, বেদান্ত তাহাই আমাদের জানাইয়া দেয় মাত্র। বিবেক-বিচারাদিসহায়ে জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হইলে জ্ঞানবান্ পুরুষ জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকেন। আপাত-প্রতীয়মান রূপরসাদি-বিষয়ে তিনি আর আবদ্ধ হন না। সর্বপ্রতীতির অন্তর্নিহিত সত্য-বস্তুটিকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ- ও স্বাভিন্নরূপে বোধকরত তিনি স্বরূপনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। জ্ঞানী সংসারে থাকিয়াও সদা স্ব-স্বরূপে থাকেন অর্থাৎ স্বরূপকে কখনও বিস্মৃত হন না। সাংসারিক সুখ-দুঃখকে খেলামাত্র জানিয়া তিনি সংসারে বিচরণ করেন, কারণ তিনি জানেন সুখ-দুঃখ স্বরূপে নাই, উহা ভ্রান্তিবশতঃ জীব নিজেতে আরোপ করিয়া থাকে মাত্র। জ্ঞানী সর্বসংসার-দুঃখ-রহিত স্বরূপস্থিতি লাভ-করত পরমানন্দ-সাগরে সদা নিমগ্ন থাকেন। এই অবস্থা-লাভই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব মুমুক্ষুর সদা বেদান্ত-শ্রবণ-বিচারাদি দ্বারা স্বীয় কল্যাণ-সাধনে যত্নবান্ হওয়াই সর্বতোভাবে কর্তব্য।

'শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্'

স্বামী ধীরেশানন্দ

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসরচিত 'ব্রহ্মসূত্রে' অপশূদ্র অধিকরণের অন্তিম সূত্রের (১।৩।৩৮) ভাষ্যে ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্য লিখিয়াছেন :

" 'শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্' ইতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যস্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্।"

—ইতিহাস-পুরাণাদির অধ্যয়ন-সহায়ে তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকার চতুর্বর্ণেরই রহিয়াছে। অতএব ঐ অধিকার শূদ্রেরও আছে, ইহাই বক্তব্য। বেদপূর্বক অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞানলাভের অধিকার জাতি শূদ্রের নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের পরিপোষকরূপে ভাষ্যকার মহাভারত শান্তিপর্বের

শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্॥

মহাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯

এই শ্লোকটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ : ব্রাহ্মণকে অগ্রভাগে রাখিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শুনাইবে, এই বেদাধ্যয়ন অতীব মহৎ কর্ম। এখানে কিন্তু শূদ্রের বেদশ্রবণের কথা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। কিন্তু আচার্য তাঁহার ভাষ্যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়া মহাভারতের এই বচন-সহায়েই শূদ্রের কেবল ইতিহাস-পুরাণাদি শ্রবণেই অধিকার রহিয়াছে, ইহা বলিলেন। ইহাতে শ্লোকটির অর্থবিষয়ে বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে না কি? শ্লোকে রহিয়াছে—'বেদস্যাধ্যয়নং হীদং'—বেদাধ্যয়নের কথা, কিন্তু ভাষ্যকার ইহাকে ইতিহাস-পুরাণ-অধ্যয়ন বিষয়ক বলিলেন। মহাভারত ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের রচনা, ব্রহ্মসূত্রও তাঁহারই রচনা। মহাভারতে যে শ্লোকে পরমগুরু শ্রীবেদব্যাস শূদ্রের বেদাধিকারের কথা বলিতেছেন, তদ্রচিত সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শ্রীশংকর সেই শ্লোকের দ্বারাই শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়া শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণ-অধ্যয়নে অধিকার স্থাপন করিতেছেন; ইহাই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধ। ইহার মীমাংসা কি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভাষ্যকার শ্লোকটিকে প্রকরণবিরুদ্ধ অর্থেই লাগাইয়াছেন, কারণ মহাভারতের শান্তিপর্বের সর্বত্র বেদ-অধ্যয়নের প্রসঙ্গই রহিয়াছে। তবে কি ভাষ্যকার সূত্রকারের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না? ইহার মীমাংসা খুঁজিতে গিয়া আচার্য পদ্মপাদের সহিত সুর মিলাইয়া ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয়,—

শংকরঃ শংকরঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে ন জানে কিং করোম্যহম্॥

—শংকর সাক্ষাৎ শিবাবতার ও ব্যাসদেব স্বয়ং নারায়ণ। এই উভয়ের বিবাদে আমি কি করি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পূর্বোক্ত বিষয়ে আমরা একটু বিচার করিয়া অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। শূদ্রের বেদাধিকার আছে কিনা তাহা আমরা বিচার করিব না। আমরা কেবল মহাভারতের ঐ শ্লোকটির যথার্থ তাৎপর্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব, যাহাতে সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে এই প্রতীয়মান বিরোধের একটা সমাধান পাওয়া যাইতে পারে।

শূদ্রের বেদশ্রবণের বিষয়ে কোন কোন বিদ্বান্ বলেন যে সংস্কারবিহীন বলিয়া শূদ্র ব্রাহ্মণের পিছনে বসিয়া বেদ শুনিবে। ব্রাহ্মণাদি বালকের

ন্যায় বিধিপূর্বক শ্রবণে তাহার অধিকার নাই, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে বেদব্যাসের স্ববচন সহ বিরোধ হইবে। কারণ তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন :

'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা'

—ভাঃ ১।৪।২৫

—স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুগণ অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বেদ শ্রবণ করিবে না। ব্রহ্মসূত্রের পূর্বোক্ত (১।৩।৩৮) সূত্রের ভাষ্যে স্মৃতিবলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শূদ্র সমীপে বেদ অধ্যয়ন করিবে না, শূদ্র বেদ শুনিলে তাহার কাণে গলিত সীসা ও লাক্ষা ঢালিয়া দিবে, ইত্যাদি। যেখানে এরূপ কঠোর ব্যবস্থা, সেখানে ব্রাহ্মণের পিছনে বসিয়াও শূদ্রের বেদ শ্রবণের সুযোগ দিতে ইহারা রাজি হইবেন বলিয়া মনে তো হয় না। ইহার উত্তরে পূর্বোক্ত বিদ্বান্‌গণ বলেন বিধিপূর্বক গুরুমুখে স্বর-লয়াদিসহ বেদপাঠের নামই যথার্থ বেদাধ্যয়ন। এমনি শোনা উহা ইতিহাস পুরাণ শ্রবণেরই তুল্য। উহা যথার্থ বেদশ্রবণ বা অধ্যয়নই নহে, ইত্যাদি।

একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে জন্মগত বর্ণবিভাগ মানিলেই এই সব অধিকার-বিচারের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। গুণগত বর্ণবিভাগ স্বীকার করিলে এই সব কথাই উঠে না। ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৮-এর ভাষ্যে কিন্তু ভাষ্যকার 'বেদপূর্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণাম্'—এখানে কেবল 'শূদ্র' এই পদ ব্যবহার করিয়াছেন। টীকাকার আনন্দগিরি উহার উপরে লিখিয়াছেন—'ন জাতিশূদ্রস্য বেদদ্বারাধিকারো বিদ্যায়াম্'—অর্থাৎ জন্মগত শূদ্র যাহারা, তাহাদের বেদদ্বারা জ্ঞানে অধিকার নাই। মনে হয় ইহারা সকলেই জন্মগত বর্ণবিভাগেরই পক্ষপাতী। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—

(গীতা ৪।১৩)

অর্থাৎ গুণ- ও কর্ম-বিভাগ অনুসারে চতুর্বর্ণ-বিভাগ আমিই করিয়াছি। তবে গুণকর্মানুসারেই বা বর্ণ-বিভাগ মানা যাইবে না কেন? পূর্বে হয়তো এরূপই ছিল, ক্রমশঃ বিভিন্নকালীন বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ জন্মগত বর্ণবিভাগই সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহার বিচার না করিয়া আমরা পূর্ব কথায় ফিরিয়া যাই।

মহাভারতের 'শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্'—এই শ্লোকটির তাৎপর্য-নির্ণয়ই আমাদের বিষয়। মহাভারতের ঐ প্রকরণ দেখিলে মনে হয় ব্যাসদেব শূদ্রের বেদ শ্রবণের কথাই বলিতেছেন, কিন্তু সূত্রভাষ্য (১।৩।৩৮) দেখিলে মনে হয় উহা ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণের কথা, বেদশ্রবণের কথা নহে। ব্যাসদেবের সূত্রের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার জন্যই ভাষ্যকার সূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্য ব্যাসদেবের স্ববচনবিরোধী হওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে। যদি মহাভারত পড়িলে মনে হয় যে ব্যাসদেব শূদ্রদের বেদশ্রবণের অধিকার দিয়াছেন, তাহা হইলে বলিতে হয় ভাষ্যকার জানিয়া শুনিয়া ঐ শ্লোকের কদর্থ করিয়াছেন। তাহা বলাও ঠিক নহে। বিধিরহিতভাবে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিতে পারে ইহাই যদি ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি তাহাই লিখিতেন। তাহা না বলিয়া তিনি ঐ শ্লোকার্থ ইতিহাস-পুরাণ-শ্রবণ বিষয়ে লাগাইলেন কেন? যে শ্লোক বেদপাঠ বিষয়ক তাহা ইতিহাস-পুরাণ-পাঠ বিষয়ক বলাতে ক্লিষ্টকল্পনা এবং প্রকরণবিরুদ্ধ অর্থান্তর কল্পনা হইল না কি?

এই শংকার এক সমাধান :—ভাষ্যকার কঠোর সনাতনপন্থী ছিলেন। দক্ষিণ দেশে বিশিষ্ট নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। সুতরাং ঐ সমাজের কঠোর রীতিনীতির প্রভাবে তাঁহার চিন্তাধারা

অনেকাংশে প্রভাবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন ভাষ্যকার ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার স্বীকার করেন নাই (মুঃ উপঃ ১।২।.২ ভাষ্য ; বৃহঃ উপঃ ৩।৫।১ ; ৪।৫।১৫ ভাষ্য দ্রঃ) কিন্তু তৎশিষ্য আচার্য সুরেশ্বর তাহা মানিলেন না। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে ত্রৈবর্ণিক সন্ন্যাসের বিধান দিয়াছেন এবং উহাই দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে অদ্যাবধি প্রচলিত। সেইজন্য মনে হয় ভাষ্যকার শূদ্রের কোন প্রকার বেদশ্রবণ-অধিকার বিষয়েই রাজি হইবেন না। মহাভারতের ঐ শ্লোকে বেদব্যাস শূদ্রের বেদশ্রবণাধিকার দিয়াছেন, ইহা যদি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে শ্রুতি ও স্মৃতি সহ বিরোধ হয় বলিয়া ভাষ্যকার ব্যাসবচন মানিতেছেন না। নিজের সামর্থ্যে শ্লোকের অন্য অর্থ করিয়াছেন। সমর্থ পুরুষ সব করিতে পারেন।

'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা'

—(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

—বহ্নি সর্বভোজী হইলেও উহা যেমন তাহার দোষ বলিয়া ধরা হয় না, তদ্রূপ সমর্থ পুরুষগণের ব্যবহারও দোষাবহ নহে।

কিন্তু পূর্বোক্ত সমাধানে আচার্য শংকরকে ব্যাসবিরোধী মতের প্রচারক স্বীকার করিতে হয় বলিয়া উহা আমাদের মনঃপূত নহে। এখন আমরা দেখিব উহার অন্য কোন সমাধান হইতে পারে কিনা। প্রথমেই বিচার করা যাউক, মহাভারতের ঐ প্রকরণে (শান্তিপর্ব, ৩২৭ অধ্যায়) ব্যাসদেব কি বলিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ে মোট ৫৩টি শ্লোক আছে তন্মধ্যে ২৬ নং হইতে ৫৩ নং শ্লোকের মধ্যেই বিচার্য বিষয়টি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। প্রথমেই দেখিতে পাই মহাতপা পরাশরনন্দন শ্রীবেদব্যাস হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল এই চারিটি শিষ্যকে বেদ পাঠ করাইতেছেন ও সুখপূর্বক সেই আশ্রমে বাস করিতেছেন। (এখানে ২৬নং শ্লোকের 'বেদান্ অধ্যাপয়ামাস', এই বেদ শব্দ লক্ষণীয়)। এমন সময় আকাশ-মার্গে মহাযোগী সূর্যসম বিশুদ্ধাত্মা ব্যাসপুত্র শুকদেবের আবির্ভাব। তিনি নিকটে আগমন করিয়া পিতার চরণ বন্দনাপূর্বক সুমন্ত-আদি সতীর্থচতুষ্টয় সহ যথাবিধি মিলিত হইলেন। পুত্রসহ শিষ্যচতুষ্টয়কে ব্যাসদেব সেই আশ্রমে বেদ-পাঠ করাইতেছিলেন। ('এবমধ্যাপয়ন'··· ৩৩নং শ্লোক)। অনন্তর কোন সময়ে বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ঐ শিষ্যগণ সাঙ্গ বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরু ব্যাসদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—চার শিষ্য ও গুরুপুত্র শুকদেব, এই পাঁচ জনের মধ্যেই যেন বেদ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ষষ্ঠ অন্য কোন শিষ্য যেন খ্যাতি লাভ না করে। (এখানে 'বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ···' ৩৪নং শ্লোক ; 'বেদেষু নিষ্ঠাং সংপ্রাপ্য সাঙ্গেষু···' ৩৫নং শ্লোক ; 'ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্ ...' ৪১নং শ্লোক লক্ষণীয়)। অতঃপর ব্যাসদেব প্রীত হইয়া বরপ্রদান করিয়া শিষ্যগণকে বিদ্যাসম্প্রদান-বিধি বলিলেন। প্রায় অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত এই বিদ্যাসম্প্রদান-বিধিই বলা হইয়াছে। যথা—তোমরা ব্রহ্মলোক-বাসাকাংক্ষী বেদশ্রবণেচ্ছু ব্রাহ্মণকে বেদ পড়াইবে, তোমাদের দ্বারা এই বেদের খুব প্রচার হউক, ইত্যাদি। ('ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্মশুশ্রূষবে তথা।' ৪৩ নং শ্লোক ; 'ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবং সমভিকাংক্ষতে। ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্যতাময়ম্॥' ৪৪নং শ্লোক লক্ষণীয়)। অতঃপর ৪৮ নং শ্লোক পর্যন্ত কাহাকে কাহাকে বিদ্যাপ্রদান করিবে না সেই অনধিকারীদের বিষয় বর্ণন করিয়া ৪৯নং শ্লোকে ভগবান্ বেদব্যাস সেই শ্লোকটি বলিতেছেন যাহা ভাষ্যকার (১।৩।৩৮) সূত্রভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন :—

শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্ ॥
(মহাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯)

এখানেও বেদ শব্দটি লক্ষণীয়। ব্যাসদেব বলিতেছেন ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রাখিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শুনাইবে। বেদাধ্যয়ন সুমহৎ কর্ম। অতঃপর দেবতাগণের স্তুতির জন্য স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বেদ প্রকট করিয়াছেন ইহা উল্লেখ করিয়া ('স্তুত্যর্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।' ৫০নং শ্লোক লক্ষণীয়) স্বাধ্যায়বিধি কথনপূর্বক ভগবান্ বেদব্যাস এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিলেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাভারতের এই অধ্যায়ে সর্বত্র বেদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকারকর্তৃক উদ্ধৃত পূর্বোক্ত শ্লোকের তৃতীয় চরণেও বেদের কথাই আছে, ইতিহাস-পুরাণের কথা কোথাও নাই। মহাভারতের এই অধ্যায়ে বিভিন্ন স্থলে আমরা বেদ শব্দের প্রয়োগ এইরূপ দেখিতে পাই, যথা—

(ক) 'বেদান্ অধ্যাপয়ামাস ...' (৩২৭।২৬) : বেদান্ বহুবচন, অতএব ব্যাসদেব শিষ্যগণকে বেদ-সকল পড়াইয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। এখানে বেদ শব্দ চতুর্বেদ-বিষয়ক। ইতিহাস-পুরাণ বিষয়ক নহে।

(খ) 'স্তুত্যর্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা' (৩২৭।৫০) : 'বেদাঃ' বহুবচন, সুতরাং ইহাও চতুর্বেদবিষয়ক, ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে। কল্পারম্ভে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকর্তৃক প্রকটিত বেদ কখনও বেদব্যাসরচিত পুরাণাদি হইতে পারে না, তখন বেদব্যাসের জন্মও হয় নাই।

(গ) 'বেদেষু ... সাঙ্গেষু' (৩২৭।৩৫) : সাঙ্গ বেদসকল অবশ্যই মুখ্য বেদ। বেদের ন্যায় ইতিহাস পুরাণের অঙ্গসকল প্রসিদ্ধ নহে।

(ঘ) 'ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্' (৩২৭।৪১) : এখানেও বেদাঃ বহুবচন, চতুর্বেদবিষয়ক; ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে।

(ঙ) 'ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্ম-শুশ্রূষবে তথা' (৩২৭।৪৩) : অর্থাৎ বেদশ্রবণেচ্ছুকেই এই বিদ্যা দিবে। এখানেও ব্রহ্ম অর্থ মুখ্যবেদ, উহা ইতিহাস পুরাণ-বিষয়ক নহে। ('বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম'—অমরকোশ)।

(চ) 'ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবং সমভিকাঙ্ক্ষতে। ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্যতাময়ম্ ॥' (৩২৭।৪৪) : মুখ্য বেদ অধ্যয়নেরই ফল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা—ছাঃ উপঃ ৮।১৫।১ দ্রঃ। অতএব মুখ্যবেদ অধ্যয়নেরই ফল শ্লোকের পূর্বার্ধে বলা হইয়াছে, ইতিহাস-পুরাণাদি পাঠের ফল নহে। ইতিহাস-পুরাণ পাঠের ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইতে পারে না এবং এই বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। এই শ্লোকের উত্তরার্ধে ব্যাসদেব শিষ্যদের বলিলেন যে, তোমরা শিষ্যপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও এবং এই বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি সহায়ে বিস্তার কর। এখানে 'বেদো বিস্তার্যতাময়ম্'—'বেদঃ' ও 'অয়ম্'—এই একবচনান্ত প্রয়োগ বিশেষরূপে লক্ষণীয়। ইহার গূঢ় রহস্য পরে বলা হইতেছে।

(ছ) '... স্বাধ্যায়স্য বিধিং প্রতি' (৩২৭।৫২) : স্বাধ্যায় শব্দটির মুখ্য অর্থ—বেদ অধ্যয়ন, ইতিহাস-পুরাণ পাঠ নহে। এখানে স্বাধ্যায়বিধি বলা হইয়াছে, এজন্যও এই প্রকরণ মুখ্যবেদ-বিষয়ক, ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে।

এই প্রকারে বলা যাইতে পারে যে শান্তিপর্বের এই অধ্যায়টি মুখ্যবেদবিষয়ক, ভাষ্যকার-কথিত ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক কখনই নহে।

আর একটি বিষয়ও এখানে চিন্তনীয়। ৩২৭।৪০,৪১ শ্লোকে—'ষষ্ঠঃ শিষ্যো ন তে খ্যাতিং গচ্ছেৎ...' ৪০ ; 'ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্ এষ নঃ কাঙ্ক্ষিতো বরঃ' ৪১—শিষ্যগণ প্রার্থনা করিলেন যে বেদসকল আমাদের পাঁচজনের মধ্যেই

(৪ শিষ্য ও গুরুপুত্র শুকদেব, এই পাঁচ) প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, ষষ্ঠ আর কোন শিষ্য যেন বেদবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ না করেন। ব্যাসদেবও সেই বর দিলেন এবং বিদ্যাসম্প্রদানবিধি ও স্বাধ্যায়বিধি বলিলেন। এখানেও যদি 'বেদ' অর্থে ইতিহাস-পুরাণ গৃহীত হয় তবে ব্যাসদেবকে মিথ্যাবাদী বলিতে হইবে, কারণ তিনি এই পাঁচজন হইতে অতিরিক্ত স্বতপিতা রোমহর্ষণকেও ইতিহাস-পুরাণবিদ্যা (অর্থাৎ বেদবিদ্যা) দিয়াছেন এবং রোমহর্ষণ ও তৎপুত্র স্বত ইতিহাস-পুরাণ-বক্তারূপে খ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। 'ইতিহাস-পুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ' (ভাগঃ ১।৪।২২ দ্রঃ)। সুতরাং ঐ শ্লোক দুইটিও মুখ্যবেদবিষয়ক, ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে। এই অধ্যায়ের পূর্বে ও পরেও বহুস্থলে মুখ্যবেদই প্রস্তাবিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, মহাভারত শান্তিপর্বের ৩২৭ নং অধ্যায়টিতে ব্যাসদেব মুখ্যবেদের বিষয়ই বলিয়াছেন, ইতিহাস-পুরাণের বিষয় বলেন নাই। তাহা হইলে ভাষ্যকার 'শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্' ৩২৭।৪৯ এই শ্লোকে ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণ করাইবার কথা বলিয়া ব্যাসসিদ্ধান্ত সহ স্পষ্ট বিরোধ করিলেন না কি ?—এই পর্যন্ত শংকাটির বিস্তার করিয়া এখন উহার সমাধান বর্ণিত হইতেছে :

শান্তিপর্বের ৩২৭ অধ্যায়ের ২৬,৩৫,৪১,৪৩,৫০ পূর্বে উদ্ধৃত এই শ্লোকগুলি সবই মুখ্য চতুর্বেদবিষয়ক, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বিচারপূর্বক দেখান হইয়াছে। কিন্তু ব্যাসদেব তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয় ও পুত্র শুকদেব, এই পাঁচজনকে কেবল মুখ্য-বেদবিদ্যাই পড়ান নাই, মহাভারতও (ইতিহাস) পড়াইয়াছেন যথা—বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—'সুমন্ত জৈমিনি, পৈল, আমি আর শুকদেব এই পাঁচ শিষ্যকে আচার্য ব্যাসদেব চারিবেদ তথা পঞ্চমবেদ মহাভারত পড়াইয়াছিলেন।'—

'...বেদান্ অধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্' ॥
(শান্তিপর্ব ৩৪০।১৯-২১ শ্লোক দ্রঃ)

বেদে অনধিকারী স্ত্রীশূদ্রাদির জন্যই ব্যাসদেব মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন একথাও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসিদ্ধ আছে (ভাগঃ ১।৪।২৫ দ্রঃ)। শিষ্যগণ বর প্রার্থনা করিলেন, মুখ্যবেদসকলের আচার্যত্ব এবং আর কেহ যেন খ্যাতি লাভ না করে ইত্যাদি (৩২৭।৩৮-৪১)। বালক যেমন অনেক কিছুই খাইতে চায়, কিন্তু হিতৈষিণী মাতা প্রিয়পুত্রকে তার অনুকূল খাদ্যই পরিবেশন করেন, গুরু ব্যাসদেবও তদ্রূপ বরপ্রদান করিয়া তৎপশ্চাৎ তাহাদের বর্তমান কর্তব্যও নির্ধারণ করিলেন। তিনি শিষ্যদের কল্যাণকর, ধর্মানুকূল বচন বলিলেন,

'উবাচ শিষ্যান্ ধর্মাত্মা ধর্ম্যং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ'
(৩২৭।৪৩-৪৪)

—"তোমরা এই বেদবিদ্যা ব্রহ্মলোকবাসাকাংক্ষী, বেদশ্রবণেচ্ছু ব্রাহ্মণকে দিবে, তোমরা শিষ্য-পরম্পরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ইত্যাদি ; (এখন তোমাদের যাহা কর্তব্য তাহাওশোন—) এখন তোমরা 'বেদোবিস্তার্যতাময়ম্', অর্থাৎ এখন তোমরা এই বেদ অর্থাৎ পঞ্চমবেদ মহাভারত অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিদ্বারা বিস্তার কর।" এখানে বেদ শব্দ একবচনান্ত। মুখ্য চারি বেদ বিবক্ষিত হইলে উহা অন্যান্য স্থলের ন্যায় বহুবচনান্ত হইত। মহাভারতকে (ইতিহাস) পঞ্চমবেদ বলা হয়। যথা 'ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে'—(ভাগঃ ১।৪।২০) ; 'ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং' (ছাঃ উপঃ ৭।১,২)। এই পঞ্চমবেদ মহাভারতকেই এই স্থলে ব্যাসদেব বিশেষরূপে প্রচার করিতে বলিতেছেন। কেন বলিতেছেন তাহার উত্তরও পাওয়া যাইবে ব্যাসদেবের নিজেরই বচন হইতে। মহাভারতকার বলিতেছেন :—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রতরেদিতি ॥
মহাঃ ভাঃ ১।১।২২৯

—ইতিহাস-পুরাণ দ্বারাই বেদার্থ বিস্তার ও সমর্থন করিবে। ইতিহাস-পুরাণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বেদ এই মনে করিয়া ভয় পান যে, এই ব্যক্তি আমায় প্রতারণা অর্থাৎ আমার কদর্থ করিবে।…যিনি এই মহাভারতরূপ বেদ অপরকে শ্রবণ করান তাহার মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি।—

ইতিহাস-পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে বেদার্থ ঠিক ঠিক করা যাইবে না, এই জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাসদেব শিষ্যদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—'অপ্রমাদশ্চ বঃ কার্যো ব্রহ্ম হি প্রচুরচ্ছলম্।' (শান্তিপর্ব ৩২৮।৬)—'ব্রহ্ম হি প্রচুরচ্ছলম্' এই বাক্যে ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, বেদার্থ-নির্ণয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতএব তোমরা মৎপ্রণীত পঞ্চমবেদ এই মহাভারতের বিস্তার প্রথম কর। (৩২৭।৪৪)। ইহার পর ৩২৭।৪৫-৪৮ শ্লোকসমূহে বিদ্যাসম্প্রদানবিধি বর্ণন করিয়া ব্যাসদেব আমাদের বিচার্য সেই শ্লোকটি বলিলেন :

শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্ ॥
শাঃ ৩২৭।৪৯

এখানেও বেদ শব্দটি একবচনান্ত, কারণ ইহা পঞ্চমবেদ মহাভারত-বিষয়ক। এইরূপে দেখা যায় যে **এই অধ্যায়ে বহুবচনান্ত 'বেদ' শব্দগুলি** (শ্লোক নং ২৬, ৩৫, ৪১, ৪৩, ৫০) **মুখ্য চতুর্বেদ-বিষয়ক এবং একবচনান্ত 'বেদ'শব্দ** (শ্লোক নং ৪৪, ৪৯) **মহাভারত-বিষয়ক।**

এইভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করিলে ব্যাসদেব ও ভাষ্যকারের মধ্যে কোন মতবিরোধ প্রতীত হইবে না, কারণ প্রকৃত 'শ্রাবয়েৎ…' স্থলে তাহা হইলে ব্যাসদেবেরও অভিপ্রায় ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণ করানোই হয়। এবং ভাষ্যকারও গ্রন্থকারের প্রকরণগত মর্মার্থই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সর্ববিরোধের পরিহার হয়।

সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে যে মতবিরোধ প্রতীত হইতেছিল, তাহার পরিহার করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আশা করি পূর্বোক্ত বিচারসহায়ে উহা সুসাধ্য হইবে। কিন্তু এই মতে জাতিশূদ্রের আর স্বতন্ত্র কোন অধিকারই রহিল না। বেদপাঠ বা বেদশ্রবণ তো দূরের কথা, ইতিহাস (মহাভারত) পুরাণাদিও তাহাকে ব্রাহ্মণের পিছনে বসিয়াই শুনিতে হইবে। কি দুরদৃষ্ট! কিন্তু কি করা যাইবে, কঠোর সনাতনীদের রীতিই যে এইরূপ!

কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে জাগে। পুরাণ-বক্তা তো স্বয়ং সূত। জাতি হিসাবে তিনি বর্ণসংকর। ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে উৎপন্ন পুত্রই সূত নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তাহা হইলে পুরাণ-ইতিহাসবক্তা হইলেন কি করিয়া? তাঁহার তো প্রাচীন পন্থীগণের বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণের পিছনে দূরে বসিয়াই পুরাণ-ইতিহাস শ্রবণ করিবার কথা। এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সনাতনীগণ কি বলিবেন?*

---

* হরিদ্বার (কনখল) নিবাসী অধুনা ব্রহ্মলীন বুধাগ্রণী ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ-কথিত বিচারের আলোকে প্রবন্ধটি লিখিত। মহাভারতের শ্লোকসংখ্যাগুলি 'পুণা চিত্রশালা প্রেস' সংস্করণের।

'নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে'

স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বীয় দিব্যলীলা-নাটকের শেষ অঙ্কে কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে দুরারোগ্য রোগজীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কথা বলিতেও অক্ষম তখন একদিন ইঙ্গিতে লিখিয়া সমবেত ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন—'**নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে**'।

প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—'নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘরের'। স্বীয় শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র নরেন্দ্রকেই চিহ্নিত করিয়া তিনি একথাও বলিয়াছিলেন—'এত লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।' তাই দেখিতে পাই নিজের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ঠাকুরের কি বিপুল আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। তিনি পূর্বেই জানিতেন, নরেন্দ্রকে দিয়া জগতের অনেক কাজ হইবে। তাই আচার্যরূপে নরেন্দ্রনাথকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিতেও তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। নরেন্দ্র পাছে একঘেয়ে হইয়া যান, ঈশ্বরের অনন্ত ভাবরাশির দুটি একটি ভাবমাত্র লইয়াই পাছে নরেন্দ্র স্বীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিদ্বত্তা-প্রভাবে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাবিত হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ দল সৃষ্টি করিয়া বসেন, সেজন্য ঠাকুরের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

নরেন্দ্র শক্তি মানেন না। ভগবানের নামে প্রেমাশ্রুবিসর্জনাদি পুরুষপ্রবর নরেন্দ্রের নিকট পুরুষত্বের অবমাননা বলিয়া প্রতিভাত হইত। নরেন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজের ভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে যান, 'মা'-'মা' করেন। মার দিব্যদর্শনের কথা ভক্তগণসমক্ষে বলেন। নরেন্দ্র কিন্তু এসব বিশ্বাস করেন না। বলেন :—ও সব মাথার খেয়াল ; খেয়ালবশতঃ অনেকে ঐরূপ দর্শনাদি করে।

তাঁহার নরেন্দ্র কি শেষটায় একঘেয়ে হইয়া যাইবে? কেবল নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই লীন হইয়া থাকিবে? তবে তাহার দ্বারা লোকশিক্ষা হইবে কি করিয়া? জগতের সকলেই তো আর নিরাকার ব্রহ্মোপলব্ধির অধিকারী নয়? শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মাঝে মাঝে একটু চিন্তিত হন, কিন্তু বেশী নয় ; কারণ অতীন্দ্রিয় যোগশক্তি-প্রভাবে তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় নরেন্দ্র বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া লোক-কল্যাণার্থ জগতে অবতীর্ণ। সুতরাং কালে নরেন্দ্র লোকশিক্ষক হইবেই। তাই তিনি সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সাধারণ ফুল শীঘ্রই ফোটে এবং শীঘ্রই ঝড়িয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু পদ্মফুল দেরীতে ফোটে এবং থাকেও অনেকদিন। নরেন্দ্র যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'সহস্রদল পদ্ম'। তাই সে ফুলটি ফুটিতে একটু সময় লাগিবে বৈ কি!

দুঃখে পড়িলেই মানুষের প্রকৃত জীবন গড়িয়া উঠে। শত দুঃখের পেষণে নিষ্পিষ্ট মানব স্বীয় পুরুষকারসহায়ে যখন জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় তখনই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক্ বিকাশ ঘটিয়া থাকে। অশেষ দুঃখ-দারিদ্র্যই জীবনের প্রকৃত শিক্ষক। উহাতেই ধৈর্য, সহনশীলতা, আদর্শৈকনিষ্ঠতা ও হৃদয়ের সদ্গুণরাজির পরিপূর্ণ প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার সুখের মধ্যে বাস করিয়া সকলেই

উচ্চতত্ত্ব আলোচনা করিতে সমর্থ। কিন্তু দুঃখ যখন মানুষকে দিশাহারা করিয়া ফেলে, চারিদিকে কেবল হতাশার করুণ সুরই যখন কর্ণগোচর হয় তখন কয়জন জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যটিকে স্থির রাখিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন?—নরেন্দ্রের জীবনেও বোধ হয় দুঃখের পীড়ন এই জন্যই প্রয়োজন ছিল। ইহা ঈশ্বরেচ্ছাতেই ঘটিয়াছিল। ইহার অন্য প্রয়োজনও ছিল। ভবিষ্যতে যিনি আচার্য হইবেন, মানবজীবনের সর্ববিধ অবস্থার সহিত তাঁহার পরিচয় থাকা আবশ্যক।

নরেন্দ্রনাথ আজন্ম সুখে লালিতপালিত। হঠাৎ পিতৃবিয়োগে নরেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ অশেষ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইলেন। মা, ভাই, বোনদের অন্নসংস্থানের কোন উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ শত চেষ্টা করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত একটি কর্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। সুসময়ের বন্ধুরাও এই সংকটকালে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ। অনেকে শত্রুতাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। জ্ঞাতিরা পৈতৃক ভিটাটুকুও কাড়িয়া নিতে বদ্ধপরিকর। সংসার যে কত নীচ, ঘৃণিত, মানুষ যে কত স্বার্থপর, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় পাইলেন। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িয়া, অনাহারে দিন কাটাইয়াও কিন্তু তিনি স্বীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। জীবনের লক্ষ্য ভগবান লাভ—ইহা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। অপরের শত সমালোচনা, কটাক্ষ এবং প্রলোভনও তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অনেক কষ্টে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্মটি জুটিল। কিন্তু তাহাও বেশীদিন রহিল না।

অবশেষে নরেন্দ্র একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার মা-ভাইদের অন্নসংস্থান যাহাতে হয় সেজন্য মা-কালীকে বলিতে হইবে। ঠাকুর বলিলেন—'তুই মাকে মানিস না, তাই তো তোর এত কষ্ট।' ঠাকুরের কথায় অনুরুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্র মা-কালীর মন্দিরে গিয়াও মার নিকট অর্থাদি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

যেদিন নরেন্দ্র সাকারে বিশ্বাসী হইলেন, মাকে মানিলেন, সেদিন ঠাকুরের কি আনন্দ! পুনঃপুনঃ সমবেত ভক্তদের বলিতে লাগিলেন—"নরেন্দ্র মাকে মেনেছে, বেশ হয়েছে, না? কাল সারা রাত 'আমার মা ত্বং হি তারা'—এই গানটি গেয়েছে। এখন ঘুমুচ্ছে।" ঠাকুরের এত আনন্দের কারণ নরেন্দ্র এখন সাকারেও বিশ্বাসী হইয়াছেন। ঠাকুর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। স্বীয় সর্বভাবের পরিবাহক নরেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রকারে যোগ্য করিতে হইবে। সাকার নিরাকার উভয় ভাবেই বিশ্বাস রূপ উহারই সার্থক সূচনা দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের এত আনন্দ।

শ্রীম বলিতেন, "নরেন্দ্র কত কাজ করলেন। বক্তৃতা, প্রচার, মঠস্থাপন, কত কি। কিছুতেই আবদ্ধ হন নাই। কেন? পরমাত্মাকে জেনে করেছেন তাই। তাঁর হাতের যন্ত্র। আত্মদ্রষ্টাকেও তিনি ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন। নরেন্দ্র যদি সমাধিস্থ হয়েই থাকতেন তবে মায়ের কাজ করত কে? ভারত ও জগতের কল্যাণের জন্যই ঠাকুর তাকে কাজে লাগালেন।···

মঠ করা কেন? গুরুভাইরা কেউ কেউ এ প্রশ্ন করায় নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই মঠকে কেন্দ্র করে ভারত ও জগতের Regeneration হবে।' আমেরিকায় তিনি

যা করেছেন তা ঠাকুরেরই কাজ। ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সভ্যতাকে তিনি বীরদর্পে জগতে প্রচার করলেন।

ঠাকুর থাকতেও নরেন্দ্রের দুঃখ গেল না। দুঃখ শরীরের ধর্ম। উহা থাকবেই। তবে বিষয়ীদের মত কাবু করতে পারে না। অত দুঃখ পেয়ে তবেই না তিনি মহাপুরুষ হলেন? তাই পরে নরেন্দ্র বলেছিলেন: যারা দুঃখকষ্ট পায় নাই, তারা কি আবার মানুষ? ধনী, বিদ্বান, বুড়ো হলেও তারা Babies, Little babies. কত কষ্ট তিনি পেয়েছেন। আলমোড়ায় তপস্যায় বসেছেন। খবর গেল ভগ্নী আত্মহত্যা করেছে। তাকে খুব ভালবাসতেন। হৃষীকেশে প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না।"

নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, দুঃখের আগুনে না পুড়িলে মানুষ মহৎ হয় না। তিনি নিজেও দুঃখের আগুনে পুড়িয়াছিলেন। দুঃখের আগুনে, তপস্যার আগুনে পুড়িয়া খাঁটি সোনা হইয়াছিলেন। বিদেশেও তিনি যখন একাকী, সাহায্য করিবার কেহ নাই—তাঁহার বিরুদ্ধে শত ষড়যন্ত্র এবং নানা কুৎসিত অপবাদ রটনা করিতেও মিশনারীরা কুণ্ঠিত হয় নাই। বন্ধুরা সে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন: আমি কি এ সব ভয় করি? আমি জানি সংসারটা গোষ্পদজলতুল্য অতি তুচ্ছ, মিথ্যা; এ সব শিশুরা আমার কি করিবে? সত্যই জয়ী হইবে।

এই দুর্জয় সাহস, অপরিসীম মনোবল তিনি কোথা হইতে পাইলেন? ইহা তাঁহার আত্মানুভূতির শক্তি। সাধনসহায়ে ও গুরুকৃপায় তিনি অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং সদা সর্বব্যাপী চেতন সমুদ্রেই যেন তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। জগৎটা একটা মিথ্যা ছায়ার মত তাঁহার কাছে ভাসিত; তাই কোন আঘাতেই মুষড়াইয়া পড়িতেন না। উহাতে যেন তাঁহার অন্তরের শক্তি আরও অধিকতর বেগে প্রকাশ পাইত। তাই নির্ভীক অন্তরে তিনি বলিয়াছেন—

'ভাঙো মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও—বুঝ রহস্য পরম।
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
জেনো স্থির—আমি সেই, 'সোঽহং সোঽহম্।'

মুক্তির পথে সহস্র প্রতিবন্ধক আসিয়া সাধককে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়। দুর্বল মানব যাহাতে ভীত না হয় সেজন্য তিনি বলিতেছেন—

'রোষদীপ্ত মূর্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব—তুমি সে মহৎ
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।'

—এ যেন তাঁহার নিজেরই প্রথম জীবনের প্রতিকূল আবর্তমধ্যেও লক্ষ্যৈকনিবদ্ধদৃষ্টির একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি! তৎকালে স্বার্থপর সংসারের যে নগ্ন চিত্র তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে:

'দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার,
পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব,
হেথা কোথা শান্তির আকার?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়—
কেবা পারে ছাড়িতে সংসার?
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর,
সব মর্ম দেখেছি এবার;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক!

এ জগতে নাহি তব স্থান ;...
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ,
তবে পাবে এ সংসারে স্থান।'

সংসারবিষয়ে কি নিদারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতা! মনে রাখিতে হইবে এই অভিজ্ঞতা তাঁহার তখনই হইয়াছিল যখন তিনি ২০।২১ বছরের যুবকমাত্র। তারপর আসিয়াছিল তাঁহার তীব্র সাধনার জীবন। অনশনে অর্ধাশনে অলৌকিক তীব্র বৈরাগ্যবান্ নরেন্দ্রনাথ তখন সাধনার খরস্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সে সাধনার বর্ণনাও তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

'বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ,
অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন?'

এই অলোকসামান্য তপস্যাপ্রভাবে নরেন্দ্রনাথ কি তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন? তাঁহার নিজ মুখেই তাহা আমরা শুনিতে পাইয়াছি,—

'শোন বলি মরমের কথা,
জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর,
এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্রতন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম,
'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।
জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর,
ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট-অণুকীট,
এই প্রেম হৃদয়ে সবার।'

সর্বভূতে এক প্রেমময়ের সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্রনাথ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-লাভের জন্য বাল্যাবধি তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুল ব্যাকুলতার পর্যবসান এইরূপেই ঘটিয়াছিল। যে ব্যাকুলতা একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল উহাই তাঁহাকে এখন লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিল। সর্বভূতে এক প্রেমময়ের দর্শন—এক ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্বসাধনার শেষ কথা - ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন।

শ্রোত্রিয়ত্ব অর্থাৎ বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্বত্তা অলোকসামান্য মেধাবী নরেন্দ্রনাথের পূর্ব হইতেই ছিল। এখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠতা লাভ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল। লোকশিক্ষা দিবার আধারটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইল। নরেন্দ্রনাথ এখন আচার্যপদবীতে আরূঢ় হইলেন। সাধক নরেন্দ্রনাথ এখন আচার্য বিবেকানন্দ হইলেন। মৃত্যু, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, ধর্মাধর্ম—সবেতেই এক পরমাত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ এখন কৃতকৃত্য, স্বস্থ। আর কোন কর্তব্যই তাঁহার এখন অবশেষ নাই। তাই তখন তিনি ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া জীবশিক্ষাদানে ব্রতী হইলেন। ঈশ্বরপূজন—এই বুদ্ধিপূর্বক সর্ব-স্বার্থচিন্তারহিত হইয়া সর্বভূতে সেই প্রেমময়ের সেবা, ইহাই পরমার্থপ্রাপ্তির অত্যুৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন।

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করিয়াও স্বামীজী জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। নরনারায়ণের সেবায় নিজেকে তিনি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। সকলকে শিখাইয়াছেনও তাহাই :—

'ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।'

ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তখনই সাধকের হৃদয়ে আত্মজিজ্ঞাসা জাগে ও পরমার্থতত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়—ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের সুস্পষ্ট ঘোষণা। পূর্বপূর্ব যুগে চিত্তশুদ্ধির জন্য আচার্যগণ শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, অগ্নিহোত্রাদির কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিলুপ্তপ্রায়। এখন সে সব করিবার সুযোগ ও অবসর কাহারও নাই। তাই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যুগোপযোগী সাধনের বিধান করিলেন :

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীব-শিব, শিববুদ্ধিতে জীবসেবা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি কর—ইহার যুগাচার্যের অভিনব বাণী। এই মহান্ আদর্শটি নিজেও জীবন দ্বারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। নিষ্কাম সেবা দ্বারা ধন্য হইবার সুযোগ প্রদান করতঃ ঈশ্বরই সাধকের নিকট জীবরূপে উপস্থিত—এই জ্ঞানে সেবা করিতে পারিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তখন উপাসনায় পর্যবসিত। শ্রদ্ধার সহিত এই সাধনের দ্বারা হৃদ্গত সর্বপাপ, ভোগবাসনা ও চিত্তবিক্ষেপাদি দূর হইয়া গেলে সাধকের সাত্ত্বিক হৃদয় তখন শান্ত, অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে এবং অচিরেই ও অল্পায়াসেই বেদান্তবিদ্যার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে সাধক তখন কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুমুখে শ্রুত এই সাধন-রহস্যটি সকলের কল্যাণের জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বাচার্যগণের তুলনায় ইহা স্বামীজীর যুগোপযোগী একটি বিশেষ অবদান।

শ্রীম বলিতেন,—"সেবা শুধু খাওয়ান-পরান নয়। জীবকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জেনে ভালবেসে সেবা। যেমন মানুষ নিজের জনকে ভালবাসে, নিজেকে ভালবাসে। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মত অপরেরও করা। নিজের স্বার্থ, ভোগবুদ্ধি থাকবে না—তবে হল নিষ্কাম কর্ম। দেখ স্বামীজী কেমন ছিলেন। জগতে এত মান পেয়ে ফিরে এসে এক কৌপীন প'রে আছেন। সব দিয়ে দিলেন গুরুভাইদের। ভক্তদের লিখলেন—'আপনারা আমার খাওয়া-পরার জোগাড় করে দিন। আমি ভিক্ষা করে খাচ্ছি।' পূর্বের ন্যায় সেয়ারের গাড়ীতে পাঁচ পয়সা দিয়ে বরানগর যাতায়াত করলেন। খালি পা, হট্‌হট্‌ করে চলছেন।··· স্বামীজী কালিকম্‌লি-বাবার কথা বলতেন। বলতেন—'ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্মী ঐ একটি সাধুকে দেখেছি। চাঁদা করে লাখ লাখ টাকা তুললেন, তা দিয়ে উত্তরাখণ্ডের সব রাস্তাঘাট, ধর্মশালা, সদাব্রত করালেন। হৃষীকেশে সাধুদের জন্য অন্নসত্র। তিনি নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন. রুটি সেঁকতেন। অপর লোকও সাহায্য করত। সাধুদের সেই রুটি দিচ্ছেন। নিজেও সাধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই রুটি ভিক্ষা নিচ্ছেন। এদিকে উলঙ্গ। এক কালো কম্বল গায়ে। কাজ যখন ঠিক চলতে লাগলো তখন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। আজও তাঁর খোঁজ কেউ জানে না। এর নাম নিষ্কাম কর্ম। কোন আসক্তি নাই।'"

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা'

স্বামী ধীরেশানন্দ

গীতামাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে ঃ

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

গীতাই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য, অন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কি ফল?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন্ গীতাপাঠের কথা এখানে বলা হইতেছে? কারণ 'গীতা' তো বহু আছে—অবধূতগীতা, রামগীতা, শিবগীতা, পাণ্ডবগীতা, গুরুগীতা ইত্যাদি। উত্তরে বলা হইয়াছে ঃ যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।

—অর্থাৎ যে 'গীতা' পদ্মনাভ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাই স্বাধ্যায়-প্রবচন করা কর্তব্য। তাই ইহার নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। 'গীতা' ভগবানের গীত—ভগবানের স্বভাব সংসার-দুঃখাতুর, শতসংশয়াকুল জীবকে সদা সুমধুরস্বরে পরমানন্দধামের বার্তা গাহিয়া শোনানো। যে-কেহ ভাগ্যবান্, সেই শুনিতে পায়।

জীব সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া সদা শোকে মুহ্যমান, সদা ক্রন্দনে রত। শতদুঃখে কাতর হইয়া, শত দুর্দৈবের পাষাণচাপে পিষ্ট হইয়া, নিতান্ত অনন্যশরণ হইয়াই মানুষ ভগবানের শরণ লয় ও তাঁহার দিব্যগীত-শ্রবণে প্রয়াসী হয়। অর্জুনের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আসন্ন যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-মিত্র সকলের সম্ভাবিত নিধনাশঙ্কায় ভীত ও শোকগ্রস্ত হইয়াই অর্জুন ভগবানের শরণ লইয়াছিলেন ও এই দিব্যগীত-শ্রবণে অন্তিমে কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বিষাদের মধ্য দিয়াই অর্জুনের ভগবানের সঙ্গে যোগ হইল। তাই কি 'গীতা'র প্রথম অধ্যায়টির নাম—'বিষাদযোগ'? এবং 'গীতা'র প্রথমেই অর্জুনের বিষাদ বর্ণিত?

'গীতা' যদিও স্মৃতিশাস্ত্র, তথাপি ইহাতে সংগৃহীত বিষয়সমূহের গাম্ভীর্য ও সার্বলৌকিক উপাদেয়তা-দর্শনে ইহাকে শ্রুতিতুল্য সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

'ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে...... অধ্যায়ঃ॥'—এই পঙ্‌ক্তিটি বিচার করিলে গীতার বিষয়াদি অনেক তথ্য জানা যায়। পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতাকে 'উপনিষৎ' বলা হইয়াছে। যে তত্ত্বজ্ঞান যাবতীয় সংসার-দুঃখ মূল-অজ্ঞানসহ বিনাশকরত জীবকে পরমানন্দস্বরূপে—পরব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, তাহাই 'উপনিষৎ'। 'গীতা'ও তাই। 'গীতা' এখানে 'উপনিষৎ' শব্দের বিশেষণ। 'উপনিষৎ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। তাই বিশেষণ 'গীতা' শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশেষণদ্বারাই বিশেষ্যকে যখন বোঝানো হয়, তখন লোকে আর বিশেষ্যের প্রয়োগ করে না। এইজন্য শুধু 'গীতা' বলা হয়। 'গীতা' অর্থ যাহা গান করা হইয়াছে। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থে সুমধুর সুরে গান করিয়াছেন। তাই ইহার পুরা নাম 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষৎ'। সংক্ষেপে 'ভগবদ্‌গীতা' বা 'গীতা'। 'গীতা'তে ব্রহ্মবিদ্যাই আলোচিত হইয়াছে। কারণ শোক-মোহাদি সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহাই

একমাত্র উপায়। ইহাই 'যোগশাস্ত্র'—কর্মযোগের তত্ত্বজ্ঞাপক শাস্ত্র। 'গীতা'তে পুনঃ পুনঃ নিষ্কাম কর্মযোগের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে; উহাও ব্রহ্মবিদ্যারই অন্তর্গত। পুনঃ বলা হইয়াছে: 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'—শ্রীকৃষ্ণার্জুনের পরস্পর কথোপকথনরূপে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি নানা শাস্ত্রোক্ত সাধন, নানা রহস্যকথা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের রীতিতে রচিত হয় নাই। ইহা বন্ধুদ্বয়ের—গুরুশিষ্যের কথোপকথন; অর্জুনের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাহাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ভগবান্‌ও তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। সম্পর্কে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা—অর্থাৎ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। বাল্যাবধি উভয়ের পরস্পর প্রীতি অপরিসীম। অর্জুন ভগবান্‌কে—সমপ্রাণ সখারূপে, স্নেহময় ভ্রাতারূপে এবং গীতায় দেখিতে পাই তত্ত্বোপদেষ্টা গুরুরূপে—নানা ভাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। প্রিয় বন্ধুর প্রতি, একান্ত শরণাগত ভক্তশিষ্যের প্রতি ভগবানের প্রীতিময় এই জ্ঞানোপদেশ বড়ই মধুর। নানাপ্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের কথাই এখানে আদ্যন্ত আলোচিত। কখনও ভগবান্ বন্ধুভাবে অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, কখনও বা গুরুরূপে তাঁহাকে সাবধান করিতেছেন।

> 'নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে' (২।৩);
> 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' (২।১১);
> 'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি' (৪।৩);
> 'যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া' (১০।১);
> 'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি' (১৮।৫৮);
> 'যথেচ্ছসি তথা কুরু' (১৮।৬৩);
> 'প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে' (১৮।৬৫)।

—ইত্যাদি বহুস্থলে আমরা দেখিতে পাই, কখনও বন্ধুভাবে, কখনও বা গুরুভাবে ভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন।

অর্জুনের প্রশ্নেও এই দুই সম্বন্ধ সুস্পষ্ট।

> 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭);
> 'বুদ্ধিং মোহয়সীব মে' (৩।২);
> 'তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্' (৫।১);
> 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম' (১০।১৫
> 'দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্' (১১।৪);
> 'সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তম্' (১১।৪১);
> 'করিষ্যে বচনং তব' (১৮।৭৩)

—এইপ্রকার বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরজ্ঞানে, গুরুজ্ঞানে শরণার্থী হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, কোথাও বা প্রিয়সখার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন। গুরু-ভাষার গাম্ভীর্য ও বন্ধু-ভাষার মধুরতা—এই উভয় একত্র মিলিত হইয়া 'গীতা'র ভাষাকে এক অপরূপ আকার প্রদান করিয়াছে।

'গীতা' শ্রীকৃষ্ণের কষ্টকল্পিত রচনাবিশেষ নহে—আত্মযোগসমাহিত অবস্থায় উচ্চারিত। ইহা তাঁহার অনুভূতিসমুজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত বাণী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কালান্তরে অর্জুন পুনঃ ঐ উপদেশ শুনিতে চাহিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, 'যুদ্ধপ্রারম্ভকালে তুমি বিষাদগ্রস্ত ছিলে এবং আমিও আত্মসমাহিত ছিলাম—তাই তৎকালে ঐ উপদেশ আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। এখন তোমার ও আমার উভয়েরই সেই পূর্বাবস্থা আর নাই, তাই এখন আর সে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে।'—ইহা হইতেই 'গীতা'র মহত্ত্ব আমরা অনুমান করিতে পারি। কর্ষিত ভূমি ও উত্তম বীজের সম্মিলনে যেমন শস্যাদি উৎপন্ন হয়, গুরু ও শিষ্য উভয়ের

উপযুক্ততায় তদ্রূপ ধর্মতরু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্জুনের ন্যায় সর্বগুণাধার শিষ্য ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুরু একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, তাই আজ এই 'গীতা'রূপ তত্ত্বোপদেশ লাভকরত জগদ্বাসী ধন্য হইয়াছে।

'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'—সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গীতায় গ্রথিত। ভারত-সংস্কৃতির অমূল্য রত্ন 'গীতা' বিশ্বসংস্কৃতি-ভাণ্ডারের অপূর্ব শোভা বর্ধনকরত তাহাকে মহনীয় করিয়াছে।

'দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ'—গীতাকে দুগ্ধরূপ অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ঘৃত বা মাখন বলা হয় নাই। তাহার কারণ—যত লাভ দুধ হইতে হয়, ঘৃত হইতে তত হয় না। দুধ হইতে দধি-পনীরাদি—সব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। বাল্যাবস্থা হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত লোক দুধ খাইয়া পুষ্ট হয়। অর্জুনের হৃদয়েও বিবেকরূপী শিশুর জন্য ভগবান্ এই গীতারূপী দুগ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। গীতার বিষয়ে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন :

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্॥

—গীতাই ভগবানের আশ্রয়, গীতাজ্ঞানসহায়েই তিনি সকলের পালক ও পোষক। সমগ্র বেদ-বেদান্তপাঠে যে-জ্ঞান লাভ হয়, এক গীতাধ্যয়নেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে সেই ফল লাভ হয়। সর্ব বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী বিষয় ইহাতে পাওয়া যায়। গীতা সর্বতোমুখী।

গীতার আঠারোটি অধ্যায়। কেহ কেহ শঙ্কা করেন, 'কেন? আঠারোটি অধ্যায় কেন? সতেরো বা উনিশটি অধ্যায়ও তো হইতে পারিত?' ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন, 'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'—বিদ্যার অষ্টাদশ প্রস্থান। চার বেদ, চার উপবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—এই অষ্টাদশ প্রস্থানের সারাংশ লইয়া রচিত বলিয়াই গীতার অধ্যায়-সংখ্যা আঠারো, তন্ন্যূন বা তদধিক নহে। অর্জুন যেন সমগ্র মানবজাতির প্রতীক। প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়াই ভগবান্ সকলের কল্যাণের জন্য যোগসমাহিত চিত্তে এই অমূল্য উপদেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধর, আবার চক্রধরও বটেন। তিনি কেবল প্রেমের বাঁশী বাজাইয়া ব্রজবাসিগণের মনোহরণ করিয়াই আপন কর্তব্য সমাপন করেন নাই, সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়া অর্জুনপ্রমুখ সকলকে অধর্ম অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও উৎসাহিত করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল কর্মোদ্যমের মধ্যেও আত্মনিষ্ঠ প্রশান্তি—এই কর্মযোগ, এই অনাসক্তিযোগই নিজ জীবনে প্রকৃষ্ট আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অনাসক্তিযোগ-অভ্যাসে শত বিপদ্ ও ভোগের মধ্যেও পুরুষ অবিচলিত থাকেন, সাংসারিক সর্ব কর্ম করিয়াও তিনি অন্তরে নিঃস্পৃহ শান্ত সমাহিত থাকেন। কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি-জনিত সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

শিকারে বহির্গত ঘোর জঙ্গলে পথভ্রান্ত এক রাজা বনমধ্যে নিবাসকারী এক মহাত্মার আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মাও তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য রাজতুল্য ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর রাজা বলিলেন যে, এখন তাঁহার ও মহাত্মার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। মহাত্মা উত্তর দিলেন, 'চল রাজন্, আমরা আবার সেই জঙ্গলে যাই।' কিন্তু ভোগাসক্ত রাজার সে সামর্থ্য কোথায়? তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কিন্তু তখনই তাঁহার সেই কন্থা-কমণ্ডলু লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজ্য ঐশ্বর্য—সব পড়িয়া

রহিল। দেখাইলেন—পার্থক্য কোথায়!

এইরূপ বৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোকিত। অত সাধের, অত প্রিয় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য তিনি মথুরায় চলিয়া গেলেন। কংসবধের পর মথুরারাজ্য স্বীয় করতল-গত হইলেও উহা তিনি তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানকরত কংসের পিতা উগ্রসেনকেই সেই রাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। দ্বারকাতে রাজ্য স্থাপন করিয়াও তিনি নিজে রাজা হইলেন না। জরাসন্ধ বধ করাইয়া মগধরাজ্যও তিনি নিজে গ্রহণ করেন নাই, জরাসন্ধপুত্র সহদেবকেই সেই রাজ্য প্রদান করিলেন। সহদেব-প্রদত্ত অপরিমিত ধনরত্ন রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিলেন। ময়দানবকে দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না। এই সবই শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্য বা অনাসক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণের অনাসক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ—যদুবংশনাশ। সমর্থ হইয়াও তিনি স্বকুলরক্ষণার্থ কোন প্রচেষ্টা করিলেন না। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহারই সবলভুজদ্বয়রক্ষিত, আশ্রিত যদুকুল ধনমদে মত্ত ও ঐশ্বর্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজে ধরাধাম হইতে বিদায় লইবার পর ইহারা সকলের ভীতিস্বরূপ হইয়া পড়িবে ও সাধুজন নিগৃহীত হইবে। তাই ধন, অসংযত ভোগ ও ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি যে বিনাশ—এই আদর্শও তিনি লীলাসংবরণের পূর্বে দেখাইয়া গেলেন। অদৃষ্টের সুনিয়ন্ত্রিত বিধানে তাঁহার সম্মুখেই যদুকুল বিনষ্ট হইল। এই সব দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ধীর, শান্ত, নির্বিকার ও অনাসক্ত।

সর্বাবস্থাতেই তিনি অবিচলিত। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বিশেষত্ব। গীতায় যে অনাসক্তি-যোগের কথা তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—তাঁহার নিজের জীবন। দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার নিত্য-নিয়মিত জপ, সন্ধ্যাবন্দনা, হোম, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণপূজন ইত্যাদির কখনও ব্যতিক্রম হইত না। ভগবদারাধনা, ব্যতীত শুধু কর্মদ্বারা কখনও মানবজীবন সার্থক হয় না। কর্ম ও উপাসনা একত্র অনুষ্ঠেয়। অনুগত ভক্ত শিষ্য অর্জুনকেও তিনি তাই বলিলেন :

> 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (৮।৭)—হে অর্জুন! তুমি আমাকে সদা স্মরণ কর ও স্বীয় কর্তব্য অনলসভাবে করিয়া যাও।

—এই উপদেশ তিনি নিজেও পালনকরত আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন।

গীতার পটভূমিটিও বড় সুন্দর, অপূর্ব। উহার মধ্যেও আমরা কিছু রহস্যের সন্ধান পাই। গীতার উদ্ভবস্থল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-প্রাঙ্গণ। যুদ্ধকামী বিবদমান দুটি পক্ষ পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দণ্ডায়মান। সর্ববিধ্বংসী কালসমর আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। কেবল সঙ্কেতের অপেক্ষা মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি। এমন সময় অর্জুন বলিলেন : 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।' (১।২১)

—হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর। কারণ সেখান হইতেই অর্জুন যুদ্ধকামী সকলকে দর্শন করিবেন। সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথ চালিত করিয়া দুইদলের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিলেন। দুই দলের মধ্যস্থলে যে ভূমিখণ্ড, উহাকে নিরপেক্ষ-ভূমি (Neutral Zone) বলা হয়। এখানেই সংঘটিত হইল গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তররূপী কথোপকথন। আসন্নস্বজনবধ-ভয়ে ভীত অর্জুনের যে প্রশ্ন, তাহা সকল অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাসুরই অন্তরের

চিরন্তন প্রশ্ন। উহা কেবল অর্জুনের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—এই মাত্র। উহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাহা বলিয়াছেন—তাহাই 'গীতা'। গীতার কথন ও শ্রবণ সবই হইয়াছে এই নিরপেক্ষ-ভূমিতে। কোন দলের মধ্যে বসিয়া ভগবান্ উপদেশ দেন নাই, এবং অর্জুনও ঐভাবে শোনেন নাই। গীতার উপদেশ আমাদেরও শুনিতে হইবে—অর্জুনের ন্যায় নিরপেক্ষ-ভূমিতে দাঁড়াইয়া ; তবেই ইহা ফল প্রসব করিবে। মনকে রাগদ্বেষ, অহংতা ও মমতা রহিত করিয়া নিরপেক্ষ করিতে হইবে তবেই গীতাশ্রবণ সার্থক হইবে। অভিমানাচ্ছন্ন হইয়া, স্বীয় পরকীয় -এই ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকিলে গীতার মর্ম উপলব্ধি হইবে না। অর্জুনও যখন অভিমানরহিত হইয়া নিরপেক্ষ হইয়াছিলেন, তখনই গীতাতত্ত্ব তাঁহার চিত্তমধ্যে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অন্তে

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা···করিষ্যে বচনং তব।'

—আমার মোহান্ধকার অপসৃত হইয়াছে, আত্মস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। হে মধুসূদন! এখন আমি তোমার আদেশ অকুণ্ঠচিত্তে পালন করিব।

—এই কৃতকৃত্যতার ধ্বনি তাঁহার কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যোগ-সমাহিতচিত্তে অসঙ্গ নিরপেক্ষ আত্মস্থ হইয়াই উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতার পটভূমি—রণ-মধ্যভূমি—এই রহস্যেরই ইঙ্গিত দিতেছে। চিত্তে নিরপেক্ষ, সর্বপ্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ ও ব্যবহারের প্রতি উদাসীন ভাব আনয়ন করিতে না পারিলে অন্তরে ধর্মভাব বিকশিত হয় না, অন্তর্নিহিত অসঙ্গ আত্মার স্ফুরণ হয় না।—গীতার সবই মহত্ত্বপূর্ণ।

বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যায়, যাবতীয় ভেদজ্ঞানই দুঃখের কারণ। অনাত্মীয় ভাব হইতেই শত্রুতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশ্ব-বন্ধুত্বের প্রথম সোপান—আত্মীয়ভাব। অনাত্মীয়-ভাব দূর না হইলে সংসার হইতে হিংসাত্মক সর্বধ্বংসী যুদ্ধও দূর হইবে না। এই অনাত্মীয়-ভাব হইতেই মহাভারতে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের সূচনা। গীতার প্রথম শ্লোকেও ইহাই সূচিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥

—এই প্রশ্নটি দেখিয়াই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মহাভারতের সর্বসংহারী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ যে চক্রবর্তী রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যিনি বংশের প্রধান—**'মামকাঃ'** দুর্যোধনাদি আমার ও **'পাণ্ডবাঃ'** যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতার পুত্র, তাঁহারা ভিন্ন, আমার নহে—এরূপ ভেদবুদ্ধি রাখিতেন, স্বপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে এক সমদৃষ্টিতে দেখিতেন না, সেখানে ক্ষত্রিয়কুলবিধ্বংসী সমরানল প্রজ্বলিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ধৃতরাষ্ট্র কেবল চর্মচক্ষুবিহীন ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুরও অভাব ছিল এবং সে জন্যই তিনি এই প্রকার অনাত্মীয় ভাব পোষণপূর্বক স্বপরবিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। একতা আত্মীয়ভাব ভিন্ন সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

গীতাদি সর্বশাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, সমজ্ঞানেই পরম শান্তি। সমগ্র বিশ্বকে আপন স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিলেই রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সকল প্রাণীই আমার রূপ, সর্বপদার্থই স্ব-স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলে নিজের সঙ্গে তো আর কেহ রাগ-দ্বেষ করিতে পারে না?

'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।'

—আপন, পর—এই ভেদবুদ্ধি নীচবুদ্ধি লোকেরই হইয়া থাকে।

'উদারচরিতানাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্।' —উদারচিত্তগণের নিকট সকলেই আপন।

ভেদজ্ঞান হইতেই দুঃখ, রাগ, দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুরদাস তাঁহার কোন পদে গাহিয়াছেন যে, চতুর্দিকে দর্পণশোভিত কক্ষে প্রবিষ্ট কুকুর যেমন সর্বতঃ আপন প্রতিবিম্বসমূহ দর্শনকরত দ্বেষাবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, এই সংসারে জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। মায়ারূপ দর্পণে আপন প্রতিবিম্বসমূহ দর্শন করিয়া জীবও রাগদ্বেষদ্বারা অভিভূত হইয়া জীবনে কত বিসদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সারমেয়সদৃশ আচরণ কখনই শোভনীয় নহে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও রাগদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার ইতর প্রাণীতেও দৃষ্ট হয়। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় বিবেক-বিচারাদি-সহায়ে পরমার্থবস্তুর প্রাপ্তিতে। গীতা সেই মার্গেরই সন্ধান দিয়াছেন। পরমতত্ত্বজ্ঞানেই যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ। লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়, কোন দুর্বল ব্যক্তি আপন জ্ঞান-বিচারসহায়ে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী, অপর সরল ব্যক্তি জ্ঞানহীন হওয়াতে দারিদ্র্য-পীড়িত। লৌকিক জ্ঞানেরই যখন এরূপ মহত্ব ও আদর, তখন অলৌকিক ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের মহত্ব সহজেই অনুমেয়। জ্ঞান অমূল্য নিধি।

অর্জুন গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী। ইহার অর্থ এই যে, যতটুকু নিদ্রা প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই তিনি নিদ্রা যাইতেন। লোকে অতিনিদ্রায় বৃথা আয়ুক্ষয় করে, কিন্তু নিদ্রা অর্জুনকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই; অর্জুনই নিদ্রাকে বশে রাখিয়াছিলেন। এই-প্রকার জিতেন্দ্রিয় সর্বপ্রকার দৈবীসম্পদ্‌সম্পন্ন অর্জুনেরও যুদ্ধপ্রারম্ভে মোহাবিষ্টতা ও ভয় বিস্ময়কর বটে! সময়বিশেষে সকলেরই চিত্ত এইপ্রকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। অর্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন :

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭) —আমি শরণাগত শিষ্য, আমাকে কর্তব্য নির্দেশ করুন। কিন্তু পরেই আবার বলিতেছেন—'ন যোৎস্যে' (২।৯)—আমি যুদ্ধ করিব না। যখন তিনি নিজেই স্থির করিয়াছেন যে যুদ্ধ করিবেন না, তখন 'আমি প্রপন্ন, আমার কি কর্তব্য, তাহা নির্দেশ দিন'—এরূপ বচন পরস্পর বিরোধী। নিজেই যখন কর্তব্য স্থির করিলেন, তখন আর শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয় —অর্জুনের বুদ্ধি ব্যাকুল, বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত, মোহগ্রস্ত।

'তূষ্ণীং বভূব হ' ২।৯—ইহা যথার্থ তূষ্ণীম্ভাব, মৌনভাব নহে। যুদ্ধচেষ্টা হইতে অর্জুন বিরত হইয়া বাহ্যতঃ মৌন হইলেন বটে, কিন্তু অন্তর তাঁহার অতি বিক্ষিপ্ত। স্বজনবধ-আশঙ্কায় শোকাকুল। এই শোক, মোহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিরূপে?—ইহারই উপায় গীতা বলিতেছেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়টি উপোদ্‌ঘাতমাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'—হইতে আরম্ভ করিয়া 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য……মা শুচঃ' (১৮।৬৬)—পর্যন্ত সমগ্র গীতাতেই মানুষকে শোকরহিত করিবার উপায় বলা হইয়াছে। আদিতে 'অশোচ্যান্' ও অন্তে 'মা শুচঃ' বলায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই অবগত হওয়া যায়।

গীতার বাণী—'মা শুচঃ'—শোক করিও না। শোক হয় মোহ হইতে। অর্জুনের আত্মীয়-স্বজনবিষয়ে মোহ ছিল, তাই তিনি শোকাকুল হইয়াছিলেন। বহুবিদ্যা, পাণ্ডিত্য, বহুগুণ, বিদ্যমান থাকিলেও শোকনিবৃত্তি হয় না। ছান্দোগ্য-উপনিষদে 'নারদ-সনৎকুমার'-সংবাদে

ইহা সুস্পষ্ট। অশেষ বিদ্যা অর্জন করিয়াও নারদ শোকরহিত হইতে পারেন নাই এবং সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন—'আমি বহু বিদ্যাধ্যয়নদ্বারা কেবল মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি, এখনও আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। একমাত্র আত্মবিৎই শোকরহিত হইতে পারেন। হে ভগবন্! আপনি শোকগ্রস্ত আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান।' (ছাঃ উপঃ ৭।১-৩)

শোকের কারণ মোহ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন এই মোহ অন্য কোন উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে না। গীতার ২।১১-৩০ শ্লোক পর্যন্ত শোকনিবৃত্তির উপায় আত্মজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। যখন এই উপদেশ ধারণা-করত অর্জুন শোকবিমুক্ত হইতে পারিলেন না, তখন ভগবান্ তাঁহাকে নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কর্মযোগের আদর্শ ভগবান্ নিজে কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গণেও দেখাইয়া গিয়াছেন। সংগ্রাম স্থলের তুমুল উত্তেজনার মধ্যে শান্তচিত্তে সমাহিতভাবে গীতামৃত বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন; সংসারে থাকিয়া, সর্ব কর্ম করিয়াও মনকে সংসারের ঊর্ধ্বে রাখিতে হইবে—ইহাই অনাসক্তিযোগ। এই নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মযোগই গীতার প্রধান শিক্ষা। কুরুপাণ্ডবগণের সেনামধ্যস্থলে যেমন অর্জুনের রথ উপস্থাপিত, সেইরূপ মানবের জীবনরথটিও আসুরী ও দৈবীসম্পদ্রূপ সেনার মধ্যস্থলে বিরাজমান। আসুরী সেনার বিনাশের জন্য ভগবানের উপদেশ:

'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে সর্বদা ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ করিয়া আসুরী সেনা পরাজিত কর। এই যুদ্ধেও বিজয়ী হইয়া অর্জুন জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গীতোপদেশ চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত না হওয়া পর্যন্ত অর্জুন বিগতমোহ হইতে পারেন নাই। অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই অর্জুন অন্তে বলিয়াছিলেন: নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা...' (১৮।৭৩)—হে মাধব! তোমার কৃপায় এখন আমার অজ্ঞানজনিত মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, আত্মস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। এখন আমি ছিন্নসংশয়। নিশ্চিন্তে আপন কর্তব্য করিয়া যাইব।—সংসারশোকনিবৃত্তির জন্য গীতোপদেশ অনুষ্ঠান অপরিহার্য।

আচার্য বলিয়াছেন—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।'—যে বিদ্যা বা জ্ঞান মুক্তির কারণ, তাহাই যথার্থ বিদ্যা। জ্ঞানতুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' (৪।৩৮)

জ্ঞান মানবজীবনকে পরম পবিত্র করিয়া থাকে, মানবের সংসার-বন্ধন ছিন্নকরত তাহাকে ভূমা-য় ব্রহ্মরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

'পবেঃ সংসাররূপাৎ বজ্রাৎ ত্রায়তে রক্ষতি ইতি পবিত্রম্'—সংসাররূপ 'পবি' অর্থাৎ বজ্রপাত হইতে রক্ষাকর্তাকে 'পবিত্র' বলে। উহা তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞানই মহাপবিত্র বস্তু। সংসার দুঃখরূপ—'দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ' (যোগদর্শন ২।১৫)।

বিচারশীল বিবেকী সংসারকে দুঃখময় বলিয়াই জানেন। একমাত্র আত্মজ্ঞানই এই দুঃখ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে পারে, তাই ভগবান্ গীতায় প্রথমেই অর্জুনকে আত্ম-তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সর্বশেষেও তাহাই বলিলেন—'মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮।৬৬)—তুমি মদেকশরণ হও। 'মাং' পদের সহিত 'একম্' পদ সংযোজিত হওয়াতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সর্বভূতের নিয়ন্তা সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর সর্বত্র একইরূপে বিরাজিত। হে অর্জুন! তুমি সেই এক পরমাত্মাতেই মনোনিবেশ কর। তোমার সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' (১৮।৬৬)—অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির যাবতীয় শুভাশুভ ব্যবহার—যাহা তুমি এতকাল ভ্রান্তি-বশতঃ আত্মাতে আরোপ করিতেছিলে, তাহা পরিত্যাগ কর। মিথ্যা ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম ইন্দ্রিয়াদিতেই নিক্ষেপকরত সর্বদ্বৈত-নিবৃত্তিপূর্বক তুমি আমার শরণাগত হও অর্থাৎ স্বাভিন্নরূপে আমাকেই অবগত হও। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহাই শেষ উপদেশ।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্

স্বামী ধীরেশানন্দ

করারবিন্দেন পদারবিন্দং
মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্।
শ্রীমদ্‌যশোদাংকগতং প্রসন্নং
বালং মুকুন্দং শিরসা নমামি॥

ভাগ্যবতী মাতা যশোদার অংকশায়ী ও করকমলদ্বয়দ্বারা অরবিন্দসদৃশ চরণের অঙ্গুষ্ঠ স্বীয় মুখপদ্মবিবরে স্থাপনকারী, আনন্দবিগ্রহ, বালমূর্তি, মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভূলুণ্ঠিত-মস্তকে বারংবার প্রণাম করি।

শ্রীগোবিন্দপাদার্পিতচিত্তা কোন ভাগ্যবতী গোপাঙ্গনা আপন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

শৃণু সখি! কৌতুকমেকং
নন্দনিকেতাঙ্গনে ময়া দৃষ্টম্।
ধূলিধূসরিতাঙ্গো
নৃত্যতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ॥

হে সখি! শোন, নন্দের গৃহাঙ্গনে আমি এক পরম আশ্চর্য বস্তু দর্শন করিয়াছি। দেখিলাম, সেখানে সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সচ্চিদানন্দঘন নির্বিশেষ পরব্রহ্ম স্ব-মায়ায় বালবিগ্রহধারণকরতঃ ধূলি-ধূসরিতাঙ্গে মনোহর নৃত্যাদি ক্রীড়া করিতেছেন।

অন্য গোপী বলিতেছেন—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহীনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ! উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥
(ভাগঃ ১০ পূঃ৩১।৪)

হে প্রাণসখা! তুমি কেবল গোপিকানন্দন নহ, তুমি সর্বপ্রাণীর অন্তর্যামী পরম পুরুষ। ব্রহ্মাদি দেবগণের ভীতিব্যাকুল প্রার্থনায় ভূভার হরণ করিবার জন্য, হে নাথ! তুমি যাদবকুলে আবির্ভূত হইয়াছ।

গোপীগণের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। স্বমায়ায় তিনি নরাকারে অবতীর্ণ। গোপিকা-গণের এরূপ কথন কি কেবল প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের প্রগাঢ় প্রেমজনিত নিরর্থক উচ্ছ্বাস মাত্র?

গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিতেছেন—

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্' (১৪।২৭)—আমি বেদান্তোক্ত শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের ঘনীভূত বিগ্রহ, প্রতিমা। পুনরায় বলিতেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (৯।১১)

আমি পরমেশ্বর, অন্তর্যামী- আমার এই স্বরূপ জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে ক্ষুদ্র মনুষ্যমাত্র কল্পনা করিয়া থাকে।

অনেকেই এরূপ ভাবিতে পারেন। ভাবিতে পারেন, ইহা নিছক আত্মস্তুতি মাত্র। সামান্য, সাধারণ মনুষ্য নিজের মহত্ত্ব প্রকট করিবার জন্য নিজেই নিজের স্তুতি করিয়া থাকে ও তদনুগামি-গণও তাহার প্রশংসায় মুখর হয়। অনেকে ভাবিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজে এবং তাঁহার অতুলনীয় রূপ- ও গুণ-মুগ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণও হয়ত তাহাই করিয়াছেন। কঠোর সমালোচক হয়ত বলিবেন—'দম্ভ ও দর্প মানবের সাধারণ দুর্বলতা। আর ভক্তগণের কথা? নির্বিচার ভক্তি ও ভালবাসায় চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। যথার্থ বিচার-দৃষ্টি প্রতিবন্ধ হয়। সুতরাং কোন্ ভক্ত কি বলিয়াছে তাহাই প্রমাণবাক্যরূপে গ্রহণ করা সমীচীন নহে'—ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের জীবনী-

সহায়ে এই বিষয়ে একটু গভীর আলোচনা করিয়া দেখিলে এরূপ ধারণা আর থাকিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ কি সাধারণ বা সর্বোচ্চ মানব, অথবা অবতার অথবা সাক্ষাৎ ভগবান্? ভারতের সর্বত্র তিনি ভগবদ্‌জ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা কি অন্ধপরম্পরামাত্র? এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। তিনি অবতার বা সর্বোচ্চ মানবমাত্র নহেন। তাঁহাকে সাধারণ মানবমাত্র বলা তো ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মানুষ যতই জ্ঞানলাভ, যোগাভ্যাস বা কর্ম করুক না কেন, তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না বা পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সর্বদিকে আদর্শ, তিনি লীলাপুরুষোত্তম।

'ভগবান্' শব্দটির অর্থ কি? অভিধানে 'ভগ' শব্দের অর্থ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥

—অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি পরিপূর্ণ গুণ 'ভগ' শব্দদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। অতিদুর্লভ এই গুণ সমুদয় একাধারে যাঁহাতে প্রকৃষ্টরূপে বিকশিত, তিনিই ভগবান্। মানুষে ইহাদের দুটি-একটির প্রকাশ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। সকলগুলির একত্র-সমাবেশ কখনও দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে পূর্বোক্ত গুণগুলির পরিপূর্ণ প্রাকট্য দৃষ্টিগোচর হয় কিনা, উহাই এক্ষণে আমাদের বিচার্য।

প্রথমতঃ **(১) ঐশ্বর্য**ঃ—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিবিধ ঐশ্বর্যশালী পুরুষ আজ পর্যন্ত ধরাবক্ষ অলঙ্কৃত করে নাই। তাঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য কোন মানবে হওয়া অসম্ভব। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবন অলৌকিক ঐশ্বর্যপরিপূর্ণ। জন্মকালে তিনি স্বীয় জনক-জননীকে যে ঐশ্বর্য দেখাইয়াছিলেন তাহা দর্শনকরতঃ প্রিয়-পুত্রকে তাঁহারা পরমেশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শৈশবে ও বাল্যে অবলীলা-ক্রমে সর্বলোকবৈরী অগণিত দানব-বিনাশ তাঁহার অমানবী শক্তির—ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। গিরিগোবর্ধন ধারণকরতঃ তিনি ভীত ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন; অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মার গর্ব খর্ব করতঃ বাল্যকালেই তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য সর্বজনসমক্ষে প্রকটিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার অতুলনীয় রূপও একটি ঐশ্বর্য। অমন রূপ মানুষের হয় না। 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' (ভাঃ ১০।৩২।২)—সাক্ষাৎ কামদেবেরও মনোমোহনকারী অলৌকিক দৈহিক রূপ লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। সে স্নিগ্ধ রূপের আলোকে সকলেই আকৃষ্ট হইত। কামগন্ধ-বিহীন সেই দিব্যরূপসুধা পান করিয়া সকলে দেবজনদুর্লভ প্রেমলাভকরতঃ অমৃতত্বের অধিকারী হইত। এই রূপে আকৃষ্ট হইয়া গোপীগণের কামও বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। ('গোপ্যঃ কামাৎ'……ভাঃ ৭।১।৩০)। ঐ রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া সকলে প্রাণে পাইয়াছিল পরম আনন্দ, শান্তি ও কৃত-কৃত্যতা। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তিনি ছিলেন তাহাদের ক্রীড়াসঙ্গী।

গোপীগণসহ পূর্ণিমারজনীতে জ্যোৎস্না-বিধৌত যমুনাকূলে তিনি যে অলৌকিক রাসনৃত্যলীলা করিয়াছিলেন, উহাও তাঁহার যোগৈশ্বর্য ও পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করে। উহা কামজর্জরিত-চিত্ত প্রাকৃত জনের নিন্দিত কামবিলাসমাত্র কখনই নহে। এই লীলাদর্শনে স্বয়ং কামদেবও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

'সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ'
(ভাঃ ১০।৩৩।২৫)—
পূর্ণ উর্ধ্বরেতা হইয়া তিনি রাসনৃত্য-লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলায় কাম তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারে নাই। দুর্বল মানব এই অবস্থা কল্পনাও করিতে পারে না। শাস্ত্রে 'অসিধার' ব্রতের উল্লেখ আছে। সর্বগুণান্বিত যুবা পুরুষ সর্বসুলক্ষণা যুবতী স্ত্রী সহ যদি কামভাব পরিত্যাগকরতঃ সদা প্রসন্নচিত্তে বাস করিতে পারে, তাহাকে 'অসিধার' ব্রত কহে। নিয়ত ঘূর্ণ্যমান শাণিত তরবারির নিকট অক্ষত দেহে অবস্থানের ন্যায় এই 'অসিধার' ব্রত অতি দুঃসাধ্য। প্রতি পদেই বিপদের সম্ভাবনা। সহস্র 'অসিধার'-ব্রততুল্য এই রাসলীলা। মহাযোগী ব্যতীত আর কে এইরূপ করিতে সমর্থ?

একই কালে বহু সহস্র গোপীগণসহ বিহার —ইহা কি কোন মনুষ্যে সম্ভব? রাসলীলা কালে যোগমায়ার ঐশ্বর্যে ষোড়শ সহস্র গোপী ও রাখাল তিনি সৃষ্টি করিলেন। রাসলীলা অন্তে রাত্রিশেষে কিছুই অবশেষ থাকে নাই। বিনা উপাদানে যোগমায়াবলে তিনি ঐ বিচিত্র সৃষ্টি করিলেন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ মহা যোগৈশ্বর্যবান।

বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অলৌকিক কর্ম করিয়াছেন উহা তাঁহার ঐশী শক্তিরই বিকাশ; ভেল্কিবাজি নহে। তৎকালে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষগণও তাঁহার ঐশ্বরীয় লীলায় বিশ্বাস করিতেন। ভীষ্ম তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছেন—

নমস্তে ভগবন্ কৃষ্ণ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ।
ত্বং হি কর্তা হৃষীকেশ সংহর্তা চাপরাজিতঃ॥
(মহাভাঃ শাঃ পঃ ৫১।২ রাজধর্ম)

—হে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সর্বলোকের উৎপত্তি ও প্রলয়ের অধিষ্ঠান, তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ! তুমিই জগতের সৃষ্টি- ও সংহার-কর্তা। তুমি অপরাজেয়। আবার—

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু॥
(ভাগঃ ১।৯।১৮)

—আপন মায়ায় সকলকে মোহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। ইনি ভগবান্, সাক্ষাৎ আদি নারায়ণ।

নারদাদি মহর্ষিগণও শ্রীকৃষ্ণের ঐশী ঐশ্বর্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। দুর্যোধনও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে স্তুতি করিয়াছেন। যথা—

স হি পূজ্যতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং বিদিতং মম সর্বথা॥
(মহাভাঃ উঃ ৮৮।৫)

—বিশাললোচন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমপূজনীয়, ইহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি।

শ্রীকৃষ্ণ লোকোত্তরপুরুষ এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন।

পুণ্য ভারতভূমি তখন অধর্ম ও অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ সকলের নিপীড়নে কাতর হইয়া বিশ্বস্রষ্টার চরণে মূক আর্তি জানাইতেছিল—ইহাও শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তখন তিনি অধর্মের প্রভাব দূর করিতে প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মধুর গোকুল ও বৃন্দাবনে তখন কেবল বংশীবাদনেই তিনি কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। তাঁহার বৃন্দাবনলীলা ফুরাইল। অত্যাচারী নৃপতি-বর্গের উচ্ছেদার্থে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আয়োজন হইল এবং বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে দিয়াই তিনি এ কার্য করাইলেন। স্বীয় ঐশী শক্তি দ্বারাই এ কার্য সম্পাদন করিলে আমরা তাঁহার

পরিপূর্ণ চরিত্রটি দেখিতে পাইতাম না ; সখা ও ভক্ত অর্জুনের মহিমাও পূর্ণরূপে খ্যাপিত হইত না।

ঐশী ঐশ্বর্যের বিকাশ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ভূরিভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার তিরোধানের পর বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যাদব রমণীগণের রক্ষণেও সমর্থ হইলেন না। স্বকীয় গাণ্ডীব ধনুটি পর্যন্ত তিনি উত্তোলনে অসমর্থ, প্রভূত অস্ত্রবিদ্যা বিস্মৃত। কৃষ্ণের শক্তিতেই তিনি এতকাল এত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন। সে শক্তি স্বধামে গমন করিয়াছেন—তাই অর্জুন শক্তিহীন। রথের অগ্রভাগে শংখচক্রগদাপদ্মধারী যে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি অর্জুন সদা দর্শন করিতেন, তাহাও তাঁহার লোচনপথ হইতে তিরোহিত। যুদ্ধক্ষেত্রে কত অলৌকিক উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণও আমরা মহাভারতে পাইয়া থাকি। ইহা তাঁহার মানবীয় শরীরে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অমানবীয় ঐশ্বর্যে দৃঢ়-বিশ্বাসী ও তজ্জন্য তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত। স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্যবেধকালেও দেখিতে পাই, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধনুর্গ্রহণকরতঃ লক্ষ্যবেধপূর্বক পাঞ্চালীকে লাভ করিলেন—

প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্।
কৃষ্ণং চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জুনো ধনুঃ॥
(মঃ আঃ ১৮১।১৮)

মৃত গুরুপুত্রের পুনর্জীবনদান ও অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে উত্তরার গর্ভস্থ নিহত শিশু পরীক্ষিৎকে পুনরুজ্জিবীকরণ—এ সকলও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ঐশ্বর্যের পরিচায়ক।

জয়দ্রথবধকালে সহসা যোগবলে সূর্যমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া অর্জুনকে দিয়া তিনি জয়দ্রথ-বধ করাইলেন ; অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল—

ততোঽসৃজৎ তমঃ কৃষ্ণঃ সূর্যস্যাবরণং প্রতি।
যোগী যোগেন সংযুক্তো যোগীনামীশ্বরো হরিঃ॥
(দ্রোণ-পর্ব ১৪৬।৬৭, ৬৮)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে অর্জুন প্রথম রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবামাত্রই সমগ্র রথ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দ্রোণ ও কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহের অব্যর্থ প্রভাব বাসুদেব এতদিন স্বীয় ঐশী শক্তিদ্বারা প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বকার্যসমাপনান্তে সে শক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ নিজের মধ্যে উপসংহার করিয়া লইবামাত্র রথ ভস্মে পরিণত হইল—

স দগ্ধো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈ মহারথঃ।
অথাদীপ্তোঽগ্নিনা হ্যাশু প্রজজ্বাল মহীপতে॥
(শল্যপর্ব ৬২।১৩)

রথসহ অর্জুনও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেন ; তাই তিনি অর্জুনকে প্রথমে নামিতে দিয়া নিজে পরে নামিলেন।

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে দ্রৌপদীর প্রার্থনায় সহসা উপস্থিত হইয়া পাত্রসংলগ্ন শাককণা ভক্ষণকরতঃ দুর্বাসাশাপভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন—

স্থাল্যাঃ কণ্ঠেঽথ সংলগ্নং শাকান্নং
বীক্ষ্য কেশবঃ॥
উপযুজ্যাব্রবীদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ।
বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেব তুষ্টশ্চাস্তিতি যজ্ঞভুক্॥
(বনপর্ব ২৬৩।২৪,২৫)

এইরূপ বহু ঘটনায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে ইহাই প্রতিভাত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ অচিন্তনীয় যোগৈশ্বর্যবান্। তাঁহার সমগ্র জীবনই অমানবীয় ঐশ্বর্যপরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র মনুষ্যের তো কোন কথাই হইতে পারে না, অবতারাদি পুরুষেও ঐশ্বর্যের এরূপ সর্বাঙ্গীন প্রকাশ কোথাও দেখা যায় না। এখন আমারা তাঁহার বীর্যবিষয়ে আলোচনা করিব।

২। **বীর্য ঃ**—শারীরিক বলও শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম ছিল। বহু বলী, দুরাচারী অসুরগণকে তিনি অপরের সাহায্য বিনা একাই নিধন করিয়া স্বীয় অতুলনীয় দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশকালে মত্ত হস্তী নিধন ও তাহার দন্তোৎপাটন করিয়া যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন ভোজপতি ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সাক্ষাৎ প্রতীতি হইয়াছিল যে সম্মুখে দণ্ডদাতা কাল উপস্থিত—

'মৃত্যুর্ভোজপতেঃ' 'অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা'
(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

বালক অবস্থাতেই তাঁহার এরূপ অমানবীয় তেজ ও শক্তির বিকাশ যে, কেহই তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। অবলীলাক্রমে তিনি সেই সভাগৃহেই কংসকে নিধন করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞসভায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ পূজালাভদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া শিশুপাল তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে অশেষ নিন্দাবাদ করিতে লাগিল—

ক্লীবে দারক্রিয়া যাদৃগন্ধে বা রূপদর্শনম্।
অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথা তে মধুসূদন ॥
(মহাভাঃ সভাঃ ৩৭।২৯)

—অর্থাৎ ক্লীবের পক্ষে কি বিবাহ শোভনীয়? অন্ধ কি রূপদর্শন করিতে পারে? তদ্রূপ হে মধুসূদন! রাজা না হইয়াও তোমার এরূপ রাজবৎ পূজা অশোভনীয়।

ধৃষ্টতা যখন চরমে উঠিল তখন স্বীয় বীর্যপ্রকাশ-করতঃ শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিলেন। সেই সভাতেই শ্রীকৃষ্ণের অসীম শারীরিক বল ও বেদ-জ্ঞানের বিষয়ে পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—

পূজ্যতায়াঞ্চ গোবিন্দে হেতু দ্বাবপি সংস্থিতৌ।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলঞ্চাপ্যধিকং তথা ॥
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি
বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে ॥
(মহাভাঃ সভাঃ ৩৮।১৮,১৯)

—অর্থাৎ গোবিন্দের সর্বজন-পূজ্যতার দুইটি কারণ; প্রথমতঃ তাঁহার বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞান ও দ্বিতীয়তঃ তাঁহার শারীরিক বল। কিন্তু বলবান্ হইয়াও শক্তির অপব্যবহার তিনি কখনও করেন নাই। নিরর্থক রক্তপাতের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। শান্তির দূত হইয়াই তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। সর্বত্র শান্তিরক্ষার্থ তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য সর্বচেষ্টা ব্যর্থ হইলে কেবল তখনই তিনি বলপ্রয়োগ করিতেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সুদর্শনচক্র ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ সেই গুরুভার চক্র তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিতেন। এইরূপে দেখা যায় যে তিনি অমানবীয় দৈহিকশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন।

৩। **যশ ঃ**—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যশস্বী দেখা যায় না। তাঁহার যশসৌরভে সমগ্র জগৎ আমোদিত। তাঁহার দিব্য জীবন- ও লীলা-কীর্তনে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা মুখর। সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে তিনি সর্বত্র পূজিত হইতেছেন। আবহমানকাল ধরিয়া এই পৃথিবীতে কত বীর, কত রাজা, কত রাজনীতিজ্ঞ ও বিদ্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রের জলবুদ্বুদের ন্যায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কে মনে রাখিয়াছে? তাঁহাদের শৌর্য, বীর্য, বুদ্ধি ও বিদ্যার কথা মনে করিয়া আজ কেহই তো আকৃষ্ট হয় না? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যশোলাভ কোন মানবের ভাগ্যে সম্ভব হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গনে দুঃখমোহাকুল প্রিয়সখা অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে 'গীতা'-উপদেশ—তাহা সমগ্র মানবজাতির প্রতিই তাঁহার অপূর্ব দান। মোক্ষগ্রন্থ গীতাই তাঁহার নাম জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্মজগতে গীতার স্থান অতি উচ্চে। নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া একমাত্র এই একখানি গ্রন্থই দেশ-বিদেশে শ্রীকৃষ্ণের বিমল যশ বিস্তার করিয়াছে, যাহা অন্য কোন মানব বা অবতারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

৪। **শ্রী**:—রাজার অধিক ধন ও ঐশ্বর্য-সম্পন্ন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবেই তিনি সে সব ভোগ করিয়া গিয়াছেন। বাল্যসখা দরিদ্র সুদামাকে তিনি অতুলনীয় ধনের অধিকারী করিলেন (ভাঃ ১০।৮১।৩৩); যাদবগণের বাসের নিমিত্ত সমুদ্রমধ্যে অপূর্ব দ্বারকানগরী নির্মাণ করাইলেন। পার্থিব ধনাদিতেও তাঁহার ভাণ্ডার সদা পূর্ণ ছিল। এ বিষয়েও কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না।

৫। **জ্ঞান**:—জ্ঞানবিজ্ঞানের অপূর্ব ভাণ্ডার মোক্ষগ্রন্থ 'গীতা'ই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক দিব্য জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয়। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। জ্ঞান- ভক্তি- কর্ম- ও যোগ-মার্গের এরূপ অভাবনীয় সমাবেশ অন্য কোন গ্রন্থে বিরল দৃষ্ট হয়। ইহা সর্বজন-সুবিদিত যে, কোন গ্রন্থোক্ত জ্ঞানেতেই গ্রন্থকারের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যায় না। তদ্রূপ গীতোক্ত জ্ঞানেতেই শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানবিজ্ঞান সীমিত, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। তাঁহার জ্ঞানের সীমা ছিল না। উজ্জয়িনীতে গুরুগৃহে বাসকালে মাত্র ৬৪ দিনে তিনি বিদ্যার ৬৪ কলায় সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৪৫।৩৫)। অস্ত্রবিদ্যায়ও তিনি অতি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে সেই কালে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কূটনীতিতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পিতামহ ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণচিত্ত অর্জুনকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই রথচক্রধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। অর্জুন কখনই আচার্যবধ করিবেন না—ইহা বুঝিতে পারিয়া পুনঃপুনঃ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগকারী ধর্মজ্ঞানরহিত আচার্য দ্রোণকে বধ করাইবার উদ্দেশ্যে অশ্বত্থামাবধ-বার্তা প্রচার করাইলেন। এই সকলই তাঁহার কূটনীতির সাক্ষ্য দেয়। কৌরবসভায় সন্ধিপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি রাজ্যের লোভ দেখাইয়া কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। 'ভীষ্ম সেনাপতি থাকাকালে আমি যুদ্ধ করিব না'—কর্ণের এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাইয়া যুদ্ধ-প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনেও তিনি কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনিবার শেষ চেষ্টা করেন। এইরূপে দেখা যায়, ভেদনীতিতেও তিনি কুশল ছিলেন। ক্ষত্রিয়কুলসংহারী সমর আরম্ভ হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। মহাবীর কর্ণের বলে বলী দুর্যোধন কর্ণের অভাবে হতোৎসাহ ও যুদ্ধবিরত হইয়া শান্তিপ্রয়াসী হইবে, এই বিশ্বাসেই তিনি ভেদনীতি গ্রহণপূর্বক শান্তির জন্য শেষ চেষ্টা করিলেন। সাম, দান, ভেদনীতি ব্যর্থ হইলে অবশেষে বাধ্য হইয়া দণ্ডনীতির আশ্রয় লইলেন ও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধার্থ প্ররোচিত করিলেন। কৌরবসভায় দূতরূপে আগত শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

কুরূণাং পাণ্ডবানাং চ শমঃ স্যাদিতি ভারত।
অপ্রণাশেন বীরাণামেতদ্ যাচিতুমাগতঃ॥
(উদ্যোগ পর্বঃ ৯৫।৩)

—হে রাজন্! আমি এই প্রার্থনা লইয়াই আসিয়াছি, যাহাতে ক্ষত্রিয়কুলের সংহার না হয় এবং কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

কিন্তু ধৃষ্ট দুর্যোধন জবাব দিলেন যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দেওয়া হইবে না (উদ্যোঃ পর্বঃ ১২৩।২৫)। তখন আর অন্য উপায় রহিল না।

কংসবধের পর কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ মথুরা অবরোধ করিলে দুর্যোধনাদি সকলেই সে পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তেজ, বুদ্ধি ও বলপ্রয়োগে সে আক্রমণ সকল প্রতিহত করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষেই অশেষ লোকক্ষয় হইতেছিল। তখন ভীমের দ্বারা সময়ান্তরে জরাসন্ধ বধ করাইবেন সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ সহ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে নবনির্মিত দ্বারকাপুরীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে ইহা তাঁহার কাপুরুষতা, ভীতিপ্রসূত পলায়নবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। কারণ, পরবর্তী কার্যপরম্পরা ইহাকে তাঁহার সমরনীতি-কুশলতা বলিয়াই প্রমাণ করিয়া থাকে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাময়িক পশ্চাদপসরণ ভাবী সর্বসংহারী আক্রমণের পূর্বাভাস বলিয়াই সমরবিশেষজ্ঞগণের অভিমত। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে জ্ঞানী, নীতিমান্, রণকুশল, রাজনীতিজ্ঞ ও পরমযোগী। কূট-রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ সমাধিতত্ত্ব পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহার অবাধ গতি। একাধারে এরূপ অলৌকিক গুণরাজির সমাবেশ কি কোন মানবে সম্ভব হইতে পারে ?

৬। **বৈরাগ্য** ঃ—বৈরাগ্যের অভূতপূর্ব মহিমায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন চিরমহিমান্বিত। বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ অনাসক্তির পরিচয় তাঁহার জীবনে আমরা সর্বত্র পাইয়া থাকি। কংসবধের পর মথুরারাজ্য স্বীয় করতলগত হইলেও উহা তিনি তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিলেন ও কংসপিতা উগ্রসেনকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারকাতে রাজ্যস্থাপন করিয়া সেখানেও তিনি নিজে রাজা হন নাই; উগ্রসেনকেই রাজা করিলেন। সহদেবপ্রদত্ত বহু ধনরত্ন নিজে গ্রহণ না করিয়া উহা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করেন (মহাভাঃ সভাঃ ২৪।৪২ ; ৩৩।১৩)। ময়দানবকে দিয়া যুধিষ্ঠিরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়াও নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না (মহাভাঃ সভাঃ ১।১০, ১১)।—এই সকলই তাঁহার আসক্তিহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহার অনাসক্তির আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তাঁহার নির্বিকার সান্নিধ্যে যদুবংশনাশ। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। পরমপ্রিয় আত্মীয়স্বজন সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন। এই স্বকুলনাশ প্রতিরোধে নিজে সমর্থ হইয়াও তিনি উহার রক্ষার্থ কোন চেষ্টাই করিলেন না। ভবিতব্য বলবান্। দেখিলেন ঐশ্বর্যমদিরাপানে উন্মত্ত, তাঁহারই আশ্রিত যদুকুল পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নিজেরও ধরাধাম হইতে বিদায় লইবার কাল অত্যাসন্ন। অতঃপর এই যাদবগণ সকলের ভীতিস্বরূপ হইয়া পড়িবে ও সাধুজন নিগৃহীত হইবে। তাই অসংযত ভোগ ও ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি যে বিনাশ—এই সত্যটিও তিনি মহাপ্রয়াণের পূর্বে দেখাইয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখেই যাদবকুলকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ধীর, শান্ত, নির্বিকার। সর্বাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ অবিচলিত। সতত-চঞ্চল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সদা আত্মসমাহিত। পরমপ্রিয় ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া আর তিনি দ্বিতীয়বার সেখানে পদার্পণ করেন নাই। মাধুর্যরসের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন ও ক্রীড়াসঙ্গী গোপ-গোপিকাগণ তাঁহার কত প্রিয় ছিল! তাহাদের পরস্পর প্রীতি কত গভীর ছিল! কিন্তু জগৎকল্যাণার্থ যখন তিনি বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য যাত্রা করিলেন, তখন সে সব কোথায় পড়িয়া রহিল! উহা যেন মন হইতে মুছিয়া গেল। সে

প্রসঙ্গও আর করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ ত্যাগী।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবনও যাপন করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ভাগবতে দেখিতে পাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্যসূচী। নিত্য নিয়মিত জপ, সন্ধ্যাবন্দনা, হোম, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণপূজন—এ সকলে তাঁহার কখনও ব্যতিক্রম হইত না। ভগবদারাধনা ব্যতীত শুধু কর্মদ্বারা কখনও মানবজীবন সার্থক হয় না—ইহাই তিনি জীবনে দেখাইলেন (এ বিষয়ে মহাভাঃ শান্তিপর্ব ৫৩।২, ৭, ৮ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)। কর্ম ও উপাসনা একত্র অনুষ্ঠেয়। পরমপ্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জুনকেও তিনি গীতামুখে এই কথাই বলিয়াছেন—'মামনুস্মর যুধ্য চ'—(৮।৭)। অর্থাৎ হে অর্জুন! তুমি আমাকে সদা স্মরণ কর ও আপন কর্তব্যকর্মও অনলসভাবে করিয়া যাও। এইরূপে সদা আমাতে অর্পিত-চিত্ত তুমি অন্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এই উপদেশ নিজেও পালন করতঃ তিনি আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

লাক্ষাগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণের প্রচ্ছন্ন বাসস্থল বিরাটনগরীর কুম্ভকারগৃহেও নিজে আসিয়া সকল বিষয় জানিয়া গেলেন এবং লৌকিক শোকপ্রকাশও করিয়া গেলেন। লোকাচারও পালনীয় ইহাই তিনি দেখাইলেন। সেই সময় 'আমি কৃষ্ণ' এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকরতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীদেবীকে চরণস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতেও তিনি ভোলেন নাই। লোকমর্যাদা-রক্ষার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত!

তাঁহার হৃদয় ছিল করুণার আগার। দুঃখী, নিপীড়িতগণের দুর্দশা, দ্রৌপদীর ব্যাকুল ক্রন্দন তাঁহার চিত্তকে একান্তভাবে ব্যথিত করিয়াছিল। রাজসভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তৎকালীন নৈতিক অবনতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ—ইঁহারাও কি তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না? কিন্তু দ্রৌপদীর আকুল আর্তি তাঁহাদের চিত্তেও করুণার উদ্রেক করিতে পারে নাই। অবশেষে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অসহায়া নারীর মানরক্ষা করিলেন।

এইরূপে ঐশ্বর্য, বীর্যাদি ছয় গুণের চরম, পরিপূর্ণ সমাবেশ শ্রীকৃষ্ণের জীবনেই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া নিঃশংকচিত্তে বলা যাইতে পারে যে **শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্**। পূর্বোক্ত ছয়টি 'ভগ' বা গুণ পরিপূর্ণরূপে যাঁহাতে আছে তিনিই ভগবান্—শুধু মানব বা অবতার মাত্র নহেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ব্যতীত এরূপ সর্বগুণের মিলনক্ষেত্র আর কোথায়? মানুষ ভগবান্ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু স্বীয় পরিচ্ছিন্ন মনবুদ্ধি-সহায়ে কল্পনাতেও আনিতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকার যথার্থই বলিয়াছেন—'**কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**'।

অতএব গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্‌জ্ঞান অথবা তাঁহার স্বমুখে স্বীয় ঈশ্বরত্বখ্যাপন কেবল নিছক ভাবোচ্ছ্বাস বা দম্ভমাত্র নহে। উহা যথার্থ।

আচার্য শংকরের পদানুগ, জ্ঞানী, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ, শংকরোত্তরযুগে অদ্বৈতবেদান্তদর্শন-রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট্, 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থকার স্বামী শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মজ্ঞানে আপন হৃদয়ের শ্রদ্ধাপূত অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ,
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসদৃশমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ,
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥
(গীতা, টীকা—১৫ অঃ)

—বংশীবিভূষিত করযুগল, নবজলধরসদৃশ বর্ণ,

পীতাম্বরধারী, রক্তবর্ণবিম্বফলতুল্য অধরোষ্ঠ, পূর্ণ-চন্দ্রতুল্য সুন্দর বদন, কমলনেত্র শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা অধিক, উৎকৃষ্ট আর কোন তত্ত্ব আমি জানি না।

আবার বলিয়াছেন—

পরাকৃতনমদ্বন্ধং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।
সৌন্দর্যসারসর্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥
(গীতা; টীকা—১৪ অঃ)

—আশ্রিতভক্তগণের সর্ববন্ধবিনাশকারী, সর্ব-সৌন্দর্যঘনমূর্তি, নন্দ-নন্দন, নরাকৃতিধারী জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মকে আমি বন্দনা করি।

অলৌকিক দিব্য লীলাবিগ্রহধারী শ্রীভগবানের নাম, গুণ ও মনোহর চেষ্টাদি চিন্তনে কাহার না চিত্ত আকৃষ্ট হয়? প্রষ্টা, শ্রোতা ও বক্তা সকলকেই শ্রীবাসুদেবকথা সমভাবে পবিত্র করিয়া থাকে। ভগবানের অনন্ত মহিমা, অতি উৎকৃষ্ট লীলাবিলাস এবং অপার করুণায় মুগ্ধ হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাতে ভক্তিপূর্বক মনোনিবেশ করিয়া থাকেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
(ভাঃ ১।৭।১০)

ভাগবতকার বলিতেছেন যে অজ্ঞানাদি-বন্ধনরহিত, অপরোক্ষজ্ঞানী, আত্মারাম মুনিগণও যে শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে; কারণ অনন্তকল্যাণগুণসাগর ভগবান্ শ্রীহরির আকর্ষণ দুরতিক্রমণীয়। এই আকর্ষণই যুগে যুগে সর্বদেশে সকলকে বিষয়ভোগবিমুখ করিয়া টানিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে ভগবৎপ্রেমে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বাদরায়ণ শ্রীবেদব্যাসও এই আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনিও ইহার সর্বতঃপ্রসারী প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সর্ববেদবিভাগ, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র ও পুরাণাদি রচনা করিয়াও যখন ব্যাসদেব চিত্তে অপূর্ণতা ও অসন্তোষের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিলেন—'হে মহর্ষে! আপনি সব কিছুই করিয়াছেন কিন্তু পরমহংসগণের পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের নির্মল যশকীর্তন যথেষ্ট করেন নাই। ধর্মাদি পুরুষার্থের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন করেন নাই। ইহাই আপনার চিত্তগত অসন্তোষের কারণ। আপনি সর্বজীবের বন্ধনমুক্তির জন্য সমাধিমার্গে শ্রীভগবানের লীলাসমূহ স্মরণকরতঃ প্রেমের সহিত উহা কীর্তন করুন। উহাতে জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে এবং আপনারও চিত্তে শান্তি আসিবে।'—(ভাঃ ১।৫।৯,১৩)

দেবর্ষি নারদের আদেশে ব্যাসদেব শ্রীভগবল্লীলাগুণগানতৎপর হইয়া জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের অপূর্ব গাথা শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনাকরতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন। উহার পুনরাবৃত্তিকরতঃ ভগবল্লীলারসামৃতপানে তাঁহার চিত্ত মগ্ন হইল। আজন্মসন্ন্যাসী, মায়ানির্মুক্ত, পরমহংসাগ্রণী, প্রিয়পুত্র শুকদেবকেও তিনি এই দেবদুর্লভ অমৃতের স্বাদগ্রহণ করাইলেন। পিতার নিকট পরমনিবৃত্তিপরায়ণ শুক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন।

যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীবক্ষে আত্মারাম শুক জড় ও মূকের ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়ান। কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় তাঁহার নাই। আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত, আত্মক্রীড় শুক দেহবোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রখণ্ডের ন্যায় প্রারব্ধ-বেগে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে গঙ্গাতটে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে শৃঙ্গীঋষির শাপগ্রস্ত, সপ্তাহকালমাত্রাবশিষ্ট-পরমায়ু, অনশনব্রতী মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব-বিষয়ভোগপরিত্যাগকরতঃ নির্বিঘ্নচিত্তে মোক্ষ-

সাধন পরমার্থজ্ঞানলাভের আশায় অগণিত ঋষিমুনিজনপরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট। পরীক্ষিতের ভাগ্যাকাশে যেন সহসা বিমল পূর্ণচন্দ্রোদয় হইল। তিনি আশু মোক্ষসাধন-জিজ্ঞাসু হইয়া শুকের চরণে নিপতিত হইলেন।

আচার্য শংকর বলিয়াছেন—

আচার্যস্থাপি অয়ং নিয়মঃ যন্ন্যায়প্রাপ্তসচ্ছিষ্য-
নিস্তারণমবিদ্যামহোদধেঃ। (মুঃ ১।২।১৩)

—অর্থাৎ বিধিবৎ উপসন্ন, যোগ্য, সৎশিষ্যকে সংসাররূপ অবিদ্যাসাগর হইতে উদ্ধার করা আচার্যের অবশ্য কর্তব্য।—ইহাই সনাতন রীতি। বর্তমান ক্ষেত্রেও এই রীতির ব্যতিক্রম হইল না। গ্রীষ্মসন্তপ্তা ধরিত্রীই প্রকৃতির অব্যভিচরিত নিয়মানুসারে বর্ষার স্নানসুখে পরিতৃপ্তা হইয়া থাকে। মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্তে অশান্তির দাবানল জ্বলিতে-ছিল, কৃপাজলধর শ্রীশুকের অশ্রান্ত উপদেশবারি-বর্ষণে সে অগ্নি নির্বাপিত হইল। মহারাজ সদ্য ব্রহ্মনির্বাণ লাভকরতঃ কৃতকৃত্য হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতামৃত স্বভাবতই মধুর, শ্রীশুকমুখ-নিঃসৃত এই অমৃত মধুরতর। ভাগবতকার তাই করুণাবিগলিতচিত্ত হইয়া জগদ্‌বাসী সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

অসারে সংসারে বিষয়বিষসঙ্গাকুলধিয়ঃ
ক্ষণার্ধং ক্ষেমার্থং পিবত শুকগাথাতুলসুধাম্।
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজত কুপথে কুৎসিতপথে
পরীক্ষিৎ সাক্ষী স্যাৎ শ্রবণগতমুক্ত্যুক্তিকথনে॥
(ভাঃ মাহাঃ ৬।১০০)

—অসার এই সংসারে হে বিষয়বিষ-জীর্ণ বিক্ষিপ্তচিত্ত মানব, আপন ভাবী কল্যাণের জন্য ক্ষণার্ধও শ্রীশুকমুখনিঃসৃত বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অতুলনীয় চরিতামৃত পান কর! কেন বৃথা বিপথে কুমার্গে ভ্রমণকরতঃ কষ্ট পাইতেছ? এই অলৌকিক ভগবচ্চরিত্র শ্রবণের ফল—মুক্তি। এই বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ সাক্ষী।

এক্ষণে তিরু অনন্তপুরমের (ত্রিবান্দ্রাম) শ্রীমন্দিরনিবাসী ভগবান্ শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর একনিষ্ঠ ভক্ত মহারাজ শ্রীকুলশেখর আলোয়ার-কৃত 'মুকুন্দমালা' হইতে উদ্ধৃত একটি শ্লোকের মাধ্যমে এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি—

কৃষ্ণ ত্বদীয়ে পদপংকজপিঞ্জরান্তে
অদ্যৈব বিশতু মে মানসরাজহংসঃ।
প্রাণ-প্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে॥

—হে দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণকমলরূপ পিঞ্জরে আজই আমার চিত্তরূপ বিহঙ্গ প্রবেশ করুক, অর্থাৎ এই মুহূর্ত হইতেই আমার চিত্ত তোমার চিন্তায়, তোমার ধ্যানে নিমগ্ন হউক। কারণ এইরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর ও সৎকারসহকৃত চিন্তনে অভ্যস্ত না হইলে অন্তকালে যখন বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকারে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিবে তখন তোমাকে চিন্তা করার অবসর কোথায়?

নাম-মাহাত্ম্য

স্বামী ধীরেশানন্দ

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো, তা হ'লে সব পাপতাপ চ'লে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহগাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে পালায়।

'...আগে লোকে যোগযাগ, তপস্যা করত ; এখন কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, দুর্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হ'য়ে করলে সংসারব্যাধি নাশ পায়।

'জান্তে, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে।

'এই কলিযুগে নারদীয় ভক্তিমতই প্রশস্ত। অন্য অন্য যুগে নানা রকমের কঠোর সাধনের নিয়ম ছিল ; সে সকল সাধনে এ-যুগে সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন। একে জীবের অল্প পরমায়ু... কঠোর তপস্যা কেমন ক'রে করবে ?' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, যুগধর্ম ১-৫)।

কথায় বলে 'দেহের সুখ ঘুমে আর মনের সুখ নামে।' সুনিদ্রা হইলে দেহ স্বচ্ছ ঝরঝরে, উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ বোধ হয়। সব লোক দেহ লইয়াই ব্যস্ত, দেহের পুষ্টি-সাধনে আহার-বিহারাদি নিয়াই মত্ত। কিন্তু—**Man cannot live on bread alone**—কেবল দেহ লইয়াই মানুষ শান্তি পায় না। তাহার মনের খোরাকও দরকার। তাই কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার পরিশীলনও প্রয়োজন। বিভিন্ন বিদ্যার অভ্যাসে জীব আনন্দ পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু ভগবন্নামে চরম সাত্ত্বিক আনন্দের বিকাশ হয়।

নামের অচিন্ত্য শক্তি। ইহাকেই শব্দশক্তি বলা হয়। একটি শব্দেই লোক চিরতরে শত্রু হয় এবং একটি শব্দেই মিত্র হইয়া যায়,—ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

'শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাদ্ বিদ্মস্তন্মোহহানতঃ।'

'মাহাত্ম্যমেতৎ শব্দস্য যদ্‌বিদ্যাং নিরস্যতি।

সুষুপ্ত ইব নিদ্রায়া দুর্বলত্বাচ্চ বাধতে॥'

—শব্দশক্তি অচিন্ত্যনীয়। সেই শক্তিবলেই জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়। ইহা শব্দেরই মহিমা। স্বনাম দ্বারা আহ্বানে শব্দ-সম্বন্ধ বিনাই সুষুপ্ত পুরুষের জাগরণ এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। এই শব্দশক্তি প্রবলতর, অজ্ঞান দুর্বল। তদ্রূপ ভগবন্নাম শক্তিতেই কামাদি ও অবিদ্যা নাশ হইয়া যায়। কারণ তাহারা দুর্বল, নামের শক্তি প্রবলতর।

'রাম'—পরমাত্মারই একটি নাম। রামভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

'রামনাম মণিদীপধর জীহ দেহরীদ্বার।

তুলসী ভীতর বাহিরো জো চাহত
উজিয়ার॥'

—হে তুলসী! যদি ভিতরের ও বাহিরের অন্ধকার দূর করতঃ প্রকাশ পাইতে চাও তবে দেহের দ্বারস্বরূপ জিহ্বাতে রাম নাম রূপ মণির স্নিগ্ধ দীপ ধারণ কর।

উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন প্রভাবে আপন অন্তরের মলিনতা ও বাহিরের অপর শ্রোতাদেরও অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে। কারণ, তাহারা দুর্বল, অপরপক্ষে নামের শক্তি প্রবল।

এক রাম, তাঁর কত নাম। বিভিন্ন রুচির লোকদের সন্তোষ বিধানার্থ তিনিই কৃপায় বহুবিধ নাম ধারণ করিয়াছেন। যেমন—

'রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥'

—এই শ্লোকে রামচন্দ্রের সাতটি নাম আছে। এই নামগুলি রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ বিভিন্ন ভক্তের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। যেমন মহারাজ দশরথের নিকট 'রাম' এই নামটি পরম প্রিয় ছিল। তিনি 'রাম' 'রাম' উচ্চারণ করিয়াই পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। মৃত্যুকালেও—

'রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।
তন্থ পরিহরি রঘুবর বিরহ রাউ গয়উ সুরধাম॥'

—এই রূপে ছয় বার রাম নাম উচ্চারণ করিয়া মহারাজ দশরথ প্রিয় পুত্রের বিরহে দেহত্যাগান্তর স্বর্গলোকে গমন করিলেন। মাতা কৌশল্যার নিকট পুত্র রাম পূর্ণিমার পূর্ণকলা বিকশিত হৃদয়ানন্দদায়ক চন্দ্রমার ন্যায় আনন্দদায়ক বলিয়া তিনি পুত্রকে 'রামচন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিতেন। পুরবাসিগণ রাম সর্বকল্যাণনিদান, সর্বমঙ্গলাধার জানিয়া তাঁহাকে 'রামভদ্র' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহাকেই আবার ঋষি মুনিগণ বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা-রূপে ('বেধা') সম্বোধন করিতেন। রাজ্যের প্রজাগণ তাঁহাকে রঘুবংশের নাথ বা রক্ষক ভাবিয়া তাঁহাকে 'রঘুনাথ' আখ্যা দিয়াছিলেন। স্বয়ং মাতা জানকী রামচন্দ্রকে 'নাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর ভক্তগণের নিকট তিনি 'সীতাপতি' নামে পরিচিত। এইরূপে দেখা যায় বিভিন্নলোক রুচি স্নেহ মমতা শ্রদ্ধাদির বৈচিত্র্য-বশতঃ ভগবানকে বিভিন্ননামে ডাকিতে পছন্দ করে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নামমহিমা প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত 'শিক্ষাষ্টক' স্তোত্রে বলিয়াছেন—

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'

—তোমার নামাবলী বহুপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার সকল শক্তি অর্পিত হইয়াছে, নামস্মরণ বিষয়ে কোনও সময়ের বিধিও নাই। হে ভগবান্, তোমার এমনই করুণা, কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে এই জন্মে অনুরাগ জন্মিল না।

ঈশ্বর পরম কৃপালু। তাঁহার কৃপার পরিচয় এই বহুবিধ নাম ধারণ ও সেই নাম সমূহে তাঁহার পরম পাবনী-শক্তি সঞ্চারণ। নাম-স্মরণ অতি সহজ সাধন। একটু ইচ্ছা করিলে সকলেই অনায়াসে করিতে পারেন। কিন্তু দুর্দৈব বশতঃ লোকে তাহা করিতে চায় না।

একদিন একটি ভক্ত কথামৃতকার শ্রীম-র নিকট মনের অশান্তি নিবেদন করিতেছিলেন। শ্রীম বলিলেন—'ঠাকুরের নিকট প্রাণভরে প্রার্থনা করুন। তাঁর কৃপায় সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে।'

ভক্ত—'প্রার্থনা করিতেও যে মন চায় না।'

শ্রীম—'তাঁহার নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া কাঁদুন। কান্নায় তাঁর কৃপা হইবে।'

ভক্ত—'কান্নাও ত আসে না।'

শ্রীম—'তবে তাঁর নাম করুন। নামে রুচি হ'লে সব অশান্তি দূর হইবে।'

ভক্ত—'তাঁর নাম করিতেও যে ইচ্ছা হয় না।'

শ্রীম—'তাহা হইলে case serious। নামে রুচি হচ্ছে last medicine। ইহাও করিতে না চাহিলে বুঝিতে হইবে রোগ দুঃসাধ্য। বাঁচিবার আশা কম। সুতরাং case serious।'

কৃপা চারি প্রকার—ঈশ্বরকৃপা, গুরুকৃপা, শাস্ত্রকৃপা ও আত্মকৃপা। ইহার মধ্যে আত্মকৃপাই মুখ্য। আত্মকৃপার অর্থ সাধকের নিজের পুরুষ-কার। আত্মকৃপা না থাকিলে অপর তিনটি কৃপা কার্যকরী হয় না। অপর তিনটি কৃপা চিরকালই রহিয়াছে। জীব আত্মকৃপার অভাবেই ঐ তিনটি

কৃপার সদুপযোগ করিতে পারে না ও তাহার সব কার্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

'অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধি বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যা সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ॥'

—কোন কার্যের ফলসিদ্ধি অধিকারীর উপরই বিশেষ রূপে নির্ভর করে। অর্থাৎ যথাযোগ্য অধিকারীর অপেক্ষা থাকে। দেশকালাদি সাধন কেবল উহার সহায়ক মাত্র।

অনধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রও ব্যর্থ। কারণ,—যার স্বয়ং প্রজ্ঞা নাই, সূক্ষ্ম বস্তু বুঝিবার ক্ষমতা নাই, শাস্ত্র তাহার কি করিতে পারে? নেত্র-বিহীন লোকের নিকট দর্পণ কি তার মুখ প্রতিবিম্ব তাহাকে দেখাইতে পারে?—এরূপ লোকের সাধুসঙ্গ, মহতের সেবা ও সশ্রদ্ধ নাম-কীর্তন সাধনই শ্রেয়।

ঠাকুর বলিয়াছেন, 'জ্ঞান্তে অজ্ঞান্তে বা ভ্রান্তে ভগবন্নাম করিলেও তাহার ফল হইবেই।' জ্ঞান্তে অর্থাৎ জ্ঞানত, অজান্তে অর্থাৎ অজ্ঞানত, যথা অজামিল। ব্রাহ্মণ অজামিল শূদ্রাণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া কতিপয় সন্তানের জনক হন ও দস্যুবৃত্তি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করতঃ কর্মচণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। লোমশ মুনির দুরারোগ্য গাত্রদাহ রোগ উপস্থিত হইলে নারদ তাঁহাকে বলিলেন যে, কোন কর্মচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনে এ রোগ দূর হইবে। লোমশ মুন অনেক অনুনয়াদি করিয়া ঐ শূদ্রাণীর নিকট হইতে কিছু উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া নিরাময় হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবার উপায়রূপে তিনি অজামিলকে অনুরোধ করিলেন যে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম 'নারায়ণ' রাখা হউক। অজামিল সম্মত হইলেন। মৃত্যুকালে অজামিল ভীষণকায় যমদূতগণের দর্শনে ভয়ভীত হইয়া প্রিয়পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, 'নারায়ণ আয়' 'নারায়ণ আয়' এই দুটি শব্দ মিলিত হইয়া একটি শব্দ-রূপে পরিগণিত হইল 'নারায়ণায়' এইরূপে তাহার সর্বপাপ স্খালন হইল।—

ভ্রান্তে অর্থাৎ ভ্রান্তভাবে নাম উচ্চারণ করিলেও তাহার ফল হয়—

'মূর্খো জপতি বিষ্ণায় বিদ্বান্ জপতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু ফলং তুল্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥'

—বিদ্যাবিহীন মূর্খ 'বিষ্ণায় নমঃ' বলে। ব্যাকরণ মতে 'বিষ্ণবে নমঃ' শুদ্ধ। কিন্তু সে উহা জানে না। সে আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত 'বিষ্ণায় নমঃ' মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। আর বিদ্বান ব্যক্তি 'বিষ্ণবে নমঃ' এই শুদ্ধ মন্ত্র জপ করেন। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে উভয়ের ফলই সমতুল্য। কারণ তিনি ভাবগ্রাহী। লোকের মনের ভাবটুকুই মাত্র তিনি গ্রহণ করেন। ব্যাকরণগত শুদ্ধি-অশুদ্ধির দিকে দৃকপাত করেন না। ছোট শিশু যখন পিতাকে 'পা' 'পা' বলিয়া ডাকে, পিতা জানেন শিশু তাহাকেই ডাকিতেছে ও সস্নেহে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন।

বিচারদৃষ্টিতে সবই তাঁর নাম। কারণ তিনি সর্ববর্ণময়। 'কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী—বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে'। ইংরেজ কবি Tennyson-এর নিজ নাম জপে ভাব সমাধির কথা শোনা যায়। ঐ অবস্থায় সত্যস্বরূপের অনুভব তাঁহার জীবনে স্থায়ী হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না। কারণ উহা বিশেষ সাধন সাপেক্ষ। তবে উহা যে চরমতত্ত্বের আভাস-অনুভূতি তাহা নিশ্চিত।

এরূপ কথিত আছে যে Tennyson নিজের নাম স্বগতভাবে আবৃত্তি করিয়া নিত্যচৈতন্য সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তিনি নিজের আত্ম-জীবনীতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহা অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক। তিনি লিখিয়াছেন:

'আমার বাল্যকাল থেকেই যখন আমি সম্পূর্ণ

একাকী থাকিতাম তখন একপ্রকার—জাগ্রত ভাব-সমাধি অনুভব করিতাম। সাধারণতঃ আমার নিজের নামটি ২।৩ বার স্বগতভাবে আপন মনে নীরবে উচ্চারণ করে এই ভাবটি আসত। হঠাৎ যেন ব্যক্তিত্বের একীকরণ ও তীব্রতার ফলে ব্যক্তিত্বই লুপ্ত হয়ে এক সীমাহীন অনন্ত সত্তায় ধীরে ধীরে মিশে যেত। এবং এটি কোন অজ্ঞানজনিত মূঢ় অবস্থা নহে—বরং সর্বতোভাবে ভাষার অতীত, স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতম, নিশ্চিত বস্তু হতেও নিশ্চিততম, এবং স্থূল জগৎ থেকে ভিন্ন, রহস্যময় সূক্ষ্মতত্ত্ব হতেও সূক্ষ্মতম—যেখানে মৃত্যু ছিল প্রায় হাস্যকররূপে অসম্ভব। ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি যদি মেনেও নেওয়া যায়, তথাপি তাহা বিনাশরূপ না হয়ে সত্য জীবন-রূপে-ই প্রতিভাত হ'ল। আমি তা ভাষায় বর্ণন করতে না পারায় লজ্জিত। আমি কি বলিনি যে ঐ অবস্থা সর্বতোভাবে ভাষার অতীত?' (Quoted in Alfred Lord Tennyson, a memoir, by His Son, Hallan Tennyson, Macmillan 1897 Vol.1)।

জগতে বিভিন্ন ধর্মে ভগবানের নামও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন হিন্দুগণ জপ করেন—'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' 'কালী' 'নারায়ণ' 'শিব'—ইত্যাদি বহুবিধ দেবদেবীর নাম। খ্রীষ্টানগণ জপ করেন—'Ava maria', 'Jesus Christ my Lord have mercy on me, a sinner'। মুসলমানগণ জপ করেন—'অল ওয়হিদ' 'আহাদ (এক অদ্বিতীয়)', 'আক্রাম (দয়ালু)', 'করীম (বদান্য)', 'কুদুস (পবিত্র)', 'মহিয় (জীবনদাতা)', 'কাদির (শক্তিমান)', 'কবীর (মহান)', 'হাকেম (বিচারক)', 'হাকিম (মহাজ্ঞানী)', 'নূর (আলোক)',—ইত্যাদি আল্লার ২৪টি প্রসিদ্ধ নাম, এবং বৌদ্ধগণ 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই মন্ত্র জপ করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক ধর্মেই নাম জপ করার বিধান আছে। ভগবান এক হইলেও তিনি অনন্তমূর্তি—অনন্ত তাঁর নাম। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে ভক্ত তাঁর রুচি ও ভাবানুযায়ী বিশেষ একটা নাম হয়তো ভাল-বাসতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবানের অন্যান্য নামের মাহাত্ম্য কম—এইরূপ ধারণা করা ভুল। একই ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তার মধ্যে যে-কোন একটি নামে তাহাকে ডাকিলেই সে যেমন সাড়া দিয়া থাকে, এই কথা ভগবানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ। ঈশ্বরের সব নামেরই সমান মাহাত্ম্য—এই ভাবটি অবধারণ করিয়া ভক্তের রুচি ও ভাবানুযায়ী নাম-বিশেষকে তাঁর গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেখি যে তিনি মা কালীর উপাসক হইয়াও বিভিন্ন নামে ভগবানের নাম-গুণগান করিতেন। এই ভাবটি গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিলে মনে কোন সাম্প্রদায়িকভাব ও গোঁড়ামি প্রকট হইতে পারে না।

পূর্বেই যেমন বলা হইয়াছে, ভগবদুপলব্ধির পক্ষে নাম-স্মরণ অতি সহজ সাধন। শাস্ত্রানুযায়ী শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন ইত্যাদি ভক্তি-সাধনার প্রধান অঙ্গগুলির মধ্যে 'কীর্তন' অর্থাৎ ভগবানের নামগুণগানেরই বিশেষ প্রাধান্য বলিয়া মনে হয়। কারণ নামে ভালবাসা আসিলেই অন্যান্যগুলির প্রশ্ন আসে। তাঁহার নামেই যদি অরুচি হয় তবে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রবণ, স্মরণ, সেবা, পূজার্চনা ইত্যাদির ভাব আসিতে পারে না। ভগবানের প্রতি প্রথমে ভালবাসা না আসিলেও নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি ভালবাসা বা প্রেম জন্মে। শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি 'জপাৎ সিদ্ধি' অর্থাৎ কেবল জপেতেই সিদ্ধিলাভ হয়। 'জপ' মানে বার বার ভগবানের নাম উচ্চারণ করা। ভগবানের নাম করিতে করিতে ভক্ত ক্রমশঃ এমন স্তর উন্নীত হন যে তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন—নাম ও নামী অভেদ।

পয়লা জানুআরি

স্বামী ধীরেশানন্দ

দুর্বার কালের অপ্রতিহত গতি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিল। মানবের সীমিত ক্ষুদ্র জীবন-নদীর আর একটি বর্ষ-বুদ্বুদ অনাদি অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইল। জীবন-যাত্রার পথে শত আশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্য, ভাল-মন্দ, এবং অগণিত অফুরন্ত ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাসমূহ আপন বক্ষে ধারণ করিয়া আর একটি বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

কিন্তু সত্যই কি একটি বৎসর নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল? বিচার-দৃষ্টিতে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সীমারেখা দুর্লক্ষ্য ও কাল্পনিক। বর্তমান ক্ষণমধ্যে অতীত হইয়া যায় ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের রূপ ধারণ করিতে না করিতেই ভূতকালে পর্যবসিত হইয়া পড়ে। নিমেষ-মধ্যে হস্তস্থিত কাল যেন কোথায় অপস্রিয়মান, অদৃশ্য হইয়া যায়! তাই কালের কোন নিয়ত রূপ নাই। কিন্তু মানুষ ব্যাবহারিক জগতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতিবিধি সহায়ে দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর—এইরূপে কাল গণনা করিয়া থাকে। এই কাল ক্ষয়িষ্ণু কাল। মানুষ, পিতৃ ও দেবগণের বিভিন্ন কাল গণনা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে সেইকালের সঙ্কুচিত চিত্রপটে কোথায় কি অঙ্কিত আছে, তাহা কে জানে? কাল যে চিত্রটি উন্মোচিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন, আমরা তাহাই দেখিতেছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। কিন্তু আমরা ভাবি না, আরও কত বিচিত্র দৃশ্য উহাতে গুপ্ত হইয়া আছে, কালে উহা প্রকাশ পাইবে।

জগদ্রূপ রঙ্গমঞ্চে ভগবানের কালশক্তি নৃত্যশিক্ষক। কাল সংসারে সকলকেই স্ব স্ব কর্মানুযায়ী নাচাইতেছেন। কাল জগতের নিয়ামক। কালে অরণ্য জনপদে ও জনপদ অরণ্যে পরিণত হয়। কালে চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পর্যন্ত লয় পান। এই কাল—যাহার সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত, ইহা শ্রীভগবানেরই একটি বিভূতি। গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'কালঃ কলয়তামহম্' (১০।৩০)—কালগণনাকারিগণের মধ্যে কাল-রূপী আমি। ইহা তাঁহার অপ্রধান, গৌণ, ব্যাবহারিক রূপ। এই কাল আয়ুক্ষয়ে ক্ষয় হয়। কিন্তু এতদূর্ধ্বে আর একটি কাল আছে, যাহা শ্রীভগবানের পারমার্থিক রূপ, উহা নিত্য কাল। গীতামুখে তিনি—'অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ' (১০।৩৩)—আমিই অক্ষয় কাল—এইরূপ কথনপূর্বক সেই নিত্য কালরূপেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

অনিত্য খণ্ড-কাল 'আগমাপায়ী'। উহা বিগত হইয়া নিত্য অনন্ত কালসহ আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। কিন্তু মোহবশতঃ আমরা কালরূপী শ্রীভগবানের বাস্তব রূপটি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি না। ক্ষুদ্র কাল-সম্বন্ধ তুচ্ছ পার্থিব বিষয়সমূহ লইয়াই ভুলিয়া থাকি। তাই আজ এই নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের ভাবিবার অবকাশ আসিয়াছে যে,

একটি একটি করিয়া ক্ষণ, দিন, মাস, বৎসর ব্যতীত হইয়া গেল, কিন্তু আমরা কোথায় চলিয়াছি? যে পথে আমরা জীবনযাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, তাহার কতদূর অগ্রসর হইয়াছি? চিত্তে শান্তিলাভ কতটা হইয়াছে? কতগুলি প্রতিবন্ধক এখনও আছে?—আজ এইরূপ হিসাব-নিকাশ করিবার দিন। যদি উদ্দেশ্যলাভে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে না পারিয়া কেবল দ্বেষ, হিংসা, কলহ, স্বার্থপরতাতে ও নাম, প্রতিষ্ঠালাভের ব্যর্থ প্রয়াসেই বিগত বৎসর ব্যতীত হইয়া থাকে—তবে আজ সেজন্য দুঃখ করিবার দিন। কারণ বৃথাই জীবনের একটি অমূল্য বৎসর বিনষ্ট হইয়া গেল।

এক প্রৌঢ়া বড় আনন্দের সহিত সাধু-মহাত্মা ও গরীব-দুঃখীদের মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছিল। এক সাধু এরূপ করার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা উত্তর দিল—'মহারাজ! আজ বড় আনন্দের দিন। আজ আমার প্রিয়তম পুত্রের ষোড়শ জন্মতিথি। তাই আমি আজ মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছি।' এ-কথা শুনিয়া সাধুটির মন চিন্তাক্রান্ত ও দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ এইরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সাধু বলিলেন,—'মাতাজী! কি আশ্চর্য! বস্তুতঃ যেখানে শোক ও দুঃখ অনুভব করা উচিত, সেখানে তুমি আনন্দ করিতেছ? তোমার প্রিয় পুত্রের নির্দিষ্ট পরমায়ুর আর একটি বৎসর কালকর্তৃক অপহৃত হইল। মৃত্যু সন্নিকট হইল—ইহা কেন বুঝিতেছ না?'—সাধুর এই কথা প্রৌঢ়া বুঝিল না, বুঝিতে চাহিল না। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জগতের কেহ ভাবে না, মাতাও পূর্বে ভাবেন নাই। প্রতিটি বৎসর বিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের মৃত্যু সন্নিকট হইতেছে—এ-কথা তিনি ভাবিতে চাহিলেন না। দেহভোগৈকসর্বস্ব জগতে এ-কথা কেহ ভাবিতে চায় না।

কিন্তু মুমুক্ষুদের কথা স্বতন্ত্র। সদা মৃত্যুচিন্তন তাহাদের বিষয়-বৈরাগ্যের জনক ও সংরক্ষক। তাই মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে আজ সাংবৎসরিক হিসাব-নিকাশের দিন। কিন্তু অতীতের অসফলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুমুক্ষু নৈরাশ্যসাগরে মজ্জমান হন না, বরং সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ নববর্ষের আগমনে পুলকিতচিত্তে তাহাকে অভ্যর্থনা-করত কায়মনোবাক্যে মোক্ষসাধন জ্ঞানসম্পাদনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেষ্ট হন। এইরূপে অতীতের অনবধানতা ও অসফলতাই সচেতন মুমুক্ষু সাধকের ভাবী কল্যাণের সুদৃঢ় বুনিয়াদ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধকের জীবনে নৈরাশ্যের অবকাশ কোথায়? জীবনের একটি বৎসর অপহৃত হইলে মৃত্যু নিকটবর্তী হইল, এইরূপ ভাবিয়া সাধক তাঁহার সাধনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন।

কল্যাণঘনমূর্তি শ্রীভগবানের অপার কৃপারাশিও সাবহিত সাধককে স্ব-স্বরূপে উন্নীত করিবার জন্য সদা উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সেই দৃষ্টিতেও আজ একটি বিশেষ আনন্দের দিন। কারণ যে ঐশী করুণাশক্তি স্বতঃস্ফূর্তগতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহাবলম্বনে কোন কোন ভাগ্যবানের প্রতি কালবিশেষে প্রকটিত হইয়া তাহাদিগের জন্মমৃত্যুবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিত, আজ এই নববর্ষের দিনে (১লা জানুআরি, ১৮৮৬) উহা শতধা বিচ্ছুরিত হইয়া আত্মপ্রকাশকরত নির্বিশেষে অকাতরে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ খৃঃ সমবেত সকলের প্রতি অভয়দান করিয়াছিল।

'তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক'—

যুগাবতারের সেই অমোঘ আশীর্বাদ কেবল সেই দিনটিতে সমবেত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হয় নাই, উহা সুদূর-প্রসারী ভাবিকালের অগণিত অনাগত ভক্তগণের উদ্দেশ্যেও বর্ষিত হইয়াছিল। আজ শ্রীপ্রভুর এই বাণীটিই বিশেষ করিয়া স্মরণ-পূর্বক আনন্দের দিন। কারণ—

—যখন জীবনসংগ্রামে শত ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদে মুহ্যমান হইয়া চতুর্দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িব—তখন 'তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক'—তাঁহার এই বাণী সকলকে আশার আলোক প্রদর্শন করিবে।

—যখন চিত্তরূপ অরণ্য দুরন্ত ইন্দ্রিয়রূপ হিংস্র শ্বাপদকুলের যথেচ্ছ দুর্বার আক্রমণে ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—তখন তাঁহার এই বাণী সকলের চিত্তে অনন্ত শক্তি ও সাহস প্রদান করিবে।

—যখন অনবধানতা ও অসাফল্য প্রতি পদে পদে আমাদিগকে বিপথগামী করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে তখন করুণাময় শ্রীপ্রভুর এই আশিস্-বাণী আমাদের পথের নির্দেশ প্রদান করিবে।

—যখন অধ্যাত্মজীবনের শতবিঘ্নসঙ্কুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে গিয়া স্খলিতপদে আমরা সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িব ও মহামোহ-অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকার যখন জীবনের দিক্‌চক্রবাল সমাচ্ছন্নকরত আমাদিগকে নিতান্ত বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে—তখন যুগাবতারের এই অমোঘ অভয় আশ্বাসবাণী আমাদের দৃষ্টি লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্টকরত সর্ব প্রতিকূল অবস্থা হইতে আমাদিগকে সমুদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—

—তিনি আমাদের সকলকে সন্মার্গপ্রবৃত্তির অনুকূল শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা

স্বামী ধীরেশানন্দ

উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত **"শ্রীশ্রীমায়ের কথা—২য় ভাগ"** পড়িতে পড়িতে একস্থানে আসিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম। কোন প্রশ্নের জবাবে শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরদানের অভিনবত্ব ও তাহার গভীর তাৎপর্যদর্শনে। মায়ের বাণী **স্বভাবতই প্রসন্ন কিন্তু** অতি গম্ভীর। কথাটি এই : ৪ পৌষ। জয়রামবাটি। (দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)

"রাত্রে মায়ের ঘরে কথা হইতেছে। বেদান্তের কথা উঠিয়াছে।…আবার সৃষ্টির কথা উঠিল।

আমি* —আচ্ছা, এই যে সব অসংখ্য প্রাণী—ছোট, বড়, সব কি এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে নাকি ?

মা—চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন ? না, তাঁর একটা শক্তি আছে। তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোপ পাচ্ছে। **যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।"**

পুনরায় ঐ মায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

"আমি—ভাব তো স্বপ্নবৎ, যেমন ভাবতে ভাবতে শেষে তাই স্বপ্ন দেখছে।

মা—**স্বপ্ন বৈকি! জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রৎ অবস্থা) একটা স্বপ্ন।**

আমি—না, এতটা স্বপ্ন নয়। তা হলে পলকে ভাঙ্গত। এ যে অনেক জন্ম ধরে রয়েছে।

মা—**তা হোক। স্বপ্ন বই আর কিছু নয়।** এই যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছ, এখন তা নাই। (বাস্তবিকই গত রাত্রে আমি একটা **আশ্চর্য স্বপ্ন** দেখেছিলাম।) চাষা স্বপ্ন দেখেছিল—রাজা হয়েছে, আট ছেলের বাপ হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে বলেছিল, 'সেই আট ছেলের জন্য কাঁদব, না এই এক ছেলের জন্য কাঁদব ?' "

জগতের সৃষ্টি বিষয়ে নানা মত দেখা যায়। **শ্রীশ্রীমা বলিলেন, এই জাগ্রৎকালীন জগৎটা একটা স্বপ্ন এবং সব সৃষ্টিই একই কালে উৎপন্ন হইয়াছে। 'একটি একটি করে হয়নি।'** এই বিষয়ে একটু প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রয়োজন, কারণ বিষয়টি অতি গম্ভীর।

জগতের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল—এ বিষয়ে বেদ, দর্শন, পুরাণাদিতে নানা প্রকার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ তিন প্রকার মতবাদ বিভিন্ন দর্শনাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। যথা **—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ।**

—ন্যায় বৈশেষিক মতে পরমাণুরূপে ক্ষিতি আদি চারি ভূত, আকাশ, দিক্‌, কাল, মন, ও আত্মা, এই নয়টি নিত্যদ্রব্য মানা হয়। জীবাত্মাসমূহ হইতে ভিন্ন পরমাত্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐ পরমাণু-সমূহকে সংযোগ করেন। ঐ পরমাণুসংযোগেই বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। পরমাণু-সংযোগ আরম্ভ হওয়াতেই সৃষ্টি হয় বলিয়া **ইহার** নাম **আরম্ভবাদ।**

সেশ্বর সাংখ্য ও যোগদর্শন বিভিন্ন পরমাণু-সমূহকে সৃষ্টির কারণ বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বলেন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগৎকারণ। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্ষুব্ধ প্রকৃতিই জগদ্রূপে বিকশিত হয় বা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই **পরিণামবাদ।**

পুনঃ শ্রীমৎ শংকরাচার্যপ্রমুখ অপর বেদান্তী

* সেবক স্বামী অরূপানন্দ (রাসবিহারী মহারাজ)

আচার্যগণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পরমাণু, প্রকৃতি বা তাহার কার্যের কোন বাস্তব সত্তা মানেন না। তাঁহারা বিবর্তবাদ দ্বারাই সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সত্যবস্তুর বাস্তব পরিবর্তন বা রূপান্তরকে পরিণাম বলে। আর সত্যবস্তুর ভ্রমবশতঃ রূপান্তরপরিণামকে বলে **বিবর্তবাদ**।

সৃষ্টিতে যাহাদের সত্যত্ববোধ দৃঢ় রহিয়াছে তাহাদিগকে জগদুৎপত্তির তত্ত্বকথন প্রসঙ্গে ক্রমশঃ কার্য হইতে কারণ, পুনঃ তাহার কারণ—এইরূপে মূল কারণ প্রকৃতি পর্যন্ত লইয়া গিয়া, এক অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপে ঐ মূল প্রকৃতিও একান্ত অসৎ, ইহা ঘোষণা করতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এ মতে সৃষ্টি আদির বর্ণন কেবল অধ্যারোপমাত্র। উহা অপবাদপূর্বক পরম জ্ঞানলাভে চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায়-রূপেই উক্ত বর্ণনের সার্থকতা। জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্তমাত্র। এই অধ্যস্ত জগদ্রূপ পরিণাম কি প্রকারে হয় সে বিষয়ের ধারাবাহিকতা যে রূপেই হউক না কেন তাহাতে বিবর্তবাদীদের কোন আপত্তি নাই। অধ্যস্তের অপবাদপূর্বক স্বরূপোপলব্ধিতেই যথার্থ তাৎপর্য। **সৃষ্টিবর্ণনে তাঁহারা কোন তাৎপর্য স্বীকার করেন না।**

এতদ্ভিন্ন সৃষ্টি বিষয়ে আরও বহু মত আছে। পূর্বমীমাংসা এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বেদান্তিগণও জীবের অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। কেহ কেহ সৃষ্টি কালের ক্রীড়া, দৈব ইচ্ছা, ঈশ্বরের লীলা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। ভক্তগণের দৃষ্টিতে এই চরাচর জগৎ শ্রীভগবানের লীলামাত্র। জীবকর্ম ও তাহার ফল—সবই শ্রীভগবানের লীলা। ভক্ত প্রতিক্ষণ, সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের লীলাদর্শন করতঃ প্রিয়তমের স্মরণেই মগ্ন থাকেন। তাহার দৃষ্টিতে জাগতিক সুখ-দুঃখের আর অস্তিত্বই থাকে না। জীবের অদৃষ্টই জগৎ-সৃষ্টির হেতু এ মতেও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জীবকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করিবার জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বেদান্তে দেখিতে পাই **সৃষ্টির ক্রমিক বর্ণনা**। (তৈঃ উপঃ, ২।১।৩) 'উক্ত এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী। পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল।'

সূক্ষ্ম পঞ্চভূতসমূহ পরস্পর একত্রীভূত (পঞ্চীকৃত) হইয়া স্থূল পঞ্চভূত ও তাহা হইতে এই ভৌতিক সৃষ্টি। এখানে সৃষ্টির একটা সুস্পষ্ট ক্রম লক্ষিত হয়। জড়বিজ্ঞানও বলেন, ঘূর্ণ্যমান সূক্ষ্ম নীহারিকামণ্ডলী ক্রমশঃ স্থূলীভূত হইয়া গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্রাদি শোভিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া ধরাবক্ষে প্রাণের বিকাশও একটা ক্রমিক পদ্ধতিতেই বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। বিজ্ঞানমতে ক্রমবিবর্তনবাদের ইহাই ঘোষণা।

আবার ক্রমসৃষ্টির অন্য প্রকার কথাও বেদান্তে পাওয়া যায়। যথা—(ছাঃ উপঃ, ৬।২।৩) 'তিনি সৎ, তেজ সৃষ্টি করিলেন।…উক্ত তেজ (তেজরূপী সৎ) জল সৃষ্টি করিলেন।… উক্ত জল (জলরূপী সৎ) অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।'—এই সকল শ্রুতিতে সৃষ্টির একটা সুস্পষ্ট ক্রম লক্ষিত হয়। অর্থাৎ একটির পর একটি সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার কথা কিন্তু এই ক্রমিক সৃষ্টিকে সমর্থন করে না।

(মুণ্ডক উপঃ, ১।১।৮) 'ব্রহ্ম হইতে অব্যাকৃত প্রধান জাত হয়, প্রধান হইতে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ হইতে মন, মন হইতে পঞ্চভূত, তাহা হইতে ক্রমে লোকসমূহ (তাহাতে কর্ম) ও কর্ম-সকল হইতে কর্মফল উৎপন্ন হয়।' ইহাও ক্রমসৃষ্টি-বিধায়ক শ্রুতি। এইরূপ বহু শ্রুতি সৃষ্টির একটা

ক্রম বর্ণনা করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমা কিন্তু এই সকল শ্রুতি হইতে ভিন্ন অন্য মত প্রকাশ করিলেন।

পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি শ্রুতি **অক্রম সৃষ্টির**—অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা যেমন **এককালীন সৃষ্টির** কথা বলিয়াছেন তদ্রূপ সৃষ্টির—কথাও বলেন। যথা—(মুঃ উপঃ, ২।১।১) 'যেরূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অনল হইতে তাহার সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, তদ্রূপ, হে সৌম্য, অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়।'

(বৃহঃ উপঃ, ২।১।২০) 'মাকড়সা যেমন তন্তু অবলম্বনে বিচরণ করে, কিংবা অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়, ঠিক তেমনি এই আত্মা হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল প্রাণী বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়।'—এই সকল শ্রুতিবাক্য মা-র কথার সমর্থক।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থেও বশিষ্ঠজী বলিয়াছেন,—

'অবিদ্যাযোনয়ো ভাবাঃ সর্বেমী বুদ্বুদা ইব।
ক্ষণমুদ্ভূয় গচ্ছন্তি জ্ঞানৈকজলধৌ লয়ম্॥'

—সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় অবিদ্যোৎপন্ন সর্ব পদার্থ জ্ঞানসমুদ্রে ক্ষণমধ্যে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।—এইরূপে দেখা যায় শাস্ত্রে **ক্রম-সৃষ্টি** এবং **অক্রমসৃষ্টি** অর্থাৎ **এককালীন সৃষ্টি,** উভয়বিধ বাক্যই বিদ্যমান। ইহার তাৎপর্য কি? সৃষ্টি যদি সত্য হয় তবে উহা নিশ্চয়ই কারণ হইতে একটা সুনির্দিষ্ট ক্রমেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। কিন্তু শ্রুতি উভয়বিধ সৃষ্টির কথা বলিয়া বিষয়টি সন্দেহাকুল করিয়া দিয়াছেন।

এই সন্দেহের নিরসনে উত্তরস্বরূপে ইহাই বলিতে হয় যে, সৃষ্টি একান্ত মিথ্যা, মিথ্যাবস্তুর প্রতিপাদনে বা বর্ণনায় শ্রুতির বিশেষ আগ্রহ নাই। যথার্থ সত্যবস্তুর—ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য। মিথ্যাবস্তুর সৃষ্টি যেরূপভাবে হয় হউক তাহাতে কোন সার্থকতা নাই। সুদীর্ঘকালীন দ্বৈতসত্যত্বসংস্কারপুষ্ট মানসে ক্রমসৃষ্টির কথা উপাদেয় হইয়া থাকে। কিন্তু **বিচারবানের শুদ্ধচিত্তে, স্বপ্নপদার্থের ন্যায়, দ্বৈতবস্তুর এককালীন সৃষ্টির কথাই অধিক রমণীয় বলিয়া প্রতিভাত হয়।**

শ্রীশ্রীমা আশ্রিত সেবকের প্রশ্নের উত্তরে ইহারই ইঙ্গিত করিতেছেন নাকি? মা বলিতেছেন—**'সব সৃষ্টি এককালেই হইয়াছে। একটি একটি করে হয়নি।'** আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'স্বপ্ন বইকি! **জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (জাগ্রৎ অবস্থা) একটা স্বপ্ন।'**… 'স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়।'

শ্রীশ্রীমা জগৎটাকে, জাগ্রদবস্থাকেও একটা স্বপ্ন বলিতেছেন। ঐতরেয় উপনিষদেও ঠিক এই ধ্বনিই শুনিতে পাই (১।৩।১২) 'এই জীবভূত আত্মার তিনটি বাসস্থান এবং (এই) তিনটিই স্বপ্ন (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিনই স্বপ্ন)।'

স্বপ্নে আমাদের কল্পনায় সর্ববস্তু, সর্বপ্রাণী একই কালে মানসপটে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। উহাতে কোন কার্যকারণপরম্পরা দৃষ্ট হয় না। পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সবই একই সময়ে প্রতিভাসিত হয়। পুনঃ স্বপ্নভঙ্গে ঐ সমস্তই একই কালে বিলীন, অদৃশ্য হইয়া যায়। অবশেষে থাকেন এক চেতনসত্তা, যাঁহার উপর কিছুকালের জন্য বিচিত্র দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকটিত হইয়াছিল। উহা তৎকালে সত্য বলিয়াও মনে হইয়াছিল এবং উহা কত সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, হাসি-কান্নার খেলা দেখাইয়াছিল। জাগ্রতে ফিরিয়া আসিলে স্বপ্নের ঐ বিচিত্র খেলা যেমন নিঃশেষে বিলয় হইয়া যায়, জাগ্রৎ জগৎটাও ঠিক তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে কোথায় যেন মিলাইয়া যায়। উহার আর চিহ্নমাত্রও অবশেষ থাকে না।

এই নিয়ত পরিবর্তনশীল, বিকারী, দুঃখময়—অতএব মিথ্যাভূত জগৎটা স্বপ্নের ন্যায় একান্ত-

ভাবে আমাদের মনেরই একটা কল্পনামাত্র। ইহাই শ্রীশ্রীমা বলিলেন।

অদ্বৈত-বেদান্তেও এই অতি উত্তম সিদ্ধান্ত তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছে :

'ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥'

—জীব বলিয়া কিছু বস্তুতঃ জাত হয় নাই, জগতেরও বাস্তব উৎপত্তি কোনকালে হয় নাই। এক নির্গুণ; নির্বিশেষ পরব্রহ্ম আপন মহিমায় সদা আপনি বিরাজিত, জন্ম-মৃত্যু এই সব আবিদ্যক মিথ্যা কল্পনামাত্র। ইহাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত।

আমাদের শ্রীশ্রীমা গ্রাম্য পরিবেশে লালিতা, পালিতা, বর্ধিতা। স্থূলতঃ লেখাপড়াও বিশেষ জানিতেন না। তাঁহার পরমপ্রিয় আশ্রিত সন্তান সদা বালকস্বভাব, অধুনা বৃদ্ধ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর মুখে শুনিয়াছি মার পুথিগত বিদ্যার পরিধি ছিল বাংলা বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের ঐক্য, বাক্য ইত্যাদি শব্দ পর্যন্ত। শংকা হয়, তাঁহার মুখ দিয়া বেদান্তের এই সব উচ্চ তত্ত্বকথা বাহির হইল কি করিয়া? বর্ণপরিচয়ের ঐ পর্যন্ত বিদ্যার পর তো আর তাঁহার অধিক বিদ্যাভ্যাসের কোন সুযোগ বা সুবিধাই হয় নাই। বেদবেদান্ত পড়া তো দূরের কথা। উত্তরে বলিতে হয়, শুদ্ধনির্মল দর্পণে আদিত্যের প্রকৃষ্ট প্রকাশের ন্যায় শ্রীশ্রীমার শুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষায় বেদান্তের অতি উচ্চ তত্ত্বসমূহও অপরোক্ষ অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই অনুভবোজ্জ্বল বাণীই তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃ স্ফুরিত হইয়াছিল।

স্বপ্নসৃষ্ট মনঃসমকালীন সৃষ্টি। উহা স্বপ্নদর্শনের পূর্বেও থাকে না, স্বপ্নভঙ্গের পরেও থাকে না, কেবল স্বপ্নকালেই উহার প্রতীতি হইয়া থাকে মাত্র। জাগ্রদবস্থাকেও একটা স্বপ্ন বলিয়া ঘোষণাকরতঃ শ্রুতি ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যপদার্থসমূহেরও কল্পনা অর্থাৎ প্রতীতিকালাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই। শ্রীশ্রীমার কথায়ও শুনিতে পাইতেছি এই শ্রুতি সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। বেদান্তোক্ত চরম অনুভূতিসম্পন্ন সকল ব্যক্তিগণের এই একই অনুভব।

সৃষ্টি প্রতীতিসমকালীন—ইহাই বেদান্তোক্ত **দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ**। ইহা শংকর-পরবর্তী -যুগের আচার্যগণের স্বকপোলকল্পিত কোন মতবাদমাত্র নহে। ইহা অদ্বৈত-বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত।

আচার্য শংকর বলিয়াছেন :

'স্বপ্নের প্রভাবে যেমন নিজের অন্তঃস্থ (কল্পিত) বস্তুই বহির্ভাগে স্থিত বলিয়া মনে হয়, তেমনি মায়া দ্বারা বিশ্ব বহির্ভাগে বিরচিত হইলেও যিনি উহাকে দর্পণে দৃশ্যমান (প্রতিবিম্বিত) নগরের ন্যায় আপনার মধ্যেই অবস্থিত বলিয়া জানেন এবং সমাধি অবস্থায় আপনার অদ্বিতীয় স্বরূপমাত্রকেই প্রত্যক্ষ করেন, সেই গুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার।'—(দঃ মূঃ স্তোত্র, ১)

জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা জানিয়াও আচার্য শংকর কত লোকহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে বলা হয়, 'ষণ্মতস্থাপনাচার্য'—অদ্বৈত-বেদান্তের ভিত্তিতে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য, গণেশ ও কার্তিক—এই দেবদেবীগণের উপাসনা ও মন্দির নির্মাণ তিনি ভারতের সর্বত্র পর্যটনকালে প্রচার করিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের জন্য নহে। সবই পরোপকারার্থে। জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিলে জগতের প্রতি ঔদাসীন্য, নির্মমতা ও কর্মস্পৃহারাহিত্য হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের উহা ভ্রান্ত ধারণা। সব স্বপ্ন জানিলেও হৃদয়ের কোমল বা কঠোর বৃত্তিগুলি ব্যবহার-কালে থাকেই। তাহারা তাহাদের কাজ করিয়া যায়। অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সেই দুঃখ দূর করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টাই তাঁহারা করেন।

সুতরাং দৃষ্টিসৃষ্টিসিদ্ধান্ত অলসতার প্রশ্রয় দেয় না। মিথ্যা অবিদ্যা মোহমুগ্ধ মানবের অশেষ দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাদের মন করুণায় ভরিয়া যায়। মিথ্যাবস্তুতে সত্যত্বাভিনিবেশ করিয়া লোকে কত কষ্টই না পাইতেছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের মন দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। জমি লইয়া ভাইদের ঝগড়া দেখিয়া শ্রীমার অট্টহাসি। মা বলিতেছেন—'কি মহামায়া মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে, এও পড়ে থাকবে। জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না!' 'ওরা চায় টাকা, তাই দি।' করুণায় আক্ষেপ করে আশ্রিতা কন্যা রাধুকে বলছেন—'রাধি, আমার কাছ থেকে তুই কিছুই নিলি নি? তোর মার গুণই সব পেলি?' অসুস্থ সেবককে পীর বাবার প্রসাদ ধারণ করিতে দিয়া মা কাতর-স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—'পীর বাবা! আমার গো—কে ভাল করে দাও বাবা।' স্নেহময়ী মাতার সে কি আকুল প্রার্থনা! মনে রাখিতে হইবে যে, এই মা-ই আমাদের বলিয়াছেন যে জগৎটা একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং জগৎ-স্বপ্ন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি শুকাইয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে শ্রীস্বামীজীর বাণীও স্মরণ করি :

'উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর।
স্বপ্ন রচনা শুধু ভবে॥—···
···অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যাগ্রহী, সত্যের আশ্রয়ে,
মিশে সত্যে যাও এক হ'য়ে,
মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক্—
কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক্ স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক্ প্রেম নিরবধি ॥'

শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যতম প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

শ্রীশ্রীমা একটি ত্যাগী ভক্ত সন্তানকে বলিতেছেন (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।২৮৬) : "যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার এক্ষুণি হয়।"

সংসার-বন্ধন-মুক্তি বিষয়ে পুনঃ একটি স্ত্রীভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: "স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল—সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটতে না পারলে পার পাওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বইতো নয়? তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক্ না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল…।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১।১১৬)

শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি অতি প্রসন্ন, সরল, মধুর, মর্মস্পর্শী ও সাবলীল কিন্তু উহার তাৎপর্য অতি গম্ভীর। তাই এই বিষয়ে বেদান্ত কি বলেন আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীমার বাণী—"ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।" ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা অর্থ—তত্ত্ববিচার। তত্ত্ব অর্থাৎ (তৎ ও ত্বম্) পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপবিষয়ক বিচার।

বেদান্তের ঘোষণা—"বিচারাৎ জায়তে জ্ঞানম্, জ্ঞানাৎ মোক্ষমবাপ্যতে।"—তত্ত্ববিচার-প্রভাবেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ-প্রাপক।—বেদান্তের এই কথাটিরই সমর্থন বা ইঙ্গিত মায়ের কথাতে পাওয়া যাইতেছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন: "মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে'—ভাল করে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোন জিনিষ নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা 'আমি'? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমি' বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে তাই আত্মা—চৈতন্য। 'আমার' 'আমিত্ব' দূর হলে ভগবান দেখা দেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, ১১১)।—ঠাকুরের এই উপদেশটিতেও আমরা দেহাত্মবুদ্ধিত্যাগের সুন্দর বিচারধারা লক্ষ্য করিতেছি। ইহাও বেদান্তোক্ত বিচারধারারই প্রতিধ্বনি—ইহা আমরা পরে লক্ষ্য করিব।

বিচারই বেদান্তের একমাত্র মুখ্য সাধন। বেদান্ত বলেন, দেহেতে আত্মত্ববুদ্ধিই সর্ব বন্ধনের, সংসার দুঃখের মূল। মায়াপ্রভাবে আমরা নিজ পারমার্থিক নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি ভুলিয়া নিজেকে দেহমনবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি ও সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি—ইহাই আশ্চর্য!

শ্রুতি বলেন, যিনি নিজেকে অভয় ব্রহ্মরূপে জানেন তিনি অভয় ব্রহ্মরূপ-ই হইয়া যান। গুরু সম্প্রদায়বিদ্ শ্রুত্যেকশরণ আচার্যগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, শ্রুতিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা উপায় অবলম্বনেই বিচার সহায়ে জ্ঞানোদয়ে জীবের মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রুতির মুখ্য উপদেশ—'নেতি, নেতি'। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি-তেছি উহার কোনটিই সত্য নহে। সর্বদৃশ্যপ্রপঞ্চ এইরূপে নিষিদ্ধ হইয়া গেলে সর্বশেষে নিষেধের (বা বাধের) অযোগ্য যে বস্তু থাকেন তাহাই ব্রহ্ম। তাহাই স্বরূপতঃ তুমি।

এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি প্রথম ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-আদি কল্পনা করিয়া আত্মাতে ক্রিয়া কারক ফলাদির অধ্যারোপ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আত্মা (জীব) পুণ্য-পাপাদিকর্মের কর্তা ও হস্তপাদাদিমান শরীরধারী, এইরূপ আরোপ করিয়া থাকেন। পুনঃ বিচার সহায়ে ঐ আরোপিত বিশেষতাসমূহ নিষেধ অর্থাৎ 'অপবাদ' করিয়া জীবকে শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। যেমন কাগজ, কালি, রেখা প্রভৃতি সহায়ে অক্ষরজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু কাগজ, কালি কোনটাই অক্ষর নহে। তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-আদির মূল কারণ এক ব্রহ্ম ইহা বুঝাইয়া কল্পিত সর্ববিশেষতার নিবৃত্তির জন্য 'নেতি, নেতি'—এই উপদেশ সহায়ে সর্ববস্তুর অপবাদ করিয়া থাকেন।

এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ'-রূপ প্রক্রিয়াই বেদান্তোক্ত সর্বপ্রক্রিয়া বা বিচারধারার মূল। ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ উৎপাদন করাইবার জন্য এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ' ভিন্ন অন্য কোন উপায় বা প্রক্রিয়া বেদান্তে নাই। আচার্য শংকরও স্বকৃত ভাষ্যাদিতে ইহা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত ও সর্ববিশেষণ-রহিত। সর্বাত্মা ব্রহ্ম কোন সাধনদ্বারা প্রাপ্য না হইলেও শ্রুতি তাহাতে প্রাপ্যত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। সিদ্ধবস্তু ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অজ্ঞানবশতঃ ভ্রমে উহা অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ভ্রম, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন সাধনদ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। ভ্রম নিবৃত্ত হইলেই ব্রহ্ম যেন

পুনঃ প্রাপ্ত হন। এইরূপে ব্রহ্মের প্রাপ্যত্ব অধ্যারোপিত ও জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনের অপবাদ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলা হয়, ইহারও তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞেয় নাই। ব্রহ্মে জ্ঞেয়ত্বের আরোপ ও ব্রহ্মভিন্ন সর্বপদার্থের জ্ঞেয়ত্বের অপবাদ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মে সর্ব-কারণত্বও আরোপিত, উহাদ্বারা কার্যত্বের নিষেধ অভিপ্রেত। এইরূপে কারণত্বও নিষিদ্ধ হইলে অবশেষে সর্ববস্তুর স্বরূপ এক ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন।

বেদান্তোক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা বিচারধারার একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) **সামান্যবিশেষ প্রক্রিয়া :** বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুন্দুভি (ভেরী), শংখ ও বীণার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। ঐ সকলে আঘাতজন্য সামান্যধ্বনি ও বিশেষধ্বনির ভেদ থাকিলেও সামান্যধ্বনি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষধ্বনিকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সামান্যধ্বনি হইতে অতিরিক্ত কোন বিশেষধ্বনি হইতেই পারে না। শব্দ সামান্য ও বহুবিধ হইতে পারে। পুনঃ ঐ সকল শব্দসামান্য একটি শব্দ মহাসামান্য হইতে পৃথক্ নহে। রূপরসাদি বিষয়েও এরূপ বোদ্ধব্য। পরিশেষে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হয় যে, এক সৎসামান্য হইতে ভিন্ন অন্য কোন সামান্যবিশেষ-ভাব হইতেই পারে না। সর্ববস্তুতেই এক সত্তা অনুগত। উহাই আত্মা। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে এক আত্মারূপ সত্তা সর্বত্র সমভাবে একরূপে বিদ্যমান। এইরূপে দেখা যায় বিশেষ সত্তা কল্পিত ও এক সত্তাসামান্যই সত্য। বিশেষ সত্তার অপবাদ দ্বারা স্থাপিত এক সত্তাসামান্যভাবও কল্পিত বা অধ্যারোপিত, কারণ সুষুপ্তি প্রলয়াদি-কালে এক আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও উহাতে সত্তাসামান্যভাব বলিয়া কিছু থাকে না। অতএব সত্তাসামান্য বলিয়া কিছু বিশেষ বস্তু নাই। উহাও একটা অধ্যারোপ মাত্র। এক আত্মাই আছেন। চিদ্‌বস্তুব্যতিরিক্ত সামান্যবিশেষভাব বলিয়া কিছু নাই। সামান্যবিশেষভাবরহিত চিদাত্মাতে বুদ্ধির প্রবেশ করাইবার জন্যই এই সামান্যবিশেষভাবের কল্পনা। ইহা 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়ার একটি অবান্তর ভেদ, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(খ) **দৃগ্‌দৃশ্যবিচার প্রক্রিয়া :** দৃশ্যত্ব নিষেধ করিবার জন্য আত্মাতে দ্রষ্টৃত্ব আরোপিত হয়। ইহাও দ্বৈতরাহিত্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একটি উপায় মাত্র। দ্রষ্টৃত্ব ব্রহ্মবোধ উৎপাদনের একটি উপায়। ব্রহ্মই একমাত্র দ্রষ্টা, ইহা জানা সুগম। ইহাও একটি অধ্যারোপ। সর্বশেষে এই আরোপিত দ্রষ্টৃত্বও নিষিদ্ধ হইয়া এক দৃগ্‌-মাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন।

ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে বাহ্যবিষয়সমূহ আমরা অনুভব করিয়া থাকি। এ স্থলে চেতন জীব দ্রষ্টা ও জড় বিষয় দৃশ্য। বিচার দ্বারা দৃশ্য বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করাকেই 'দৃগ্‌-দৃশ্যবিবেক' নামে বলা হইয়া থাকে। দ্রষ্টা সর্বদা 'অহং' বা 'আমি'—এই বোধের বিষয়, আর দৃশ্য 'ইদং' বা 'ইহা'—এইরূপ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। দ্রষ্টা কখনও 'ইদং' অর্থাৎ দৃশ্যকোটির অন্তর্ভুক্ত হন না। যদি দ্রষ্টা কখনও দৃশ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাহা গৌণ বা মিথ্যা দ্রষ্টা। যেমন বলা হয় যে, রাজা চররূপ চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন। এখানে বস্তুতঃ চরই সব দর্শন করে। রাজার দ্রষ্টৃত্ব এস্থলে গৌণ, মুখ্য নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি দর্শন করে, এখানে দেহেন্দ্রিয়াদির দ্রষ্টৃত্ব মিথ্যা, গৌণ নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি সর্বথা দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা হলেন চেতন আত্মা। দেহেন্দ্রিয়াদি জড়, উহারা দ্রষ্টা হইতে পারে না। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার স্বভাবভূত জ্ঞান বা দৃষ্টিই

পারমার্থিক দ্রষ্টৃত্ব। লৌকিক ঘটপটাদির জ্ঞান-রূপ দৃষ্টি অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপা বলিয়া উহা অনিত্য। বিষয়াকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইলেই চৈতন্য ব্যাপ্ত হইয়া উহাতে চিদাভাস উৎপন্ন হওয়াতে সকলে উহাকেই জ্ঞান বা দৃষ্টি বলিয়া থাকে। অন্তঃকরণ-বৃত্তির আরোপের অপেক্ষাতেই লৌকিক দ্রষ্টৃত্ব হইয়া থাকে। দেহমন ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমান-বশতই আত্মচৈতন্যে প্রমাতৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব আরোপ হয়। লৌকিক দ্রষ্টা সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে থাকে না। তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী বিভাগ-রহিত সর্বব্যবহারাতীত এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন। উহাই পরমাত্মার অলুপ্তদ্রষ্টৃত্ব। এই জ্ঞান হইলে দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যরূপ বিভাগ অপবাদ অর্থাৎ নিরাকরণ হইয়া যায়। জাগ্রৎ স্বপ্নে এক চৈতন্যজ্যোতিকেই উপাধিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি বা জ্ঞান বলা হয় মাত্র। উহা আত্মার পরিচ্ছিন্ন রূপ, মিথ্যারূপ, কারণ উহা ঔপাধিক। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিবশতই আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ ও কর্মের আরোপ হইয়া থাকে। কেবল জ্ঞপ্তি বা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই পারমার্থিক দ্রষ্টা।

(গ) **পঞ্চকোশবিচার প্রক্রিয়া :** উপনিষদে পঞ্চকোশবিচারের বিষয় বলা হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়াদি কোশে ক্রমশঃ আত্মত্ব অধ্যারোপ করিয়া পূর্বপূর্ব কোশের আত্মত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এইরূপে বুঝানো হইয়াছে যে, আত্মা পঞ্চকোশাতীত ও সর্বদ্বৈত-কল্পনারহিত। যথা : তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান, অনন্ত—এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া তৎপর বলিয়াছেন যে, এই ব্রহ্মকে বুদ্ধিরূপ গুহাতে জানিতে হইবে। তদনন্তর ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি-ক্রমে জগৎ ও দেহাদি সৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছেন। অন্ন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভৌতিক দেহকে অন্ন-রসময় বা অন্নময় কোশ বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকে এই দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন। এই আরোপের অনুবাদপূর্বকই শ্রুতি বলেন যে, ইহা আত্মা নহে। ইহা হইতে ভিন্ন ও আন্তর প্রাণময় কোশই আত্মা। এইরূপে অন্নময় কোশে গৃহীত স্বাভাবিক আত্মবুদ্ধি প্রাণময়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশরূপ আত্মা বর্ণন করিয়া সর্বশেষে উহার পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন ও উহাই সর্বান্তর আত্মা এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। বিচার্য এই যে, পুরুষের পাঁচটি আত্মা হয় না। বহিরঙ্গ কোশে আত্মবুদ্ধিকে, অন্তরঙ্গ কোশে ও সর্বশেষে সর্বান্তরতম ব্রহ্মে জীবকে পরিনিষ্ঠিত করাই এখানে শ্রুতির তাৎপর্য। এই প্রক্রিয়ায় উত্তর উত্তর কোশে আত্মবুদ্ধি আরোপ করতঃ পূর্বপূর্ব কোশের আত্মত্ববুদ্ধি অপবাদ করা হইয়াছে। সর্বশেষে এক ব্রহ্মেই আত্মবুদ্ধি নিশ্চিত-রূপে প্রমাণিত হওয়ায় এই পঞ্চকোশবিচারও ব্রহ্মাবগতির একটি উপায় বা প্রক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

আমরা দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন : "দেহাত্ম-বুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা এই কথাই লক্ষ্য করিয়াছি। উভয়বিধ বাণীতেই শ্রুত্যুক্ত 'পঞ্চকোশবিচারের' কথাই স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর কথিত স্থূলদেহ বা অন্নময়কোশ এই স্থলে পঞ্চকোশের উপলক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

(ঘ) **অবস্থাত্রয়বিচার প্রক্রিয়া :** জীবের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। স্বপ্ন ও জাগ্রতে দর্শনাদি ক্রিয়া হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহা হয় না। চৈতন্যরূপ আত্মার আশ্রয়েই এই তিন অবস্থার সত্তা ও প্রতীতি হইয়া থাকে। অবস্থাসমূহ পরিবর্তনশীল। কিন্তু অবস্থাগত ধর্ম হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ ও উহাদের সহিত অসংবদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্বাবস্থাতে অনুগত

থাকেন। আত্মচৈতন্য বিনা উক্ত অবস্থাত্রয়ের ও তাৎকালিন প্রপঞ্চের উপলব্ধিই হইতে পারে না। অতএব এক আত্মাই সত্য ও তদ্ভিন্ন অবস্থাদি সব মিথ্যা। সুষুপ্তিতে জীব পরমাত্মাসহ একীভূত হইয়া অবস্থান করে। সুতরাং এক নিষ্প্রপঞ্চ সৎস্বরূপ আত্মাই জীবের যথার্থ স্বরূপ—ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে স্বপ্ন বা জাগ্রতের কোন পদার্থের অনুভবই হইতে পারে না। ঐ সকল বস্তুসমূহ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। উহা জ্ঞানস্বরূপই। সুষুপ্তিকালে জীব সৎসহ এক হইয়া যায়। ঐকালে স্ব-লীন হইয়া যায় বলিয়াই ঐ অবস্থার নাম 'স্বপিতি'। যদিও সর্বাবস্থাতে আত্মা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপেই অবস্থান করেন, তথাপি অবস্থাসমূহ পরস্পর একে অপরটিতে থাকে না। এজন্যই অবস্থানগুলি রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা আর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সর্বাবস্থাতে অব্যভিচরিতরূপে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া সত্য।

স্বপ্নে কল্পিত দেহাদিতে ও জাগ্রদবস্থাতে স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানী বলিয়া জীবের প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব প্রতীত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে ঐ অভিমান না থাকাবশতঃ প্রমাতৃত্বও থাকে না। এজন্যই শ্রুতি বলেন যে, সুষুপ্তিকালে জীব আপনস্বরূপে লয় হইয়া যায়। স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি কাহারও হইতে পারে না। অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রতের প্রমাতৃত্ব একটা আভাস বা প্রতীতি-মাত্র। স্বপ্নাবস্থার প্রমাতৃত্ব যে একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ। ইহা সর্বসম্মত যে, স্বপ্নাবস্থায় শরীর ইন্দ্রিয়াদিসহ আত্মার কোন বাস্তব সম্বন্ধ হয় না। তথাপি জাগ্রতের ন্যায় সে অবস্থায় জীবের শ্রোতৃত্ব, জ্ঞাতৃত্বাদি সবই প্রতিভাত হয়। অতএব স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রতের প্রমাতৃত্বাদিও মিথ্যা উপাধিকৃত। উভয় অবস্থাই সর্বতোভাবে তুল্য। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্ন জাগ্রতের মতোই মনে হয়।

সুষুপ্তিতে জীব সদাত্মাসহ এক হইয়া যায়—এই শ্রুতি জীবের স্বাভাবিক অবস্থাবোধক। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে অবিদ্যাকল্পিত প্রমাতৃত্ব ও অন্যরূপপ্রাপ্তি মিথ্যা। ইহার সহিত তুলনা করিয়াই সুষুপ্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। এই জন্যই এই স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি ও পররূপ প্রাপ্তির কথা 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়ার অনুসারেই বলা হয়। উহার উদ্দেশ্য ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ উৎপাদন ছাড়া আর কিছুই নহে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় উপাধিসম্বন্ধবশতঃ আত্মার যেন পররূপপ্রাপ্তি হয়। উহার অপেক্ষাতেই সুষুপ্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তি বলা হয় মাত্র, কারণ এই অবস্থাতে আত্মার কোন উপাধিসম্পর্ক থাকে না। বস্তুতঃ সর্বাবস্থাতেই আত্মা স্বরূপতঃ নিরুপাধিক নির্বিশেষ চৈতন্যরূপেই বিদ্যমান থাকেন। স্বপ্নে দেহেন্দ্রিয়াদি কিছু না থাকিলেও মুহূর্তমধ্যে যেমন কল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদি ও তজ্জনিত ব্যবহারাদি অনুভব হইয়া থাকে, জাগ্রতেও তদ্রূপ।

অবস্থাত্রয়-প্রক্রিয়া সহায়ে বিচার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, আত্মা সর্ব অবস্থা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্। এই পৃথকত্বকেই তুরীয় বলা হয়। তুরীয় কোন অবস্থাবিশেষ বা অজ্ঞাত বস্তুবিশেষ নহে। অবস্থাত্রয় হইতে পৃথকত্বই আত্মার তুরীয়ত্ব। তিন অবস্থার বর্ণন, এই তিন অবস্থাসহ আত্মার মায়িক সম্বন্ধজ্ঞাপন (ইহাই অধ্যারোপ) ও পুনঃ উহার নিষেধ (অপবাদ) দ্বারা ঐ সমূহ অবস্থার অতীত সর্ব অবস্থাবিহীন আত্মার প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি নানা উপায়ে ব্রহ্ম-স্বরূপ অববোধ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রথম দেহেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ অধ্যারোপ

করিয়া তৎপর উহার অপবাদ (নিরসন বা নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব) প্রতিপাদন করিতেছেন। এই প্রক্রিয়াসমূহের যে কোন একটির বিচার করিলে অবশেষে বুদ্ধি সর্বপদার্থের অভাবদ্বারা উপলক্ষিত একমাত্র শুদ্ধ-প্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপেই থাকিয়া যায়। 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়া ব্যতীত ব্রহ্মাববোধের আর অন্য কোন উপায় নাই।

দেহাত্মবুদ্ধির ত্যাজ্যতা অর্থাৎ অপবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রীশ্রীমা বেদান্তোক্ত 'অধ্যারোপ-অপবাদ' রূপ প্রক্রিয়ার কথাই সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিলেন না কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা উহাই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম সকলের আত্মা। উহা সদা অপরোক্ষ স্বভাব হইলেও অবিদ্যাবশতঃ জীবের নিকট আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত হইয়া আছে। এই অবিদ্যানিবৃত্তির একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানা। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান—যাহার বিষয় প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমার কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবের স্বরূপ-বিস্মরণকারী অবিদ্যার নাশ করিবার আর অন্য কোন সাধন বা উপায় নাই। তত্ত্ববিচারই এই জ্ঞানলাভ করিবার একমাত্র সাধন।

কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিষয়-ভোগবাসনার দ্বারা কলুষিত, তাহাদের পক্ষে বেদান্তের এই শুদ্ধ বিচারমার্গ পর্যাপ্ত নহে। বিচারের গভীর প্রদেশে তাহাদের মন প্রবেশই করিবে না। তাই তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ চিত্তকে প্রত্যগাত্মাভিমুখী করিবার জন্য নিষ্কামকর্ম, বিবিধ উপাসনা, যোগাভ্যাসাদি নানা উপায় শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। দুশ্চরিত্র, দুষ্ট আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হইলে ধর্মলাভ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানলাভ সে ব্যক্তির পক্ষে শুধু সুদূরপরাহত নহে, একান্ত অসম্ভব।—"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ"—শুদ্ধ আচরণবিহীন পুরুষের কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। 'কঠ' উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন: "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ···।" (১।২।২৩)

অন্তঃকরণের মল, বিক্ষেপ ও আবরণ এই ত্রিবিধ দোষের জন্যই তত্ত্ববিচারে মন নিবিষ্ট হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ও হয় না। মল (পাপাদি ও বিষয়-ভোগবাসনার সংস্কার), বিক্ষেপ (বিষয়চিন্তাজনিত চাঞ্চল্য) ও আবরণ (অজ্ঞান) এই তিনটিই প্রধান প্রতিবন্ধক। মলবিক্ষেপরহিত শুধু আবরণমাত্রাবশিষ্ট সাধকই বেদান্তোক্ত বিচারমার্গের অধিকারী।

নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানে যাহার চিত্ত মলদোষরহিত হইয়া কথঞ্চিৎ শুদ্ধ ও অন্তর্মুখ হইয়াছে, তাহারই উপাসনাতে অধিকার, কারণ উপাসনা মানস-সাধনা। বিষয়বিক্ষিপ্ত চিত্ত দ্বারা উপাসনা হয় না। কথঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত ও অন্তর্মুখ পুরুষের পক্ষেই উপাসনা সম্ভবপর। উপাসনা দ্বারা বিক্ষেপ দূর হইয়া চিত্ত একাগ্র হইয়া থাকে। একাগ্রচিত্ত পুরুষই বেদান্তবিচারসমর্থ। ঐরূপ অন্তর্মুখ সাধকের জন্য শ্রুত্যুক্ত শমদমাদি (মুণ্ডক উপনিষদ্, ১।২।১৩) ও স্মৃত্যুক্ত অমানিত্বাদি (গীতা, ১৩।৭—১১) তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সাধন। নিষ্কামকর্ম বাহ্য প্রতিবন্ধক দূর করে মাত্র। শুদ্ধচিত্ত সাধকের পক্ষে শমদমাদি সাধন অতি সুলভ। পূর্বজন্মানুষ্ঠিত নিষ্কাম-কর্মাদির দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষের আর বর্তমান জন্মে নিষ্কামকর্মাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয় নহে। কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক বলিয়া পরম্পরাক্রমে মোক্ষের সাধন।

উত্তমাধিকারীর উপদেশবাক্য শ্রবণমাত্রই জ্ঞান ও কৃতার্থতা হইয়া থাকে। তাহার আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। একবার বেদান্তবাক্য শ্রবণমাত্র যাহার বাক্যার্থানুভব হয়

না, তাহার পুনঃ পুনঃ বাক্যশ্রবণ ও চিত্তগত সংশয়াদিদোষ দূর করিবার জন্য মনন অর্থাৎ তত্ত্বানুকূল বিচার প্রয়োজন, যে পর্যন্ত জ্ঞানোদয় না হয়। মন্দপ্রজ্ঞ অধিকারীর এইরূপ অভ্যাসবলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়টিই শ্রীশ্রীমা সুন্দর দৃষ্টান্ত সহায়ে বলিয়াছেন : "যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে সুগন্ধ বের হয়, তেমনি তত্ত্ববিচার করতে করতেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"

শ্রবণ ও মনন দ্বারা তত্ত্বানুভবে অসমর্থ পুরুষের নিদিধ্যাসন প্রয়োজন। শমদম, অমানিত্বাদি শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সাধন সকলের অভ্যাস যাবজ্জীবন প্রয়োজন, কারণ উহা দ্বারা জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া থাকে। সদা আত্মৈকপরতাই জ্ঞাননিষ্ঠার লক্ষণ। জ্ঞানমার্গে নিদিধ্যাসন অর্থ অন্য বস্তু হইতে মনকে ব্যাবৃত্ত করিয়া বস্তুদর্শনার্থ প্রযত্নমাত্র। উহা যোগশাস্ত্রসম্মত ধ্যান নহে। রত্নপরীক্ষক যেমন বারবার রত্ন নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, নিদিধ্যাসনাভ্যাসীও তদ্রূপ বস্তুতত্ত্বনিশ্চয়ার্থ একাগ্রতাসহকারে বস্তুতেই চিত্ত স্থাপিত করিয়া বস্তুনিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বস্তুবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যাওয়ার নামই জ্ঞান। জ্ঞানোৎপত্তির পর আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তখনই জীবের পরমানন্দস্বরূপপ্রাপ্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে। রোগী দুঃখী জীব যেরূপ রোগনিবৃত্তির পর স্বস্থতা অনুভব করে তদ্রূপ দুঃখদ দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ উহা একান্ত মিথ্যা একটা সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র ইহা নিশ্চিত হইলে জীবের দেহাধ্যাসমূলক যাবতীয় সংসারদুঃখ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানের প্রয়োজন। তখন জীব জানে যে তাহার দুঃখ কোনকালেই ছিল না। ভ্রান্তিবশতই সে এতকাল নিজেকে দুঃখী, কর্তা, ভোক্তা মনে করিয়া নিজের যথার্থ পরমানন্দস্বরূপটি ভুলিয়া ছিল। এরূপ অবস্থাকেই স্বরূপাবস্থান বা পরপ্রাপ্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়।

এই অপূর্ব স্থিতির বিষয়টিই শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথার শেষে ব্যক্ত করিলেন "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া। অর্থাৎ প্রলয়ে যিনি সর্বজগতের হরণ বা উপসংহার নিজেতে করিয়া থাকেন, কার্যপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের সেই একমাত্র কারণ হরি বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সব মিথ্যা। এই সত্য বস্তু ব্রহ্মকে জানা ও তাঁহাতে স্থিতিই জীবের একমাত্র কাম্য। এত সাধের নিজ দেহটিও কতকগুলি ছাই ছাড়া আর কিছুই নয়। লৌকিক ব্যবহারে ছাই শব্দ তুচ্ছতা বা অভাববোধক। শ্রীশ্রীমা তাহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, দেহাদি সর্বপদার্থ একান্তই মিথ্যা, উহা বস্তুতঃ নাই। উহা মরুমরীচিকা, স্বাপ্নপদার্থ বা ভ্রান্তিদৃষ্ট রজ্জুসর্পের ন্যায় একটা সত্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র।

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ পূর্ব ভ্রান্তিজ্ঞানের অনুবর্তন হইলেও অর্থাৎ তিনি পূর্ববৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী এরূপ ব্যবহার করিলেও তাহা দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের কোন হানি হয় না। লোককল্যাণার্থ কর্ম করিলেও তাঁহার কোন কর্মবন্ধন হয় না। মুমুক্ষুদের উপদেশাদি প্রদান কালেও তাঁহার কোন বাস্তবিক কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তের স্থিতি। জীবন্মুক্ত জ্ঞানী শরীরে বিদ্যমান থাকিয়াও বস্তুতঃ অশরীরী, কারণ তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি নাই। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি এখন অমৃতস্বরূপ। তাই শ্রীশ্রীমা বলিলেন :

"দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" "কিসের দেহ মা! দেড় সের ছাই বই তো নয়? — তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক্ না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল…।" এক হরি বা সর্বকারণ ব্রহ্মই চিন্তনীয়। তাঁর কথাই বলা, তাঁকে জানাই কর্তব্য। তাহা হইলেই মানবজীবন সার্থক হইবে, জীবন মধুময় হইবে। ইহাই শ্রীশ্রীমায়ের কথার অভিপ্রায়।

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু'

স্বামী ধীরেশানন্দ *

ভাবুক বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :—

'আমি সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' —ইহা ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতার খেদোক্তি নহে, ইহা যে সংসারে সকল প্রাণীরই চিরন্তন মর্মভেদী ক্রন্দন, হতাশার হাহাকার ধ্বনি! মানুষ কত আশায় বুক বাঁধিয়া অশেষ কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করে, ঘর বাঁধে, পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় এবং মনে করে যে অতঃপর সকলকে লইয়া নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে পরম শান্তিতে, মহাসুখে দিনাতিপাত করিবে। কিন্তু অলক্ষ্যে তাহার অদৃষ্টদেব হাসেন। অদৃষ্টের অলংঘনীয় নিয়মে, নিষ্ঠুর দৈবের রূঢ়, নির্মম কশাঘাতে মানুষের এই সুখস্বপ্ন একদিন যেন তাসের ঘরের ন্যায় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার বড় সাধের সাজানো বাগান যেন অকস্মাৎ শুকাইয়া যায়। তখন তাহার অশান্ত, শোকমুহ্যমান চিত্তে কেবল নৈরাশ্যের করুণ সুরটিই বাজিতে থাকে, জীবন দুর্বিষহ দুঃখময় বলিয়া মনে হয়। স্বামীজী বলিতেন—'দুঃখের মুকুট মাথায় পড়িয়া সংসারে সুখ আসিয়া মানুষের নিকট উপস্থিত হয়।' ইহা রূঢ় বাস্তব। সুখ ও দুঃখ মানুষের নিত্য-সহচর।

দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সকলেই নিজের অনুকূল বস্তুটি কামনা করে এবং স্বার্থবিরোধী পদার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সুখপ্রদ হইলে কোন বস্তুকে সে গ্রাহ্য মনে করে এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ দুঃখপ্রদ পদার্থকে সে ত্যাজ্য বলিয়া জানে।

মানুষ কি চায় না, অর্থাৎ কোন্‌টি তাহার ত্যাজ্য ইহাই প্রথম বিচার করা যাউক। এ কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবে যে দুঃখ কেহ চায় না। কিন্তু দুঃখ জিনিসটা কি? দুঃখ বলিয়া জগতে কোন পদার্থ আছে কি? মনে হইবে, কেন, সর্প ব্যাঘ্র আদি পদার্থ কত দুঃখপ্রদ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে। সর্প তাহার নিকট কত প্রিয়! কত যত্নে সে উহাদের প্রতিপালন করে! শুনিতে পাওয়া যায়, স্নেহাস্পদ কন্যার বিবাহকালে সর্বাপেক্ষা ভাল অর্থাৎ বিষধর সর্পটি, খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জনের জন্য সে জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করে। সার্কাসওয়ালা ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে। ব্যাঘ্র তাহার উপার্জনের সাধন, তাই ব্যাঘ্র তাহার নিকট প্রীতির বস্তু। ব্যাঘ্রীর নিকটও ব্যাঘ্র কত প্রিয়! সর্পব্যাঘ্রাদি কোন কিছুই একান্ত দুঃখপ্রদ নহে। সর্বথা হেয় বা ত্যাজ্য এরূপ কোন পদার্থই জগতে পাওয়া যায় না। আমাদের নিকট যাহা অতি ঘৃণিত, তাহাও কোন কোন জীবের ভোজ্যরূপে প্রিয়।

এভাবে যদি ইহাও বিচার করা যায় যে জগতে সকলে কি চায়, তাহা হইলে সকলে একবাক্যে বলিবে সুখ চাই, আনন্দ চাই! ধনী-ভিখারী-নির্বিশেষে সকলেই সুখ বা আনন্দ চায়। জগতে সকলেই সুখের পশ্চাতে ধাবমান। কিন্তু এই সুখ জিনিসটি কি? সুখ বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? লোকে মনে করে, কেন স্ত্রী, পুত্র, ধন, বাহন, অন্ন—এই সবেতেই তো সুখ। কিন্তু স্ত্রী যদি সদা সুখরূপই হইত তবে সে-স্ত্রী কোন বিগর্হিত কর্ম করিলে লোকে তাহাকে ত্যাগ করে কেন? পুত্র যদি নিয়ত

সুখপ্রদই হইত তবে অযোগ্য, অবাধ্য ও নিন্দিত-কর্মকারী পুত্রের মুখদর্শনও লোকে করিতে চাহে না কেন? ধনেই যদি সুখ থাকিত তবে অশেষ-ঐশ্বর্যপালিত হইয়াও লোকে দুঃখী কেন? এইরূপে দেখা যায় যে, কোন পদার্থই একান্ত-ভাবে সুখপ্রদ বা সুখরূপ নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বাহিরে সুখদুঃখ বলিয়া যদি কোন পদার্থই জগতে না থাকে, তবে লোকে যে সুখদুঃখ অনুভব করে তাহা কি?—ইহার উত্তরে বলা যায়, সুখদুঃখের অনুভব হয় মনে। অতএব, উহা মনেরই। সুখদুঃখ বলিয়া কোন জিনিস বাহিরে নাই। উহা মনের একটি ভাবনামাত্র। একই বস্তু মনে বিভিন্ন ভাবনা আনিতে পারে। বন্ধুসহ আমি কোথাও যাইতেছি। সম্মুখে একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া আমি 'মা' 'মা' বলিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলাম। বন্ধুর নিকট তিনি সাধারণ একজন মহিলা ছাড়া আর কিছুই নন। অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে 'ভগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিল। কেউ বা তাঁহাকে 'কন্যা'রূপে বা অন্য কোনরূপে দেখিল। এখন এই নারীটি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। 'মা', 'ভগিনী', ইত্যাদি বাহিরে কিছুই নাই, এগুলি সবই বিভিন্ন ব্যক্তির মনোময়ী কল্পনা। বাহিরে কেবল একটি স্থূল দেহমাত্র বিদ্যমান। তাহাকেই স্ব স্ব ভাবনানুযায়ী কেহ মাতৃরূপে, কেহ বা ভগিনীরূপে, কেহ বা কন্যারূপে দর্শন করিতেছে। তেমনি সুখদুঃখ বলিয়াও কোন পদার্থই জগতে নাই। বাহিরে বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং যে পদার্থ যখন আমার অনুকূল বলিয়া মনে হয় তখনই সেটি আমার সুখপ্রদ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। সেই পদার্থই পরমুহূর্তে বা কালান্তরে প্রতিকূল মনে হইলে দুঃখপ্রদ বলিয়া ভান হয়। বিষয় কিন্তু নির্বিকার। বিষয়ের প্রতি স্বরচিত অনুকূলতা-বা প্রতিকূলতা-বুদ্ধিই আমার সুখদুঃখ অনুভবের কারণ।

কিন্তু সুখ বা দুঃখ যখন আমরা অনুভব করি, সে অনুভবও তো স্থায়ী হয় না। সুখ অনুভব করিতেছি কিন্তু চিত্ত অন্য ব্যাপারে যখনই লিপ্ত হইল তখনই সে সুখানুভবও বিলুপ্ত হইল। তদ্রূপ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে যখনই চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হইল দুঃখও তখনই অদৃশ্য হইল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অনুভবকালেই কেবল সুখদুঃখ বিদ্যমান। ঐ অনুভবের পূর্বে বা পরেও তাহা নাই। অসহ্য দেহবাধায় কাতর ব্যক্তিও যখন মূর্ছিত বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে তখন আর তাহার সে দুঃখবোধ থাকে না। কিন্তু পুনঃ জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতে থাকে। পুত্রশোকাতুরা মাতাও গভীর নিদ্রাকালে পরমসুখে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন কোন শোক, কোন দুঃখবোধও তাহার থাকে না। দুঃখবোধ করিবার করণ মনটিও তখন নাই। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রতে মন উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই শোক, দুঃখবোধ ফিরিয়া আসে। সুতরাং সুখদুঃখ মনঃসমকালীন। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় মন আছে তখনই সেই অবস্থায় সুখদুঃখ আছে, আর যখন মন নাই তখন সুখদুঃখও নাই। অনুভব বা জ্ঞানকালেই সুখদুঃখের বিদ্যমানতা বা সত্তা। অনুভবের পূর্বেও ইহা নাই এবং পরেও ইহা থাকে না। ইহাকেই বেদান্তে বলে 'জ্ঞাত সত্তা' বা 'জ্ঞানসমকালীন সত্তা' বা 'প্রাতিভাসিক সত্তা'। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি কেবল একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, সুতরাং উহা মিথ্যা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ স্বপ্নকে লওয়া যাউক। স্বপ্নে কত কি বিচিত্র সৃষ্টি, কত

অভিনব পদার্থই না মন কল্পনা করিয়া থাকে! কিন্তু ঐ সকল পদার্থ বস্তুতঃ কিছুই নাই। মনের কল্পনাকালেই উহাদের স্থিতি। স্বপ্নদর্শনের পূর্বেও ঐ পদার্থসমূহ ছিল না এবং স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও উহাদের আর দেখা যায় না। কেবল স্বপ্নানুভবকালেই ঐ সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ও সেগুলিকে বাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। জাগ্রতে ফিরিয়া আসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট-পদার্থের আর কোন বাস্তব সত্তাই অনুভূত হয় না।

সেইরূপ যখন স্বপ্নানুভব হয় তখন জাগ্রৎ পদার্থও আর থাকে না এবং উহার অনুভবও হয় না। স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রৎ অবস্থায় মন উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রৎ সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে। পুনরায় মন স্বাপ্নসৃষ্টি কল্পনা করিতে থাকিলে এই বিশাল জাগ্রৎপ্রপঞ্চ আর থাকে না। সুষুপ্তি-অবস্থায় যখন মন বিলীন হয় তখন পূর্বোক্ত উভয় সৃষ্টি এবং তদনুভবও আর ভান হয় না। এইরূপে দেখা গেল যে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই মনঃসমকালীন বা অনুভবসমকালীন। অতএব এই উভয় অবস্থা এবং অবস্থাগত পদার্থসমূহও জ্ঞাতসত্তা অর্থাৎ প্রাতিভাসিক, শুধু একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা।

কিন্তু 'আমি' থাকি। এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল তিন অবস্থায় 'আমি' সতত বিদ্যমান। অবস্থাগুলি পরস্পর পৃথক, এক অবস্থায় অন্য অবস্থা থাকে না, কিন্তু 'আমি' এই সর্বাবস্থাগুলির মধ্যে একভাবে 'অনুগত' হইয়া আছি। অতএব জাগ্রদাদি অবস্থা ও তাহার সুখদুঃখাদি ধর্ম হইতে 'আমি' পৃথক্, ইহাই স্পষ্ট অনুভব হয়।

সুষুপ্তিতে মহা আনন্দ, মহা সুখ সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সংখ্যাতীত মানঅভিমান, আশানৈরাশ্য, ভাল-মন্দ, সুখদুঃখ নিরন্তর অনুভব করিয়া জীব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে ও একটু সুষুপ্তিসুখের জন্য লালায়িত হয়। কষ্টলব্ধ প্রভূত ধনের বিনিময়েও সে একটু সুষুপ্তিসুখ লাভার্থ ব্যাকুল হয় ও সেজন্য কত চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে! সুষুপ্তিতে এত আনন্দ আসে কোথা হইতে? সুষুপ্তিতে কোন দুঃখ থাকে না; তাহার কারণ দুঃখের নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই সব কিছুই সেখানে নাই। সেখানে থাকি কেবল একা 'আমি'। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইল যে যখন আমাতে একমাত্র 'আমি' থাকি তখনই সুখ। অর্থাৎ সুখ আমারই স্বরূপ। জগতের কোন সুখই সুষুপ্তি-সুখতুল্য নহে। মন বুদ্ধি আদি আগন্তুক উপাধিগুলি আসিয়া হাজির হইলেই যত দুঃখদ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন 'আমি' তাহাদের সহিত জড়িত হইয়া নিজেকে সুখী-দুঃখী, কর্তা-ভোক্তা মনে করিয়া সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকি।

শংকা হইতে পারে যে, সংসারেও তো লোকে সুখ ভোগ করে। হাঁ, করে, কিন্তু তাহা কতটুকু? দেখিতে দেখিতে উহা যেন কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায় এবং পরিণামে দুঃখই দিয়া থাকে। সাংসারিক সুখ যেন বিষসংপৃক্ত মিষ্টান্ন। মানুষের চিত্ত বিষয়-ভোগলালসায় সদা চঞ্চল, তাই সে দুঃখী। চাঞ্চল্যই দুঃখ। প্রভূত আয়াসে প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তিতে চিত্ত যখন ক্ষণিক শান্ত হয় তখন সেই শান্তচিত্তে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাই বিষয়ানন্দ বা বিষয়সুখ। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, আনন্দ বিষয়ে নাই। শান্ত চিত্তে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহা আমার স্বস্বরূপভূত আনন্দেরই অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। চঞ্চল জলের উপরিভাগে যেমন চন্দ্রবিম্ব সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হয় না, স্থির জলই সম্যক প্রতিবিম্বধারণে সমর্থ, ইহাও তদ্রূপ।

কিন্তু এই বিষয়ানন্দও নিন্দিত, বিনাশী ও দুঃখরূপ বিষয়সহচারী বলিয়া বিনাশী ও সর্বথা ত্যাজ্য। শুদ্ধদর্পণতলে প্রতিবিম্বিত মুখমণ্ডলই সকলের প্রিয় হইয়া থাকে, অশুচিপদার্থপূর্ণ ভাণ্ডে বা সুরাপাত্রে প্রতিবিম্বদর্শনে কেহ রুচি প্রকাশ করে না, বিষয়ানন্দও তদ্রূপ। বিষয়ানন্দও স্বরূপানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। ঐ স্বরূপানন্দেরই অধিক প্রকাশ হয় সুষুপ্তিতে। কিন্তু উহাও অজ্ঞানব্যবহিত বলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপটির পূর্ণ অভিব্যক্তি তখনও হয় না। কিন্তু যেটুকু হয় তাহাতেই সর্বজীব পরিতুষ্ট, এবং উহার তুলনা জগতে পাওয়া যায় না। জাগতিক কোন আনন্দই সুষুপ্তির আনন্দসহ তুলিত হইতে পারে না, ইহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ। আবার, বিচারজনিত জ্ঞানসহ মন যখন স্বস্বরূপে স্থিত হয় তখন নির্দ্বৈত ও অজ্ঞানাবরণবিরহিত যে স্বরূপানন্দ অভিব্যক্ত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সুষুপ্তির আনন্দও তাহার নিকট তুচ্ছ।

সুতরাং দেখা গেল স্বস্বরূপে স্থিত থাকাই সুখ। স্বস্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটিলেই দুঃখ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, মানুষ যখন সুস্থ থাকে, ভাল থাকে, তখন তাহাকে, 'কেন ভাল আছ' বা 'কেন সুখে আছ'—এরূপ প্রশ্ন কেহ করে না। কিন্তু যদি কেহ বলে, 'বড় কষ্টে আছি' 'বড় কষ্টে দিন কাটিতেছে'—তখন লোকে তাহার দুঃখের কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যাহা স্বাভাবিক অবস্থা, সে বিষয়ে কাহারও শংকা হয় না। অগ্নি উষ্ণ। তাহা কেন উষ্ণ, এরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে জাগে না। জল শীতল। উহা কেন শীতল, এ প্রশ্নও কেহ করে না। কারণ উহা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বিপরীত হয় তবে লোকে প্রশ্ন করে। যদি অগ্নি শীতল ও জল উষ্ণ হয় তবে লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি করিয়া উহা সম্ভব হইল, কোন্ নিমিত্তবশতঃ উহা ঘটিল। সেইরূপ সুখে থাকাই জীবের স্বভাব। কারণ সুখ তাহার স্বরূপ। তাই সুখে থাকিলে অর্থাৎ স্বরূপে থাকিলে কোন প্রশ্ন হয় না, নিজের মনেও কোন অশান্তি জাগে না। দুঃখ অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতি ঘটিলেই প্রশ্ন হয়, অশান্তি হয়—কেন ওরূপ হইল এই শংকা মনে জাগে। অতএব স্বস্থতাই সুখ ও অস্বস্থতা অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতিই দুঃখ।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুষুপ্তি যখন বহুলাংশে স্বস্থতাবশতঃ একটি পরম আনন্দময় অবস্থা, তখন উহাই কাম্য এবং কুম্ভকর্ণের ন্যায় সকলের কেবল সুষুপ্ত হইয়া থাকিবারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে? উহাও একটি অজ্ঞানময় অবস্থাবিশেষ। জাগ্রৎ- ও স্বপ্ন-ভোগপ্রদ কর্মক্ষয়ে সুষুপ্তি-অবস্থা জীবের স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উহা জীব স্বেচ্ছায় করিতে পারে না। চেষ্টা করিলেও কেহ ইচ্ছামত সুষুপ্ত হইতে পারে না। চেষ্টা করিতে গেলে স্বপ্নই বৃদ্ধি পাইবে, সুষুপ্তি আসিবে না।

তবে দুঃখসাধন দেহ, মন, বুদ্ধি আদির সাহচর্য রহিত হইয়া পরম আনন্দময় স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার উপায় কি?—উপায় বিচার। মন, বুদ্ধি আদিই দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ আমাতে আনয়ন করতঃ বিবিধ দ্বন্দ্ব ও দুঃখের দুর্নিবার স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই মন, বুদ্ধি আদি সবই আগন্তুক, জাগ্রৎ ও স্বপ্নে থাকে কিন্তু সুষুপ্তিতে থাকে না। ইহারা আগমাপায়ী, নিয়ত-পরিবর্তনশীল ও অনিত্য বলিয়া একান্তই মিথ্যা। এখন মনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় একমাত্র বিচার। সমাধি আদির অভ্যাস মনকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র। উহার বিলোপ

করিতে পারে না। ব্যবহারকালে যে 'অহং'—'আমি' 'আমি' করে, সে 'অহং'ও তো সুষুপ্তিতে থাকে না। কিন্তু 'আমি' তখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাই কি? কখনই নহে। 'আমি' থাকি—ইহাও সকলের অনুভবসিদ্ধ কথা। মন, বুদ্ধি, অহংকার রহিত সেই 'আমি'ই আসল 'আমি'। উহাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। উহা অনুভবমাত্রস্বরূপ। সেই 'আমি'ই জাগ্রৎ ও স্বপ্নে আগন্তুক মনবুদ্ধিসহ জড়িত হইয়া মিথ্যা অহংকারের রূপ ধারণ করি এবং তখন সংসারে অশেষ দুঃখের স্রোতে ভাসিয়া চলি।

বেদান্তশাস্ত্র বিচারপ্রসূত জ্ঞানদ্বারা 'হৃদয়-গ্রন্থিভেদের' কথা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থিভেদ হইলেই সর্বসংশয় দূর হয়, পাপপুণ্য সর্বকর্ম ক্ষীণ হয়, সর্বদুঃখনিবৃত্তি হয় এবং পুরুষ স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া পরম আনন্দময় অবস্থালাভে কৃতকৃত্য হন। এখন এই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদের' অর্থ কি? কত লোকে ইহার কত বিভিন্ন ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন! সরল সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—হৃদয় অর্থ মন বা বুদ্ধি। উহার ভেদ অর্থ উহার নাশ অর্থাৎ উহার অসত্তাবোধ, মন, বুদ্ধি আদি বস্তুতঃ নাই, এইটি জানা। বস্তুতঃ মন, বুদ্ধি আদি কোন পদার্থই যে নাই, এগুলি প্রাতিভাসিক, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র, এবং একমাত্র আত্মাই—'আমি'ই—সর্বাবস্থায় একরূপে নির্বিকার থাকিয়া সদা বিদ্যমান—এইটি জানার নামই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদ।'

কিন্তু মন বুদ্ধি আদির বিদ্যমান দশাতে অর্থাৎ জাগ্রতে (স্বপ্নের মন ও তাহার কার্য সব কিছুই প্রাতিভাসিক ইহা সর্বলোকসম্মত, তাই কেবল জাগ্রতের কথাই ধরা হইল) যতই কেহ বিচার করুক না কেন যে মন আদি বস্তুতঃ নাই, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র,—সে জ্ঞান কখনও অপরোক্ষ হইবে না,—উহা পরোক্ষই থাকিয়া যাইবে। কারণ তৎকালে, বিচারকালে সাক্ষাৎ মন রহিয়াছে, সুতরাং কি করিয়া বোঝা যাইবে যে মন নাই? সেইজন্য তৎকালে সাধকের এমন একটা অবস্থার স্মৃতির প্রয়োজন, যখন মন থাকে না; যেমন সুষুপ্তি বা সমাধি। সমাধি তো আর সকলের হয় না? কিন্তু সুষুপ্তি অল্পবিস্তর সকলেরই হয়। সুষুপ্তিকালে মনবিহীন 'আমি' থাকি। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতিসহ যদি জাগ্রতে কেহ বিচার করে যে জাগ্রতেও মন বস্তুতঃ নাই, তাহা হইলেই জাগ্রৎকালেও মনের অভাব প্রত্যক্ষ অনুভব হইবে ও মন-রহিত এক সুখস্বরূপ 'আমি'ই অবশেষ থাকিয়া যাইব। এই বিষয়ে স্ফটিক ও জবাকুসুমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে কখনও স্বচ্ছ স্ফটিক অন্যকালে দেখে নাই, স্ফটিকের সম্মুখে জবাকুসুম যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সে কখনই এবং কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিবে না যে স্ফটিক স্বচ্ছ, লাল নহে। তাহাকে অন্যত্র স্বচ্ছ স্ফটিক দেখাইলে পর সেই স্মৃতিবলে সে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিবে যে স্ফটিক স্বচ্ছ, জবাকুসুম-সান্নিধ্যে রক্ত স্ফটিক দৃশ্যমান হইলেও স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে, স্ফটিকের রক্তিমা জবাকুসুমরূপ উপাধিনিবন্ধন মিথ্যা প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। তখনই স্ফটিকের স্বচ্ছতার অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার হইবে।

এইরূপ বিচারসহায়ে দেহাদি সর্বপদার্থের পারমার্থিক সত্যত্ববুদ্ধির নিঃশেষে বিলোপ ঘটিয়া থাকে এবং স্বস্বরূপভূত ও সুখস্বরূপ আত্মাতেই স্থিতিলাভ হয়। এই স্বরূপস্থিতিই মোক্ষ। পরমানন্দপ্রাপ্তি বা সর্বদুঃখনিবৃত্তি ইহারই নাম।

অতএব দেখা গেল যে, অর্থবুদ্ধি বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুঃখনিবৃত্তি হয়

না। দেহাদি বিষয় আছে, ইহা সত্য—এই বুদ্ধি থাকিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। বাহ্য বিষয় ও দেহাদি পদার্থ কিছুই বস্তুতঃ নাই, কেবল মিথ্যা প্রতীতিমাত্র—ইহা জানিতে পারিলে তবেই যথার্থ সুখপ্রাপ্তি, আত্মস্থিতি বা দুঃখনিবৃত্তি হয়। এ কথাই কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্বীয় অনুভববলে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

'ন জারা জায়েগা জবৃতক্
নজারা নামরূপোঁকা।
ন জর্ জায়ে নজর তবৃতক্
নিঠুর দুঃখ দুইকী॥'

—যতক্ষণ পর্যন্ত নানারূপাত্মক দ্বৈতের নজর অর্থাৎ সত্যবুদ্ধি জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠুর দ্বৈত-দুঃখ কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

অর্থবুদ্ধি না করিলে অর্থাৎ অর্থাধ্যাস ত্যাগ করিলে থাকে শুধু জগতের প্রতীতিমাত্র। প্রাতীতিক জগৎ লইয়া ব্যবহারে শুধু বিনোদই হয়। অর্থবুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের সত্যত্ববুদ্ধিই দুঃখের হেতু। অর্থবুদ্ধি না থাকিলে বিক্ষেপ, অশান্তি, দুঃখ কোথায়? দ্বৈত ছাড়িয়া মানুষ যাইবে কোথায়? যাইবার তো জায়গা নাই। **সুতরাং দ্বৈত নাই, অর্থাৎ উহার সত্যত্ব-বুদ্ধিত্যাগই দ্বৈতের ত্যাগ।** দুঃখদ দ্বৈতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় এই ত্যাগ—ইহাই সর্ব বেদান্তও একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তখন কেবল আনন্দ। প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা দ্বৈতের খেলা দর্শনে তখন আনন্দই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ হইতে পারে না। ঐন্দ্রজালিকের মিথ্যা ক্রীড়াদর্শনে সকলের বিনোদমাত্রই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ কাহারও হয় কি?

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় আমাদের প্রাকৃতিক পাঠশালা। এই পাঠশালায় আমাদের শিক্ষণীয়—এই বিচার। এই বিচার কোন দেশ, কাল বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ, সীমিত নহে। ইহা সার্বজনীন। স্বানুভূত এই অবস্থাত্রয়ের বিচার সহায়েই ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জগতের সকলেই স্বস্বরূপ-স্থিতিরূপ পরমলক্ষ্যে পৌঁছিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। ইহাই বেদান্তোক্ত অসাম্প্রদায়িক সাধন এবং ইহাই সার্বজনীন শ্রেয়োমার্গ শাশ্বত সুখলাভের উপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথাঃ 'ভক্তি-পথ সহজ পথ'

স্বামী ধীরেশানন্দ

বেলুড় মঠের প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—'ভক্তি-পথ দিয়ে তাঁর কাছে সহজে যাওয়া যায়', 'ভক্তিযোগ যুগধর্ম', 'কলিযুগের পক্ষে নারদীয়া ভক্তি'—ইত্যাদি।

অন্যান্য যোগসহায়ে সিদ্ধিলাভ করা এ সময়ে কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তি-পথ সেরূপ কষ্টসাধ্য নহে এবং ভক্তি-পথেই সব পাওয়া যায়—একথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারংবার তাঁহার কথামৃতপিপাসু শ্রোতৃবর্গের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভক্তিপথের বিশেষত্ব কি এবং উহা কেন সকলের পক্ষে সুগম, এ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র কি বলেন তাহাই আমরা একটু আলোচনা করিব।

অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্মই একমাত্র ত্রিকালাবাধিত সত্য বস্তু ও জগৎ মিথ্যা। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। অবিদ্যাপ্রভাবেই জীবের জন্ম-মরণরূপ সংসারভ্রান্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যা-প্রসূত ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণরূপ উপাধি সহ মিথ্যা তাদাত্ম্যবশতঃই জীব অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। জবাকুসুম সংযোগে স্ফটিকের লালিমার ন্যায় এই উপাধি সংযোগ থাকিলে দুঃখ হইবেই। এই উপাধি নিবৃত্তি হইলেই দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। অদ্বৈতবেদান্ত বলেন—উপাধিজনিত এই দুঃখ প্রতীতি একটা ভ্রান্তিমাত্র। একমাত্র আত্মজ্ঞান দ্বারাই এই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়।

ভক্তিসিদ্ধান্ত কিন্তু অন্যরূপ। সে মতে পরমেশ্বর সত্য ও তাঁহার শক্তিও সত্য। পরমেশ্বরের সত্য শক্তি হইতে উৎপন্ন জগদাদি যাবতীয় পদার্থ মিথ্যা হইতে পারে না। সংসার ঈশ্বরের সংকল্প। সত্য সংকল্প ঈশ্বরসৃষ্ট সংসার মিথ্যা নহে, উহা সত্য। যদি সংসার মিথ্যা, একটা ভ্রান্তিমাত্র হইত তবে তাহা আত্মজ্ঞান-নাশ্য হইত। কারণ অন্ধকার নিবর্তক দীপপ্রকাশের ন্যায় একমাত্র জ্ঞানই ভ্রান্তি বা অজ্ঞানান্ধকার নিবর্তক—ইহা সর্বজনস্বীকৃত। সংসার সত্য, অতএব উহার নিবৃত্তি জ্ঞানসাধ্য নহে। জ্ঞান সত্য বস্তুকে নাশ করিতে পারে না। সংসার-নিবৃত্তি একমাত্র ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই হইয়া থাকে। ভক্তিদর্শন ভক্তিপূর্বক ভগবানে বুদ্ধির লয় ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং এ মতে আত্মজ্ঞান সংসার নিবর্তক নহে। আত্মজ্ঞান অন্তঃকরণগত অশ্রদ্ধা সংশয়াদি মনের নিবৃত্তি করিয়া থাকে মাত্র। তখন প্রমাদ আলস্য অভিমান প্রভৃতি অনাত্মধর্ম রহিত হইয়া, নির্মল হইয়া জীব শ্রীভগবানের প্রপন্ন বা শরণাগত হইয়া থাকে।

ভগবান পরম ঐশ্বর্যশালী। তাঁহার স্বস্বরূপের ন্যায় এই ঐশ্বর্যশক্তিও অবাধিত। এই শক্তি ও শক্তিমান উভয়ে মিলিত হইয়া জগৎ কারণ হইয়া থাকেন। এই উভয়ই সত্য। অদ্বৈতবেদান্তের ন্যায় শক্তিকে এ মতে মিথ্যা মানা হয় না। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মস্বরূপই মানা হয়।

ঈশ্বর কর্মফলদাতা, এ বিষয়ে উত্তর মীমাংসা বা অদ্বৈতবেদান্ত ও ভক্তি মতের কোন মতানৈক্য নাই। ভক্তি বেদ প্রতিপাদ্য। শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন—'ভক্তিঃ প্রমেয়া শ্রুতিভ্যঃ, পুরাণেতিহাসাভ্যাম্ চ'—শ্রুতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি সহায়ে ভক্তির স্বরূপ জ্ঞাতব্য। ঋগ্‌বেদে পরমেশ্বরকে মাতাপিতার ন্যায় রক্ষক বর্ণন করা হইয়াছে; ইন্দ্র পিতা ও শ্রেষ্ঠ সখারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

ভক্তি কি? এ বিষয়ে বলিতে গেলে বলিতে

হয় পরমেশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগই ভক্তি। নারদ বলেন—ভক্তি পরমপ্রেমরূপ ও অমৃতস্বরূপ। শাণ্ডিল্য অমৃতকে ভক্তির ফল বলিয়াছেন।

ঋষি অঙ্গিরার মত এই যে, স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধার আতিশয্যে ঈশ্বরের প্রতি অলৌকিক অনুরাগের নামই ভক্তি, ইত্যাদি।

ভক্তির স্বরূপ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও ইহা নির্বিবাদে বলা যায় যে, ঈশ্বরে পরম অনুরাগ বা প্রীতিই ভক্তি। কিন্তু এই অনুরাগ বস্তুটি তো স্বসংবেদ্য, অর্থাৎ ইহা একমাত্র নিজেই জানা যায়। যথার্থই ঈশ্বরের প্রতি কাহারও অনুরাগ হইয়াছে কিনা তাহা অপরে জানিবে কি প্রকারে? অপরের পক্ষে ইহা জানা কঠিন, ইহা সত্য বটে, তথাপি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভক্তির পরিচয় স্বরূপে বিভিন্ন আচার্যগণের মত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ব্যাসদেব বলেন যে, ভগবানের পূজা আদিতে অনুরাগ হওয়াই ভক্তির লক্ষণ। যাঁহার প্রতি প্রেম হয় তাঁহার সেবাতেই আন্তরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গর্গাচার্য বলেন—যাঁহার প্রতি প্রেম হয় তাঁহার চরিত্র, নাম, গুণাদির সশ্রদ্ধ শ্রবণ, বর্ণন ও তাহার আবৃত্তিই আন্তরভক্তির পরিচায়ক। অর্থাৎ বাহিরে এসব দেখা গেলেই বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তির চিত্তে ভক্তির বিকাশ হইয়াছে।

শাণ্ডিল্য বলেন—যে কোন প্রিয় বস্তুতে ঈশ্বরের সত্তা চিন্তন করিয়া তাহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়ার নামই ভক্তির লক্ষণ।

ভরদ্বাজ বলেন—পরমানন্দে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরের মহিমাখ্যাপন করার নামই ভক্তি। অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রেম হয় তাঁহার মহিমা খ্যাপন।

কশ্যপ বলেন—আপনার সর্বকর্ম ভগবানে সমর্পণ করার নাম ভক্তি। অর্থাৎ যাহা কিছু আমি করি তাহাই ভগবানের প্রসন্নতা ও সেবার্থ। শৌচ স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ভগবানের সমীপে যাওয়ার নামও ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ, শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বসিষ্ঠাদি মুনিগণের মত এই যে, সর্বজগৎ শ্রীভগবানেরই একটি রূপ —এই বুদ্ধিতে সকলের সেবা করার নামই ভক্তি।

দেবর্ষি নারদ বলেন—নিজের সর্ব আচরণ ভগবানে অর্পণ করা ও ভগবদ্ বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতার উদয়ের নামই ভক্তি।

ব্রজবাসিগণের মতে—স্বীয় মতি, রতি, গতি, জীবন, প্রাণ—সব কিছু ভগবানে লীন করিয়া দেওয়াই ভক্তি।

এই সব লক্ষণই সাধকের চিত্ত অন্তিমে ভগবানে বিলীন হইয়া যায়—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

এখন ভক্তি হয় কি প্রকারে ইহাই বিবেচ্য। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ভক্তিসিদ্ধান্তের সার সর্বস্ব হচ্ছেন জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অশেষ কল্যাণ গুণাকর ঈশ্বর। জীব ও জগৎ ঈশ্বরসহ অভিন্ন। অতএব ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বরাভিন্ন ভক্তজনের অনুগ্রহ-বিনা ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু ঐ অনুগ্রহ-লাভ জীবের নিজের আয়ত্তাধীন নহে। এই অনুগ্রহলাভের জন্য সাধকের ব্যাকুল অন্তরে প্রতীক্ষা প্রয়োজন। এজন্যই নারদ বলেন যে, মহৎকৃপা বা ভগবৎকৃপালেশবশতঃই ভক্তির উদয় হয়।

কিন্তু ভক্তির উদয়ের জন্য কয়েকটি উপায়ের কথাও ভক্তিশাস্ত্র বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা—ভগবানের নামের আশ্রয়। নামই ভগবান, এই বুদ্ধিতে নামকীর্তন, জপ, শ্রবণ, ধ্যান, স্মরণাদি দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা।

ভগবানের রূপের আশ্রয় অর্থাৎ ভগবানের

রূপে প্রীতি ও তন্ময়তা। উহা দ্বারা ক্রমে মনরূপ উপাধির বিলয় ও ভগবানের সহিত একতাবোধ হইয়া অন্তঃকরণ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া যায়।

ঈশ্বরের বিভূতিদর্শন অর্থাৎ—অন্তরে ভগবানের ধ্যান ও বাহিরে ব্যবহারকালে প্রত্যেক বস্তুতে পরিপূর্ণ ভগবানের বিশেষ প্রকাশ চিন্তন। এইরূপে মন তন্ময় হইয়া যায় ও ভগবানের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। সর্ব-পদার্থের শক্তিরূপে ভগবানই বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তনেও মন ক্রমে পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে।

গুণের বর্ণন,—সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও তাহার কার্য সবই ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত, এরূপ চিন্তনেও মন ত্রিগুণের অতীত পরমেশ্বরে বিলীন হয়।

পরমাত্মভাবনা,—সর্ববস্তুতে অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপে সচ্চিদানন্দের দর্শন অভ্যাস করিলে অচিরেই মন প্রিয়তম ঈশ্বরসহ অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

এইসব সাধন পরিপক্ক হইলে তখন এক প্রভু ও তাঁহার শক্তিই অবশেষ থাকেন। এই প্রকার স্বরূপানুভবে সমাধি ও ব্যবহার এক হইয়া যায়।

ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় বাহ্য ব্যবহার কিরূপ হয় তাহাও ভক্তিশাস্ত্র বিভিন্ন প্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা—সম্মান প্রদর্শন। অর্জুন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেই তিনি অতি প্রেমের সহিত দণ্ডায়মান হইতেন। ভক্তও ভগবদ্‌বিগ্রহ বা অন্য ভক্ত দর্শনে তদ্রূপ করিয়া থাকেন। রাজা ঈক্ষাকু কমল, মেঘ প্রভৃতি দর্শনে কমলনয়ন মেঘশ্যাম শ্রীভগবানের স্মরণে মগ্ন হইয়া তাহাদেরও সৎকার বা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। অর্থাৎ যে যে বস্তু দর্শনে প্রিয়তমের স্মরণ হয় তাহাদিগকে সৎকার বা সম্মান প্রদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন —'এদের কিরূপ ভক্তি! গুরু বা গুরুবংশের সকলকে সৎকার তো করেই থাকে, গুরুর দেশের বিড়ালটাকেও পর্যন্ত সৎকার করে।' শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেব মেড় গ্রাম অতিক্রম কালে, এই গ্রামের মাটিতে কীর্তনের বাদ্য খোল নির্মিত হয় শুনিয়া ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথার্থ ভক্তেরও সামান্য বস্তু দর্শনে ভগবদ্‌ভাবাবেশ হইয়া থাকে। প্রতিকূল অবস্থাতেও ভক্ত বিচলিত হন না, সহস্র বিপদের মধ্যেও তিনি তাঁহার পরমপ্রিয় আরাধ্য দেবতার মঙ্গলময় হস্তের স্পর্শই অনুভব করিয়া থাকেন।

সর্বশাস্ত্রই অধিকারী নির্ণয় করিয়া থাকেন। জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ বেদান্তে সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই অধিকারী। অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে কেহ বেদান্ত সাধনের অধিকারী হয় না। কর্মকাণ্ডেও দেখা যায় ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি সব, অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকারী, রাজসূয় যজ্ঞে নহে। ক্ষত্রিয় রাজসূয় অশ্বমেধাদি কর্মে অধিকারী, বৃহস্পতি যজ্ঞ আদিতে নহে, ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় কর্মে অর্থিত্ব, সামর্থ্য ও শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধত্ব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তিতে সকলেরই সমান অধিকার। ইহা ভক্তিমার্গের একটি প্রধান বিশেষত্ব। তবে ভগবানের নাম উচ্চারণে সমর্থ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিই অধিকারী। জান্তে, অজান্তে যে অবস্থাতেই হউক না কেন, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব-জন্মীয় সংস্কারও ভক্তি উদয়ের কারণ হইতে পারে।

নিজের মাতাপিতার সেবার অধিকার যেমন সকলেরই আছে সেইরূপ ভগবানকে ভক্তি, সেবা করিবার অধিকারও সকলেরই আছে। নীচ-জাতি চণ্ডালাদিও ভক্তির অধিকারী। নাম

শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারাই সর্বযাগযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ভক্তগণের মধ্যে জাতি, কুল, রূপ, বিদ্যা, ধনাদি দ্বারা কোন ভেদ হয় না। অন্য সাধনমার্গে বিচিত্র অধিকারী ভেদ বিদ্যমান, কিন্তু ভক্তিমার্গে তাহা নাই। ইহা ভক্তিপথের একটি মহান্ বিশেষত্ব। কর্মকাণ্ডে কর্মানুষ্ঠানের বিশেষ স্থান, কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে, যেমন নির্দিষ্ট দিকে বসিবে, নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে। ভক্তিসাধনে এসব কিছুরই প্রয়োজন নাই। পূর্ব মীমাংসক ঈশ্বর মানেন না। তাঁহারা কর্মেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। কর্মই ফল-দাতা। কিন্তু ভক্তিমতে ঈশ্বরই সর্বস্ব। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, করুণা, প্রসন্নতাই জীবের সর্বস্ব। সুতরাং যখন ইচ্ছা, যেভাবে হউক, যেখানে হউক জীব ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে ও ঈশ্বর কৃপায় তাহার হৃদয় মধুময় হইয়া যায়। ভগবন্নাম, গুণ, লীলাদি চিন্তনে তন্ময়তা যেভাবেই হউক তাহাই উত্তম সাধন।

সংকেত পরিহাসাদি যে কোনভাবে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিলেই তদ্দ্বারা জীবের পাপ নাশ হইয়া থাকে। করুণাময় ঈশ্বরই 'নাম'রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহাদের নামে বিশ্বাস নাই তাদের জন্যই শাস্ত্রে পাপনাশক বহুবিধ প্রায়শ্চিত্ত কর্মের বিধান। নামের এই অপূর্ব মহিমা অর্থবাদ বা স্তুতিমাত্র নহে। নাম একটি নিমিত্তমাত্র। এই নিমিত্তাবলম্বনে ভক্তের উপর শ্রীভগবানের অজস্র কৃপা বর্ষিত হয়।

ভক্তির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে আরাধ্যবস্তু-বিষয়ক অজ্ঞানের আবরণও ধীরে ধীরে ক্ষয় করিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অশুদ্ধ বস্তুর চিন্তন দ্বারাই চিত্ত অশুদ্ধ হয়, এবং শুদ্ধবস্তু চিন্তনেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাই স্বতঃনির্মল শুদ্ধস্বরূপ শ্রীভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ ও চিন্তন অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকারী আর অন্য কোন সাধনই হইতে পারে না।

এইরূপে ভক্তিসাধনের সুগমতা উল্লেখ করিলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাও আমাদের সতর্ক করিতে ভোলেন নাই যে, উহা অতি সুলভ নহে। সাধারণতঃ লোকে মন্দিরে প্রণামাদি করা, চরণামৃত গ্রহণ ও নিবেদিত মিষ্টান্নাদি গ্রহণকেই ভক্তি বলিয়া মনে করে ও তাহাতেই নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে। ঠাকুর বলিয়াছেন—'ভক্তি-পথ সহজ পথ, তবে তেমন সহজ নয়।' ভগবানের প্রতি ভালবাসা বা অনুরাগই ভক্তির একমাত্র পরিচয়। আমরা টাকা-পয়সা, স্ত্রী-পুত্র পরিজন, সর্বোপরি নিজের শরীরকে যেরূপ ভালবাসি ভগবানের প্রতি আমাদের সেরূপ ভালবাসা আছে কি? তাঁহার প্রতি যথার্থ ভালবাসা থাকিলে সম্পদে বা বিপদে সর্বাবস্থায় সে ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী শিবানন্দ) বলিয়াছেন—

'খুব প্রেমের সহিত তাঁর ভজন কর—পরম শান্তি পাইবে। সেই প্রেমে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সব সহ্য করিতে পারিবে। কোন চিন্তা নাই। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আছেই, তবে তাঁর প্রেমে যে ভক্ত সে সবই আনন্দে সহ্য করিয়া যায় —সেই ঠিক ঠিক ভক্ত। দুঃখ কষ্ট পেয়ে তাঁকে ভুলে যাওয়া—অতি নিম্নস্তরের ভক্ত।'—

'বিপদে ভক্ত তাঁকে আরও প্রাণভরে ডাকে। এজন্যই সংসারে বিপদের সৃষ্টি। তা না হলে কেউ তাঁকে ডাকিত না। সংসারের সম্পদে সকলেই তাঁকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইত।'

শ্রীশ্রীঠাকুর এককথায় ভক্তির সারকথা বলিয়া দিয়াছেন—

'কথাটা হচ্ছে এই যে তাঁকে ভালবাসতে হবে।'